ISSN: 2348-487X

Ebong Prantik

এবং প্রান্তিক

An International Research Refereed Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Issue 3rd Vol. 10th September, 2016

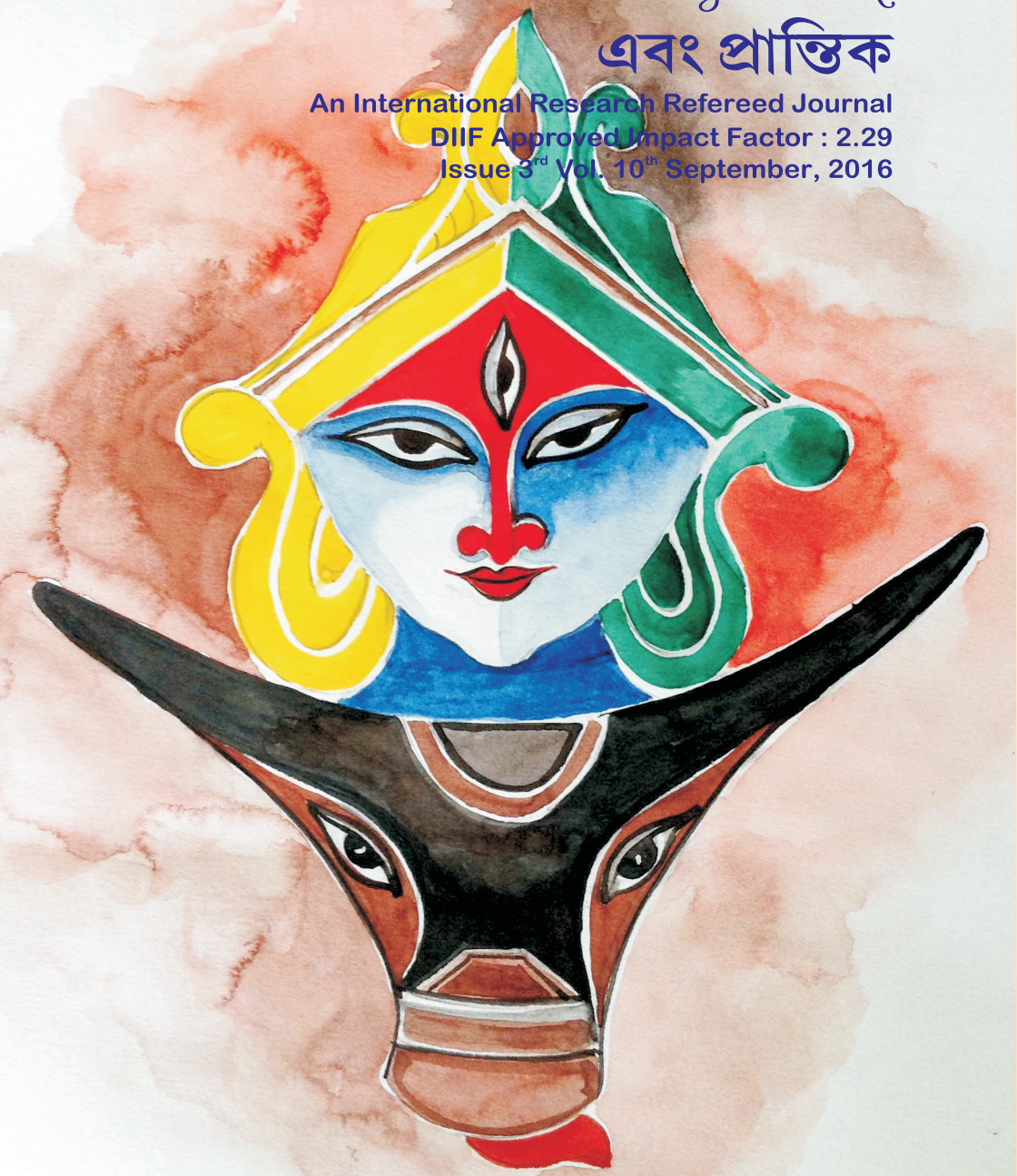

এবং প্রান্তিক

An International Research Refereed Journal
DIIF Approved Impact Factor : 2.29
Issue 3rd Vol. 10th September, 2016

সহযোগী সম্পাদক
প্রণব নস্কর

সম্পাদক
আশিস রায়

এবং প্রান্তিক

Ebong Prantik
An International Research Refereed Journal

Issue : 3rd Vol. 10th September, 2016

ISSN No. : 2348-487X

প্রকাশ : ১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

প্রকাশক : এবং প্রান্তিক
আশিস রায়
ভগবানপুর, বি.এইচ.ইউ, বারাণসী - ২২১০০৫
কথা - ৯৩৩২৩৫৮৬৪৪, ৯৪১৫২৪৩৮১৬

প্রচ্ছদ শিল্পী : তাপস রায়

অক্ষর বিন্যাস : জাহির সরদার
কথা - ৮০১৩৫৭৩০৭১

মুদ্রণ : অনন্যা, বুড়ো বটতলা, কলকাতা - ১৫০
যোগাযোগ - ৯১৬৩৯৩১৪৬৫

বিনিময় মূল্য : ১৫০ টাকা

* লেখার দায়িত্ব লেখকের নিজস্ব। সম্পাদকের লিখিত অনুমতি ছাড়া এই পত্রিকার কোনো অংশের কোনোরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না।

Ebong Prantik

An International Research Refereed Journal

Editorial Board

Executive Editor- Prof. Bratati Chakravarty

Associate Editor - Pronab Naskar

Editor- Ashis Roy

Co-Editor- Tumpa Bapari, Tapas Kr. Sardar, Sujay Sarkar

Advisory Board- Bibhabasu Dutta, Biswajit Karmakar, Soma Mukherjee, Tarun Kr. Mandal, Akash Biswas, Asish Kr. Sau, Mrinmoy Paramanik, Md. Intaj Ali, Mohan Kr. Mayra, Parimal Roy

Expert Members-
Dr. Alok Ranjan Dasgupta (Hedelberg University)
Dr. Ujjal Kumar Mazumdar (Calcutta University)
Dr. Achinta Chatterjee (California University)
Dr. Alokesh Dutta Roy (Scientist/Pharmaceuticals,Boston)
Dr. Manas Majumdar (Calcutta University)
Dr. Samar Ghosh (Principal Scientist, FIE, ICAR/Govt.of India)
Dr. Subal Kumar Maity (Ex-Scientist, Min. of Ayush)
Dr.Tarun Mukhopadhyay (Calcutta University)
Dr. Sanat Kumar Naskar (Calcutta University)
Dr. Soumitra Basu (Rabindra Bharati University)
Dr. Himabanta Bandyopadyay (Rabindra Bharati University)
Dr. Srutinath Chakraborty (Vidyasagar University)
Dr. Sucharita Bandyopadhyay (Calcutta University)
Dr. Bikash Roy (Gour Banga University)
Dr. Srabani Pal (Rabindra Bharati University)
Dr. Monalisa Das (Kazi Nazrul University)
Dr. Mohini Mohan Sardar (West Bengal State University)
Dr. Sk. Rafikul Hossain (Calcutta University)
Dr. Sandip Kumar Mandal (Presidency University)
Dr. Uttam Kumar Biswas (Presidency University)
Dr. Sambhunath Bandyopadhyay (Burdwan University)
Dr. Tania Hossain (Waseda University)
Dr. Soumitra Shekhar (Dhaka University)
Dr. Aloka Chatterjee (Banaras Hindu University)
Dr. Namita Bhattacharya (Banaras Hindu University)
Dr. Prakash Kumar Maiti (Banaras Hindu University)
Dr. Sumita Chatterjee (Banaras Hindu University)
Dr. Samaresh Debnath (Dhaka University)
Dr. Bhuina Iqbal (Chattagram University)

সূচিপত্র

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শিক্ষাভাবনা ও সংস্কার
উজ্জ্বল কুমার মজুমদার ৯

চিঠিপত্রে অন্তরঙ্গ বিদ্যাসাগর
ব্রততী চক্রবর্তী ১৫

শহীদ কাদরী : বাংলা কবিতার এক জ্যোৎস্নাময় অধ্যায়
কুমার দীপ ২১

শশীভূষণ দাশগুপ্ত : মননসাহিত্যের এক জ্যোতিষ্ক
স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ ২৬

নাটক করা, নাটক দেখা
সৌমিত্র বসু ৩২

সমর সেন : এক নাগরিক কবি
তরুণকুমার মুখোপাধ্যায় ৪০

রবীন্দ্রনাথের দলিত-ভাবনা
সনৎকুমার নস্কর ৪৪

শ্রীকবিকঙ্কণ-চণ্ডী লোকাচার, প্রথা ও লোক বিশ্বাস
লোকজীবনের ঐতিহ্য অনুশীলন
সন্দীপকুমার মণ্ডল ৫৬

মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী পাখি
লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্তী ৬৩

অরুণ মিত্রের 'ভাঙনের মাটি' : একটি পর্যালোচনা
সেখ রফিকুল হোসেন ৬৫

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' : প্রান্তিক-জনজাতির জীবনস্বরূপ
খোকন কুমার বাগ ৭০

নাট্যালোচনা : দ্বান্দ্বিকদৃষ্টিক্ষেণ
(তিন দশকের নাট্যসমীক্ষা — দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)
উত্তমকুমার বিশ্বাস ৭৬

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে নারী
তাপস রায় ৯১

সেকালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কন্যাপণ প্রথা ও পরিণতি
রমণীমোহন বর্মা ৯৭

বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কার
সোমা দত্ত ১০১

প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা : এক অসুখে যখন দুজন অন্ধ
আকাশ বিশ্বাস ১০৫

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে মেদিনীপুর
সুবল কুমার মাইতি ১০৯

প্রান্তীয় সুন্দরবনের নামকরণ রহস্য : সন্ধানের ইতিবৃত্ত
রণজিৎ কুমার বাউলিয়া ১১৬

নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সমাজ চেতনা (১৮৮০-১৯৪৭)
শ্যামা প্রসাদ মণ্ডল ১১৯
ঢোল গোবিন্দের কবিতা : একাকীত্বে স্থবির সময়
সৌমি দাশ ১২৫
নির্মলেন্দু গুণের কবিতা ঃ সময়ের সাহসী সন্তান
সৌরভ চক্রবর্তী ১৩৩
নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটোগল্পের দেশ এবং অন্ধ বেড়াল
স্বরূপ হালদার ১৪১
রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের কয়েকজন প্রতিবাদী পুরুষ ও নারীচরিত্র
শিখা ঘোষ ১৪৭
সত্তর দশকের অন্যান্য কবি ও কবি কৃষ্ণা বসু
রুম্পা ভদ্র ১৫৪
স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্য : নাগরিক ও গ্রাম্য মানসিকতার দ্বন্দ্ব
তাপস কুমার সরদার ১৬৭
রবীন্দ্র-ছোটোগল্পে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর
রামকৃষ্ণ মণ্ডল ১৭৪
উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকসাহিত্যে ধাঁধা
কল্পনা রায় ১৭৯
কবিগান : অতীত থেকে বর্তমান
প্রীতিলতা দত্ত ১৮২
গুয়াপান ও লোকায়ত লৌকিকতা
রিম্পা রায় ১৮৪
মেখলীগঞ্জ তথা উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী ঠাকুর
বিপুল বর্মন ১৮৬
দুটি উপন্যাস : দুটি মৃত্যু
অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস ১৯০
উত্তরের লোকায়ত সমাজে প্রবাদ-প্রবচন
সুনয়নী বিশ্বাস ১৯৫
ষাট পূজা ব্রতকথা
কাকলী সরকার ২০০
উনিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধে অন্দরমহল ভাবনা
প্রণব নস্কর ২০৪
জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বর্ণবৈচিত্র্য
সারমিন রহমান ২১৪
গ্রন্থসমীক্ষা
সুনীতিকুমার পাঠক ২২১
CASUES OF OPEN DEFECATION
Some new concepts from a remote village, WB
Mohan Kumar Mayra ২২৪

সম্পাদকীয়

'মা, তুমি কী স্বার্থপর গো'—আধো আধো গলায় বলেছিল বছর চারেকের মেয়েটা। মিষ্টি হাসি হেসে মা বলেছিল, 'স্বার্থপর? ভালো।' সম্পর্কের এই টুকরো ছবিটা কোনো এক গ্রামের মেলায় দেখা। মা'র কাছে আইসক্রিম খাবে বলে বায়না করছিল বছর চারেকের আদুরে সোনা। আর বারবারই নাকচ হয়ে যাচ্ছিল তার নাবালিকা ইচ্ছেটুকু। কারণ একটাই; ঠাণ্ডা লেগে যাবে, সর্দি-জ্বর বাধাবে, তারপর ভোগান্তির একসা পোয়াতে হবে তো সেই মাকেই। তাই পরিণত মনস্ক মায়ের মতে 'একটু স্বার্থপর হলে ক্ষতি কী?' কিছু খুচরো আবদার, পূরণ না হওয়া দাবি-দাওয়ার কারণে কিছু টুকরো অভিমান স্বার্থপর করে তোলে মা'র আদুরে সন্তানকেও। শুরুর শুরুটা বোধহয় এখান থেকেই। 'সম্পর্ক' নামক দেহাতী গাছটার শেকড় ছড়িয়ে যাচ্ছে গভীরতর তামস পাতালে। একদিন সেই গাছ ফুলের বিনুনী খুলে স্বার্থপরের মতো ঝরিয়ে দিল ফুলের ভবিষ্যৎ। নিঃশব্দ অভিমানও কি ছিল না সেই পাতাদের মর্মরে? মানুষও তো অদ্ভুত এক শিকড় সন্ধানী। কারও কারও আবার রকমারি মানুষ খুঁজতে মনের বনে চলতে থাকে, স্বার্থপর তত্ত্ব-তালাশ। খোঁজের বাহানায় মেতে ওঠা ঘরছাড়া এক উদাসী বাউল সে। তাকে বাঁধনে বাঁধতে চাওয়াটাও এক ধরনের স্বার্থপরতা। তাই বলে একচুলও ছন্দপতন নয়? কাঁটায় কাঁটায় চলতে হবে তেল-ঝাল-নুন জীবন? অসম্ভব! খেলা ভাঙার খেলায় যে আনন্দ, তার কাছে তো প্রথাগত এইসব লৌকিক আচার-বিচার সংস্কার জীবন যাপন নেহাতই ফানুস। স্বার্থপর ভালো। ঘুমের সাথে আড়ি করে যদি স্বার্থপরের মতো রাত জাগি, কবিতার সাথে ঝগড়ামি করতে যদি স্বার্থপরের মতো মেতে উঠি কাটাকুটি খেলায়... তাহলে? বেশ হয়। শব্দ-ছন্দ ছেনে ছেনে কবিতার শরীর তৈরি, গবেষণা-সন্ধান প্রভৃতির সাহায্যে প্রবন্ধের প্রাণ প্রতিষ্ঠা আর সময়ের সঙ্গে লড়াই করে সময়ের আগে নিজেকে স্বমহিমায় দাঁড় করাতে হলে যদি স্বার্থপর হতে হয়, তবে 'স্বার্থপর? ভালো।'

১৫ সেপ্টেম্বর, ২০১৬

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর : শিক্ষাভাবনা ও সংস্কার

উজ্জ্বল কুমার মজুমদার*

শিক্ষা সম্পর্কে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যে সব চিন্তাভাবনা করেছিলেন তা নিছক তাত্ত্বিক চিন্তাভাবনা নয়। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই তাঁর শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তাগুলি রূপ নিয়েছিল। কিন্তু সে-সব ভাবনাচিন্তার প্রসঙ্গে আসার আগে ছাত্রজীবনে এবং কর্মজীবনের কিছুকাল পর্যন্ত তাঁর নিজের শিক্ষা-দীক্ষার কিছু পরিচয় নেওয়া প্রয়োজন। যে সমাজ ও সংস্কৃতির আবহাওয়ায় তিনি নিজে শিক্ষিত হয়েছিলেন সেই শিক্ষার কিছুটা তাঁর নিজের শিক্ষা সম্পর্কিত ভাবনা-চিন্তাগুলি গড়ে নিতে অবশ্যই সাহায্য করেছিল।

বীরসিংহ গ্রামের পাঠশালায় পড়ে আট বছর বয়সে কলকাতায় এসে বিদ্যাসাগর মশাই বড়বাজারের কাছে এক সুবর্ণবণিকের পাঠশালায় পড়েন। এর পরে তাঁর বাবা তাঁকে সংস্কৃত শাস্ত্রে দক্ষতা অর্জন করিয়ে দেশে গিয়ে চতুষ্পাঠী খুলে ভালো শিক্ষক করার ইচ্ছে প্রকাশ করেন। ইংরিজি স্কুলে পড়াবার ইচ্ছে তাঁর একেবারেই ছিল না, যেহেতু পুরুষানুক্রমে তাঁরা ছিলেন সংস্কৃত-ব্যবসায়ী। কিন্তু বিদ্যাসাগর মশাইয়ের মাতৃকুলের এক আত্মীয় মধুসূদন বাচস্পতি তাঁকে সংস্কৃত কলেজে ভালো সংস্কৃত শিক্ষা হয়। দ্বিতীয়ত, সংস্কৃত কলেজে পড়ে ল-কমিটির পরীক্ষায় পাশ করলে আদালতের জজ পণ্ডিত হবার সুযোগ থাকে।

সংস্কৃত কলেজে প্রথমে ব্যাকরণ, পরে ইংরিজি, সংস্কৃত সাহিত্য ও অলঙ্কার এবং আরো পরে বেদান্ত ও স্মৃতি পড়ে ল-কমিটির পরীক্ষায় বিদ্যাসাগর উত্তীর্ণ হন। তারপর ন্যায় এবং জ্যোতিষ পড়েন। সংস্কৃত কলেজ থেকে পাশ করে বিদ্যাসাগর মশাই ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেরেস্তাদার বা প্রথম পণ্ডিতের চাকরি পান। চাকরি পাওয়ার পর ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের সেক্রেটারি মার্শাল-এর পরামর্শে ইংরিজি ও হিন্দি চর্চা শুরু করেন। চাকরির সময়েই সকালে হিন্দুস্থানী পণ্ডিতের কাছে হিন্দী পড়তেন, বিকেলে সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাবা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাছে পড়তেন ইংরিজি। সংস্কৃত চর্চাও চলছিল, বিশেষ করে সাংখ্য ও পুরাণ। পাঁচ বছর পরেই সংস্কৃত কলেজের অ্যাসিস্ট্যান্ট সেক্রেটারি হওয়ার সময় মার্শালের যে সার্টিফিকেট তিনি পান তাতে বাঙলার পণ্ডিত বিদ্যাসাগরের সাহিত্য ও বিজ্ঞানের সব শাখায় এবং বিশেষ করে ইংরিজি ভাষায় বিশেষ দক্ষতার কথা বলা ছিল।

সংস্কৃত কলেজের সহকারী সেক্রেটারির পদ পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিদ্যাসাগরের শিক্ষাচিন্তা শুরু হয়। এই সময় তিনি নতুন পঠন-ব্যবস্থা সম্পর্কে যে রিপোর্ট দেন তা মার্শালকে জানিয়েছিলেন। তার বিষয়বস্তু জানা নেই, তবে মার্শালের মন্তব্য অনুযায়ী তা যে সময়য়োপযোগী, সুশৃঙ্খল এবং প্রতিটি বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়ার মতো উপযুক্ত, তা বলা হয়েছিল। কিন্তু এই রিপোর্ট

---

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

শিক্ষা-পরিষদের কাছে সেক্রেটারি পাঠাননি বলে বিদ্যাসাগর পদত্যাগ করেন। পরে ফোর্ট উইলিয়ামে হেডরাইটার ও কোষাধ্যক্ষের কাজ কিছুদিন করে বিদ্যাসাগর যখন আবার সংস্কৃত কলেজের সাহিত্যশাস্ত্রের অধ্যাপক হলেন তখন তাঁকে সংস্কৃত কলেজের পঠনপদ্ধতির ওপর রিপোর্ট দিতে বলা হয়। সে রিপোর্টে কলেজ পরিচালনার নিয়মকানুনের পরিবর্তনের কথা ছিল, এবং নতুন প্রস্তাব অনুযায়ী পুনর্গঠিত সংস্কৃত কলেজ যে একই সঙ্গে সংস্কৃতচর্চার কেন্দ্র ও মাতৃভাষায় রচিত সাহিত্যের জন্মক্ষেত্র হবে, এবং ভবিষ্যতে, এই কলেজের ছাত্ররাই যে শিক্ষা, জ্ঞান ও সাহিত্যবোধ সঞ্চারে আদর্শ শিক্ষকের ভূমিকা নেবে সে কথাও বলা ছিল।

বিদ্যাসাগর যখন সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হিসেবে যোগ দেন তখন তিনি অধ্যক্ষের ক্ষমতা চেয়েছিলেন। শিক্ষা-পরিষদ তাঁর সে প্রার্থনা পূরণ করলে তিনি স্বাধীনভাবেই কলেজের পুনর্গঠনে মন দেন। কলেজের যে-সব সংস্কার তিনি করেছিলেন তার অনেকগুলিই সব প্রতিষ্ঠানের সাফল্যের সবসময়কারই চাবিকাঠি।

প্রথমত, কলেজের শাসনশৃঙ্খলার দিকে তিনি তীক্ষ্ণ নজর দিয়েছিলেন। নিয়মিত উপস্থিতির সঙ্গে সামান্য কারণে ক্লাস ছেড়ে যাওয়া বা অকারণ বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির ব্যাপারে তাঁর নিজের নজর ছিল। দ্বিতীয়ত, শিক্ষাবিস্তারে জাত-পাতের গোঁড়ামি তিনি সবটা দূর করতে না পারলেও খানিকটা করেছিলেন। আগে কেবল ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য ছাত্ররাই সংস্কৃত কলেজে পড়বার সুযোগ পেত। প্রথমে কায়স্থ ও পরে যে কোনো সম্ভ্রান্ত ঘরের হিন্দুকে কলেজে পড়ার অধিকার দেওয়া হল। অবশ্য অহিন্দুরাও তখনও বাইরে রয়ে গেল।

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদের শিক্ষা যাতে কর্মোপযোগী বা জব-ওরিয়েন্টেড হিসেবে মর্যাদা পায় তার জন্যেও বিদ্যাসাগর সরকারের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছিলেন। হিন্দুকলেজ ও মাদ্রাসা পাশ করা ছাত্ররা ডেপুটি পদ পেতে শুরু করে। কাজেই শুধু ভালো ছাত্র পড়ে ভালো শিক্ষক হবে এটাই তাঁর কাম্য ছিল না। অন্য জীবিকার ক্ষেত্রেও তাঁর কলেজের ছাত্ররা যাতে মর্যাদা পায় সে চেষ্টাও তিনি করেছিলেন। একালেও আমরা অনেক বিষয় পড়াই যার জীবিকাগত মর্যাদার দিকে সরকারি দৃষ্টি পড়ে না। ফলে ছাত্রছাত্রীরা বিপদে পড়ে। কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংশ্লিষ্ট বিভাগটিও মর্যাদা হারিয়ে ফেলে। এই বিপদ সম্পর্কে সচেতন ছিলেন বলেই বিদ্যাসাগর শিক্ষার জীবিকাগত মর্যাদার কথা ভেবেছিলেন।

কলেজের পাঠ্যসূচি তৈরির ব্যাপারে বিদ্যাসাগর সহজবোধ্য পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করে সফলতা অর্জনে সক্ষম হয়েছিলেন। দুরূহ 'মুগ্ধ বোধ' ব্যাকরণটি ছাত্রদের মুখস্থ করতে হত। তাতে সময় লাগত চার থেকে পাঁচ বছর। অনেক সময় অর্থ না বুঝেই ছেলেদের মুখস্থ করতে হত। এই নিষ্প্রাণ ব্যাকরণ পাঠে ভাষা-শিক্ষা তো হতোই না, সংস্কৃত সাহিত্যবোধও কোনো কাজে লাগত না। বিদ্যাসাগর মুগ্ধবোধ পড়ানো বন্ধ করলেন। তার বদলে বাংলায় লেখা স্বরচিত উপক্রমণিকা ও ব্যাকরণ কৌমুদী ধরালেন। সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত গদ্য ও কাব্যসাহিত্যের একটি নির্বাচিত সংকলন 'ঋজুপাঠ' পড়ানো চলতে লাগল। বাঙালির ব্যাকরণচর্চা ও সাহিত্যপাঠ আগের চেয়ে অনেকখানি আনন্দদায়ক হয়ে উঠল। মোটামুটি তিন বছরের মধ্যে ছাত্ররা অনেকটা ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত

করতে সক্ষম হল। এখন বাংলাভাষা তার নিজস্ব চরিত্রটুকু করে নিতে পেরেছে বলে হয়তো সংস্কৃত ব্যাকরণচর্চার তেমন দরকার হয় না। তবু বাংলাভাষার নিয়মকানুনগুলি শৃঙ্খলাবিন্যাসে সংস্কৃত ব্যাকরণের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিকে আমাদের সামনে রাখতেই হয়। তখন আরো বেশি প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষা সবে তখন সংস্কৃতের শৃঙ্খলামুক্ত হতে শুরু করেছে।

আগেই বলেছি, বিদ্যাসাগর সংস্কৃত কলেজে ইংরিজি পড়েছিলেন। পরে কর্মোপলক্ষে তাঁকে আরো বেশি ইংরিজি চর্চা করতে হয়। হিন্দিও শিখতে হয়। জীবিকাগত কারণেই ঔপনিবেশিক পরিবেশে তাঁকে এই দুটি ভাষা শিখতে হয়েছে। সংস্কৃত কলেজের উদ্দেশ্য ছিল হিন্দু সাহিত্যপাঠ এবং পাশ্চাত্য জ্ঞান-বিজ্ঞানের অনুশীলন। বাংলা সাহিত্যে পাশ্চাত্যভাবের আমদানী করা এবং পাশ্চাত্য বিজ্ঞান শিক্ষার সুবিধার জন্যে এই পাশ্চাত্য জ্ঞানচর্চার প্রয়োজন ছিল। বিদ্যাসাগর যখন ছাত্র তখন সংস্কৃত কলেজে ইংরিজি পড়ানো হত। তারপর ইংরিজি পড়ানো উঠে যায়। বিদ্যাসাগর ইংরিজি পড়ানো শুরু করলেন। গণিত-শিক্ষা নতুন উৎসাহে শুরু হল ইংরিজিতেই। আগে সংস্কৃতে অঙ্ক কষানো হতো। ইংরিজির ওপর জোর দেওয়া ছাড়া গত্যন্তর ছিল না। নিজেও তো তিনি একই কারণে অন্যভাষা শিখেছিলেন।

২

সংস্কৃত কলেজে যখন এইসব সংস্কার চলছে তখন কলেজের শিক্ষাব্যবস্থা সম্পর্কে পরিদর্শকের মতামত জানতে চাওয়া হয় কাশীর সংস্কৃত কলেজের অধ্যক্ষ ডক্টর ব্যালান্টাইনের কাছে। ব্যালান্টাইনের রিপোর্ট বিদ্যাসাগরের পছন্দ হয়নি। তাঁর প্রায় কোনো প্রস্তাবই পছন্দ হয়নি। তার একটা কারণ, তিনি বিরুদ্ধ মত সহ্য করতে পারতেন না। কিন্তু কতকগুলি ব্যাপারে বিদ্যাসাগরের মন্তব্যে কিছুটা যুক্তি ছিল। কিছুটা বিতর্কের ব্যাপারও বটে। বিতর্কের মধ্যে খুব বেশি না গিয়ে এইটুকু বলা যায়, বেদান্ত ও সাংখ্যকে তিনি ভ্রান্ত দর্শন বললেও হিন্দুদের শ্রদ্ধেয় বলে পাঠ্যসূচিতে রাখতে চেয়েছেন। পাশাপাশি বার্কলের দর্শন পড়াতে চাননি এই যুক্তিতে যে, সাংখ্য বা বেদান্তের মতো বার্কলেও একই সিদ্ধান্তে এসেছেন যা এখন অচল এবং দুটি দর্শন একই সিদ্ধান্তে এসেছে জানলে ছাত্ররা দুটি অচল ও ভ্রান্ত দর্শনের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পড়বে। বিদ্যাসাগরের এ যুক্তি দুর্বল। কারণ, তর্কশাস্ত্রের ছাত্র নিছক শ্রদ্ধায় 'অচল'বেদান্ত বা সাংখ্য পড়বে এ হতে পারে না। তেমনি বার্কলের দর্শন যদি একই সিদ্ধান্তে পৌঁছে থাকে তাহলে নিছক বিদেশি বলেই কি তাকে অশ্রদ্ধা করতে হবে? আসলে যে বিদ্যাসাগর লোকাচারকে উপেক্ষা করে বিধবা বিবাহের সপক্ষে ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে লড়াই করতে পেরেছিলেন সেই বিদ্যাসাগরই বেদান্ত ও সাংখ্যকে রেখেছিলেন লোকাচারের 'ভয়ে'। এই কথাই কি বলতে হবে?

ব্যালান্টাইনের আর একটি যুক্তিকে অবশ্য বিদ্যাসাগর যে যুক্তিতে খণ্ডন করেছিলেন তা মানতে হয়। ব্যালান্টাইন বলেছিলেন, পাশ্চাত্য 'লজিক' ও সংস্কৃত 'ন্যায়' এই দুটি শাস্ত্র পাশাপাশি পড়লে ছাত্রদের মনে হতে পারে 'সত্য' দুরকমের। বিদ্যাসাগর ঠিকই বলেছেন, যে বুদ্ধিমান ছাত্র দুটি ভাষায় বিজ্ঞান ও সাহিত্য পড়েছে তার এই দুরকম সত্যবোধ হবার তো কথা নয়। হলে বুঝতে হবে শিক্ষাপ্রণালীর দোষ কিংবা ছাত্রদের গ্রহণক্ষমতার অভাব। দুটি শাস্ত্রের মধ্যে ঐক্য

কোথায়, অনৈক্য কোথায়, সেটাও তো বুঝতে হবে। আর একটি কথা, যেটা বিদ্যাসাগর বলেন নি, সেটাও এখানে বলা জরুরি মনে করি। ভুল বলেই যে কোনো দর্শন অপাঠ্য তা নয়। ভুল দর্শন হলে সেটি নিয়ে মাথা ঘামানোর বেশি প্রয়োজন নেই সেটা যেমন ঠিক, তর্কশাস্ত্রের ইতিহাসের ছাত্রকে ভুল দর্শনকে খণ্ডন করতে করতেই সঠিক দর্শনের দিকে এগোতে হয়। তাতে যুক্তিক্ষমতা যেমন বাড়ে তেমনি ঠিক পথের নিশানা পেতে গেলে যে যুক্তিনির্ভর দৃষ্টি দরকার তা খুলে যায়।

যাই হোক, ব্যালান্টাইনের মন্তব্য অনুসরণ করে বিদ্যাসাগর আরও বলেছেন যে, দেশি-বিদেশি দুটি শাস্ত্রের মধ্যে ঐক্য দেখাতে পারলেও যে দেশীয় পণ্ডিতদের সমর্থন পাওয়া যাবে তা নয়। কারণ, তাঁর মতে আরব খলিফাদের ধর্মীয় গোঁড়ামি হিন্দু পণ্ডিতদেরও আছে। কাজেই জোর করার প্রয়োজন নেই। তাদের মন রাখার যেমন দরকার নেই তেমনি তাদের সাহায্যেরও প্রয়োজন নেই। শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই তাদের গলার জোর কমে আসছে, আরও কমবে।

দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের সঙ্গে সঙ্গেই যে সাধারণ মানুষ এই ক্ষীণকণ্ঠ গোঁড়া পণ্ডিতদের অগ্রাহ্য করবে, এই বিশ্বাসেই বিদ্যাসাগর দুটি জিনিস চেয়েছিলেন। প্রথমত, মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার প্রচলন এবং তার জন্য মাতৃভাষার পাঠ্যপুস্তক রচনা করা। দ্বিতীয়ত, শিক্ষকের দায়িত্বপূর্ণ কর্তব্যভার গ্রহণ করতে পারে এমন শিক্ষকগোষ্ঠী তৈরি করা।

বিদ্যাসাগরের এইসব মতামতকে কেন্দ্র করে শিক্ষাপরিষদের সঙ্গে তাঁর মনোমালিন্য হয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত বিদ্যাসাগরের দৃঢ়তাই জয়ী হয়েছিল। এখানে সে প্রসঙ্গ আলোচ্য নয়। কিন্তু এই প্রসঙ্গে একটা কথা এখনও প্রাসঙ্গিক মনে হয়। এই ঘটনার (১৮৫৩) পর একশো পঞ্চাশ বছর কেটে গিয়েছে। এখন স্বাধীন দেশের মানুষ একুশ শতকে প্রবেশ করেছে। বিদ্যাসাগর যে ধর্মীয় গোঁড়ামিকে দ্রুত শিক্ষাবিস্তারের আশায় আমল দিতে চাননি তা এই মুহূর্তে বাবরি মসজিদ-রামশিলা পুজোকে কেন্দ্র করে বেশ জাঁকিয়ে উঠেছে। অন্যদিকে মাতৃভাষায় ব্যবহারিক কাজকর্ম এখনও সরকারি উৎসাহের অপেক্ষা করছে এবং উচ্চতর জ্ঞানবিজ্ঞানের ক্ষেত্রে মাতৃভাষায় বেশ কিছু বই লেখা হলেও আশানুরূপ দ্রুতগতিতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের সব শাখায় সাম্প্রতিকতম তথ্য বিশ্লেষণ ও আবিষ্কারগুলিকে মাতৃভাষায় প্রকাশ করার মতো কাঠামো এখনও আমাদের হয়নি। আরো একটা কথা বলার আছে। পরাধীন দেশে 'ভাষাপ্রেম' প্রয়োজনীয় ছিল। সাম্রাজ্যবাদী শক্তির প্রতি ঘৃণাবশত তাদের ভাষার প্রতি ঘৃণার কারণও বুঝি। কিন্তু এই মুহূর্তে ইংরিজি ভাষার শক্তি সামর্থ্য ও ব্যাপক ব্যবহারের কথা ভাবলে এবং ভারতীয় রাজনীতির কথা ভাবলে ইংরিজির অপরিহার্যতাকে মানতে হয়। আর এখনকার পরিণত বুদ্ধিতে মনে হয়, মাতৃভাষা প্রেমের পাশাপাশি যেকোনো শক্তিশালী ভাষার প্রতি (ইংরিজি ভাষার তো কথাই নেই) ঘৃণা নয়, সহানুভূতিই থাকা ভালো। সেটাই বিচক্ষণতার পরিচয়।

ব্রিটিশ আমলে, অন্তত উনিশ শতকের মাঝামাঝি সময়ে, উগ্র জাতীয়তাবাদের কোনো প্রশ্নই ছিল না। পরে উগ্র জাতীয়তাবাদের যুগেও বিদেশি দ্রব্য বর্জনের আন্দোলন হয়েছে, প্রাদেশিক ভাষাগুলির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা হয়েছে কিন্তু ইংরিজি ভাষা বর্জনের তেমন চেষ্টা হয়নি। বিদ্যাসাগরের মতো 'পুরুষানুক্রমে সংস্কৃত ব্যবসায়ী'র পক্ষে ইংরিজি ভাষার ওপর অনীহা

থাকাটা অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ঠাকুরদাসের সে অনীহা প্রথম দিকে থাকলেও শেষ পর্যন্ত তিনি ছেলেকে সংস্কৃত কলেজে পড়িয়েছিলেন। সংস্কৃত কলেজে তখন অবশ্যপাঠ্য না হলেও ব্যাকরণ শ্রেণি থেকে প্রথমে ইংরিজি শ্রেণিতে প্রবেশ করা যেত এবং বিদ্যাসাগরকে ইংরিজি পড়াতে দেওয়া হয়েছিল। পরেও বিদ্যাসাগর চাকরির প্রয়োজনে যে ইংরিজি ও হিন্দির চর্চা করেছিলেন সে কথা আগেও বলেছি। এরপর শিক্ষা বিস্তারে মাতৃভাষার অপরিহার্যতা মেনে নিয়েই বিদ্যাসাগর ইংরিজির প্রয়োজনীয়তাকে বিশেষভাবে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। শিক্ষাপরিষদের সেক্রেটারী ড. মোয়াট-কে তিনি চিঠিতে জানিয়েছিলেন যে, বাংলায় যথার্থ অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্যে যদি সংস্কৃত ভালো করে শেখানো যায় এবং তারপরে ইংরিজির সাহায্যে যদি ছাত্রদের মনে শুদ্ধ জ্ঞান সঞ্চার করা যায় তাহলে যে ছাত্রকুল তৈরি হবে তারা ইংরিজি বা দেশীয় অন্য কলেজের ছাত্রদের তুলনায় ভালোই হবে —এই ছিল তাঁর দৃঢ় বিশ্বাস। এই দৃঢ়তাই সমকালীন শিক্ষাপদ্ধতি, পরীক্ষা ও সাহিত্য প্রতিষ্ঠানে সরকারি ও বেসরকারি যেকোনো ব্যাপারে তাঁর উপস্থিতি অপরিহার্য করে তুলেছিল।

৩

কেবল ইংরিজি ও সংস্কৃত শিক্ষায় যে শিক্ষাবিস্তার হয় না বিদ্যাসাগর তা বুঝতেন একথার প্রমাণ দেওয়ার দরকার নেই। তিনি কী করেছিলেন তা সংক্ষেপে বুঝে নেওয়া যাক। শিক্ষাপরিষদের সদস্য হিসেবে প্রথম ছোটোলাট হ্যালিডে যে মিনিট পাঠান তাতে বিদ্যাসাগরের মন্তব্য জুড়ে দেওয়া হয়েছিল। কারণ হ্যালিডে শিক্ষা প্রশাসনে, বাংলা শিক্ষা প্রচারে এবং বাংলা প্রাথমিক পুস্তক রচনায় বিদ্যাসাগরের দক্ষতা ও উদ্যোগের ওপর আস্থা রাখতেন। বিদ্যাসাগরের যে মন্তব্যটি তিনি জুড়ে দিয়েছিলেন তাতে অনেক কথার মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকটি কথা বলি। প্রথমত, বিস্তৃত ও সুশৃঙ্খলভাবে বাংলা শিক্ষাতেই জনসাধারণের শ্রীবৃদ্ধি সম্ভব। দ্বিতীয়ত, শুধু লেখাপড়া ও অঙ্ক কষাতেই শিক্ষা সম্পূর্ণ হয় না। জ্ঞান-বিজ্ঞানের সবরকম বিষয়ে শিক্ষা দিয়ে সামগ্রিক শিক্ষার প্রবর্তন করতে হবে। যোগ্য শিক্ষক নির্বাচন ও ভালো পাঠ্যপুস্তক নির্বাচন করতে হবে। তত্ত্বাবধান ও উৎসাহ বিশেষ প্রয়োজন। তৃতীয়ত, শিক্ষকদের সংখ্যা বাড়াতে হবে। তাদের মাইনেও মোটামুটি চলনসই হওয়া চাই। চতুর্থত, পাঠশালাগুলি গুরুমশাইদের শিক্ষাদান রীতি সম্পর্কে অবহিত করে পাঠশালাগুলিকে প্রয়োজনীয় বিদ্যালয়রূপে গড়ে তুলতে হবে। পঞ্চমত, সংস্কৃত কলেজ সাধারণ শিক্ষার কেন্দ্রভূমি হলেও বাংলা শিক্ষক গড়বার নর্ম্যাল স্কুল হিসেবে তাকে গণ্য করতে হবে। ষষ্ঠত, বেসরকারি ও মিশনারি ভালো স্কুলগুলিকে তত্ত্বাবধান করে সেগুলিকে উৎসাহ দিতে হবে। এবং যেসব জায়গায় ইংরিজি পড়ানোর স্কুল আছে মডেল বাংলা স্কুলগুলির মর্যাদা রক্ষার জন্যে সেসব স্থান থেকে স্কুলগুলিকে দূরে রাখতে হবে।

এমন আরও অনেক মন্তব্য আছে যাতে বাংলা বিদ্যালয়গুলির পরিচালনা, তত্ত্বাবধান ও উন্নতির জন্যে খুব কার্যকর প্রস্তাব ছিল। মডেল স্কুলগুলির স্থান নির্বাচনের ভার পেয়ে বিদ্যাসাগর হুগলি জেলার নানা স্থানে ঘুরেছিলেন। নদীয়া, বর্ধমান ও চব্বিশ পরগনায় যেতে না পারলেও নানা তথ্য সংগ্রহ করেছিলেন। পরে তিনি যখন দক্ষিণ বাংলার স্কুলগুলির সহকারী ইন্সপেক্টর

হলেন তখন বাংলা শিক্ষক নির্বাচনের ভার তিনি নেন। শিক্ষক নির্বাচনের পরীক্ষাও তিনি নেন। পরীক্ষায় যোগ্য শিক্ষক কমই উত্তীর্ণ হয়। ফলে শিক্ষক শিক্ষণের প্রয়োজনীয়তা বাড়ে এবং নর্মাল স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় সংস্কৃত কলেজেই। সংস্কৃত কলেজ, নর্মাল স্কুল, চারটি জেলার মডেল স্কুল, হিন্দু স্কুল-সংশ্লিষ্ট পাঠশালা নামে আরো একটি মডেল স্কুল একই সঙ্গে সবই তিনি দেখাশোনা করতেন। তা ছাড়াও তিনি অন্যান্য কয়েকটি বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় সাহায্য করেছিলেন। তাঁর জীবনী পাঠকমাত্রেই তার খবর রাখেন।

৪

উনিশ শতকের প্রথমার্ধে রাধাকান্ত দেবের উৎসাহে এবং খ্রিস্টান মিশনারিদের উদ্যোগে স্ত্রীশিক্ষার কিছু সূচনা হয়েছিল। প্রথমার্ধের একেবারে শেষদিকে বীটন সাহেবের চেষ্টায় একটি বালিকা বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা হয়। এই বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠায় বীটন বিদ্যাসাগরের সাহায্য পেয়েছিলেন। পরে ব্রিটিশ সরকার যখন স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের উদ্যোগ নেন তখন বিদ্যাসাগর নিজের অধীনস্থ এলাকাগুলিতে (সহকারী ইন্সপেক্টর হিসেবে যে অঞ্চলের তিনি দেখাশোনা করতেন) কিছু কিছু মডেল বালিকা বিদ্যালয়ও খুললেন। তাঁর উদ্যোগে পরিচালনার ব্যয়ও সরকার বহন করেন। কিন্তু সামাজিক কুসংস্কার ও মেয়েদের অবরোধ প্রথা বালিকা বিদ্যালয়ের পরিচালনায় সমস্যা হয়ে দাঁড়ায়। মেয়েদের যেমন বাইরে বেরোনোর অসুবিধা ছিল, শিক্ষয়িত্রীর স্বাধীন জীবিকায় এগিয়ে আসার মতো মেয়েদেরও তেমনি অভাব ছিল। প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা ছাড়াও শিক্ষাবিস্তারে, বিশেষত স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারে, নানা সমস্যা বিদ্যাসাগরকে সামাজিক সংস্কারের দিকে টেনে নিয়ে যায়। কিন্তু তাঁর শিক্ষা সংস্কার চেষ্টা থেমে থাকেনি। কর্মজীবনে অবসর নেওয়ার পরও মেট্রোপলিটান ইনস্টিটিউটকে ফার্স্ট গ্রেড কলেজে পরিণত করে প্রথম বেসরকারী কলেজ প্রতিষ্ঠার প্রবর্তক হন তিনি।

উচ্চশিক্ষা থেকে গণশিক্ষা পর্যন্ত সব ব্যাপারেই বিদ্যাসাগরের চিন্তাভাবনা শিক্ষা প্রতিষ্ঠান পরিচালনায় পরিলক্ষিত হয়েছিল। সেইখানেই তাঁর চিন্তাভাবনার মূল্য। পরিবেশ অনেকটা পাল্টে গেলেও বিদ্যাসাগরের ছাত্র ও শিক্ষক গড়ার আদর্শ, প্রাতিষ্ঠানিক শৃঙ্খলার প্রতি তীক্ষ্ণ নজর, দক্ষ সহকর্মী চেনার ক্ষমতা, শিক্ষকদের জীবিকা নির্বাহের উপযুক্ত পারিশ্রমিকের জন্যে সরকারি প্রশাসনকে সচেতন রাখা, শিক্ষকদের আত্মমর্যাদা রক্ষার চেষ্টা করা, পাঠ্যবিষয়কে যুগোপযোগী করা, শিক্ষার ব্যবহারিক উপযোগিতার প্রতি নজর রাখা এবং গণশিক্ষার জন্যে অক্লান্ত শ্রম-সাধনা শিক্ষাবিদ্ হিসেবে তাঁর মর্যাদাকে এখনও অম্লান রেখেছে। কিন্তু শিক্ষা-সংস্কারের ক্ষেত্রে সহযোগী নির্বাচনে তাঁর দক্ষতা বারবার প্রমাণিত হলেও শিক্ষা-ব্যবস্থা পরিচালনায় তাঁর 'একক' কর্তৃত্বের চেষ্টা আমাদের এই সংস্কারাচ্ছন্ন দেশে তাঁকে শিক্ষাসংস্কারের ট্র্যাজিক নায়ক করে তুলেছিল।

চিঠিপত্রে অন্তরঙ্গ বিদ্যাসাগর

ব্রততী চক্রবর্তী*

সাহিত্যের অন্যতম সমৃদ্ধ শাখা পত্রসাহিত্য। পত্রাবলীর মাধ্যমে পত্রলেখকের ব্যক্তিগত স্বরূপটির পরিচয় বিশেষভাবে পাওয়া যায় বলে বিখ্যাত মানুষদের চিঠিপত্র সম্পর্কে কৌতূহলের অন্ত নেই। পৃথিবীর বহু বিদগ্ধ মানুষের পত্রাবলী বিষয়বস্তুর গুরুত্বের সঙ্গে সঙ্গে সাহিত্যপাঠের আনন্দ দিয়ে থাকে। ফলে পত্রসাহিত্য সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ শাখারূপে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করেছে। লেখকের স্বকীয় রচনা-প্রতিভার স্বাক্ষর বহনকারী বিখ্যাত মানুষদের পত্রে সমকালীন যুগ, সমাজ, পরিবেশ ছায়া ফেলায় তাদের ঐতিহাসিক গুরুত্বও অপরিসীম। লেখক তাঁর নিতান্ত ব্যক্তিগত ভাবনাচিন্তা, মনোভাব, অনুভূতি প্রকাশের মধ্যে দিয়ে উদ্দীষ্ট ব্যক্তি বা যুগকে অতিক্রম করে ভবিষ্যতের পাঠকের কাছেও অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন। বিখ্যাত সকল মনীষীর সব পত্রই সাহিত্যগুণসমৃদ্ধ নয়, কিন্তু ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে তা মূল্যবান; আবার ব্যক্তিমানুষটির অন্তরঙ্গ পরিচয় সেখানে বিধৃত, তাই পত্রলেখকের মানসিকতা বিশ্লেষণেও তা বিশেষ সহায়ক।

বিদ্যাসাগরের পত্রগুচ্ছেও মানবমুখীন বিদ্যাসাগর স্পষ্ট হয়ে ওঠেন, পত্রগুলি কতটা সাহিত্যগুণান্বিত সে প্রশ্ন অবান্তর থেকে যায়, তিনি কাছের মানুষ হন। বিশাল বনস্পতির মতো মাথা উঁচু করে, শাখায়িত বিস্তার নিয়ে যিনি অপার বিস্ময় জাগান; যাঁর প্রখর ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানবোধ, অনন্য বিদ্বত্তা ও সত্যানুরাগ, অসীম সাহসিকতা ও কষ্টসহিষ্ণুতা, প্রবল দৃঢ়তা ও কর্তব্যনিষ্ঠা, নিরন্তর দয়াদাক্ষিণ্যের সঙ্গে বহুমুখী জনহিতকর কর্মসাধনার অসাধারণ বিচিত্র কাহিনি শ্রদ্ধায় আপ্লুত করে, চিঠিপত্রের মাধ্যমে তিনিই আবার পাঠকের কাছে অন্তরঙ্গ হয়ে ওঠেন; সেই সঙ্গে চিঠিপত্রে এই বিশাল হৃদয় মানুষটির মানসিক যন্ত্রণার পরিচয় লাভে পাঠকমাত্রই বিচলিত, বেদনাবিদ্ধ হন। মানুষের প্রকৃত পরিচয় তার ব্যক্তিগত চিঠিপত্রে যত বেশি পাওয়া যায়, তেমনটা অন্য কোনো প্রকাশ মাধ্যমেই পাওয়া যায় না। বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্রেও তাঁর ব্যক্তিচরিত্রের প্রকাশ স্বতঃস্ফূর্তভাবে ঘটেছে। তাঁর বেদনাদায়ক বা সুখকর অভিজ্ঞতা নিয়ে, তাঁর দুঃখ-ক্ষোভ, আশা-নিরাশা নিয়ে ব্যক্তি বিদ্যাসাগরের অকপট মানসিকতার পরিপূর্ণ প্রকাশ তাঁর চিঠিপত্রকে বিশিষ্টতা দিয়েছে। জীবনের শেষ পর্বে, ১৮৬৫ থেকে ১৮৯০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে লেখা, তাঁর মোট ৬৪টি চিঠি সংকলিত করেছেন বিনয় ঘোষ তাঁর 'বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ' নামক মূল্যবান গ্রন্থটিতে। এসব চিঠিপত্রে মানবকল্যাণে নিবেদিতপ্রাণ, বলিষ্ঠ কর্মযোগী বিদ্যাসাগর যেমন আছেন, তেমনি আছেন মানুষের অসহযোগিতা, অন্যায়, মিথ্যাচারে দুঃখিত-ক্ষুব্ধ-ক্লান্ত বিদ্যাসাগর; যিনি আত্মীয়-প্রিয়জন থেকেই দূরে চলে যেতে চেয়েছেন।

---

* অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, বেনারস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্রের প্রথম উল্লেখনীয় একটি বৈশিষ্ট্য হল, চিঠির মাথায় শ্রীদুর্গা বা শ্রীহরিঃ বা শ্রীহরিঃশরণম্ শিরঃপাঠ। বিদ্যাসাগরের ধর্মবিশ্বাস নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে সমালোচকেরা এ-সম্পর্কে প্রশ্ন তুলে থাকেন। একদল সমালোচকের এই মত যে, তিনি নাস্তিক ছিলেন না, চিঠিপত্রের শিরঃপাঠই এই প্রকৃষ্ট প্রমাণ, এবং তাঁর মত মানুষ কেবলমাত্র প্রথা মেনে এমন শিরঃপাঠ পত্রে ব্যবহার করতে পারেন না। অপরপক্ষে দ্বিতীয় মতটি প্রবল এবং এ মতে বিশ্বাসীদের বক্তব্য, বিদ্যাসাগরের চিঠিপত্রের শীর্ষে দুর্গা বা হরির নাম নিতান্তই লোকাচারের বশবর্তী হয়ে লেখা। এমন লেখায় বা লোকাচার পালনে কোনো লাভ বা ক্ষতি নেই, একথা বিদ্যাসাগর জানতেন। তাই তিনি উপবীত ধারণ করেছেন, গুরুজনদের শেষ ক্রিয়া বা শ্রাদ্ধাদিও করিয়েছেন। এসব তাঁর ঈশ্বর বিশ্বাসের প্রমাণ নয়। সেই সঙ্গে আরও একটি লক্ষণীয় ব্যাপার এই যে, সাধারণত পারিবারিক পত্রেই বিদ্যাসাগর দুর্গা বা হরির নাম নিয়েছেন, কিন্তু সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের লেখা পত্রে এ জাতীয় শীর্ষপাঠ নেই বললেই চলে যেমন, ভাওয়ালের রাজা কালীনারায়ণ রায়বাহাদুর, রাজনারায়ণ বসু, মহারাণী স্বর্ণময়ী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, তারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়, রামেশ্বর মালিয়া, যদুনাথ রায়, দুর্গামোহন দাস, যতীন্দ্রমোহন ঠাকুর, দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ ব্যক্তিদেরকে লেখা পত্রে। অপরপক্ষে মাতৃদেবী, পিতৃদেব, স্ত্রী, পুত্রবধূ, পৌত্র বা ভ্রাতাদের লেখা পত্রে শ্রীশ্রীহরিঃ বা শ্রীহরিঃ শীর্ষপাঠ আছে। সম্ভবত ঈশ্বর-বিশ্বাসী আত্মীয়দের বিশ্বাসের মর্যাদা দিয়ে এই প্রথাগত পত্র রচনার রীতিটি বিদ্যাসাগর পালন করেছেন আত্মজনের ক্ষেত্রে।

যাই হোক, বিদ্যাসাগরের পত্রগুলির মধ্যে ৩৪টিকে পারিবারিক এবং ৩০টিকে অপারিবারিক শ্রেণির পত্র বলা যেতে পারে। পারিবারিক পত্রগুলিতে তিনি নানা ভাবে প্রকাশিত; যেমন, মাতাপিতার কাছে তিনি অত্যন্ত বিনয়ী ও শ্রদ্ধাবনত সন্তান, ভ্রাতাদের কাছে তিনি স্নেহময়-দায়িত্বশীল অগ্রজ, পুত্রবধূ- পৌত্র, পৌত্রীদের লেখা পত্রে তিনি যেন স্নেহ-ভালবাসার ঝর্ণাধারা; আবার এই মানুষটির যথার্থ হৃদয়বান বৈষয়িক রূপের প্রকাশ ঘটেছে চিঠিপত্রে মাসোহারা বা বিষয়ের বিলিব্যবস্থায়। সমাজের বিশিষ্ট মানুষদের লেখা অপারিবারিক পত্রগুলিতে তাঁর সমাজজীবনের অভিজ্ঞতা প্রতিফলিত। সেখানে কখনও তিনি অন্যের সাফল্যে উৎসাহিত বা অন্যায় দর্শনে ক্ষুব্ধ, কখনও প্রতিবাদে মুখর বা সান্ত্বনাদাতা সুহৃদ, আর সর্বদাই তিনি মানব কল্যাণকামী। সামাজিক মানুষের, বিশেষত মধ্যবিত্ত বাঙালির অক্ষমতা-দুর্বলতা-সীমাবদ্ধতার সঙ্গে বিদ্যাসাগর পরিচিত ছিলেন ভালভাবেই, তবু ব্যক্তি মানুষটি প্রবল অভিমানীও ছিলেন, চিঠিপত্রে এর প্রমাণ মেলে। বহুবিবাহ প্রথা রোধ ও বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য মহৎহৃদয় বিদ্যাসাগর তাঁর সর্বস্ব পণ করেছিলেন। পুত্র নারায়ণ বিধবাকন্যা ভবসুন্দরীকে ১২৭৭ সালের ২৭ শ্রাবণ বিবাহ করায়, ঐ বছরেই ৩১ শ্রাবণ ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্রকে লিখিত পত্রে বিদ্যাসাগর ঘোষণা করেছিলেন—

> বিধবাবিবাহ-প্রবর্তন আমার জীবনের সর্বপ্রধান সৎকর্ম। এ জন্মে যে ইহা অপেক্ষা অধিকতর আর কোন সৎকর্ম করিতে পারিব, তাহার সম্ভাবনা নাই। এ বিষয়ের জন্য সর্বস্বান্ত হইয়াছি এবং আবশ্যক হইলে প্রাণান্ত স্বীকারেও পরাঙ্মুখ নহি।

বিদ্যাসাগরের এই ঐতিহাসিক উক্তিটি বহু উদ্ধৃত ও বহু আলোচিত। অথচ চিঠিপত্রে ক্ষুব্ধ বিদ্যাসাগর ঠিক এর বিপরীত একটি খেদোক্তিও করেছেন —

> আমাদের দেশের লোক এত অসার ও অপদার্থ বলিয়া পূর্বে জানিলে, আমি কখনই বিধবাবিবাহ বিষয়ে হস্তক্ষেপ করিতাম না। ... দেশহিতৈষী সৎকর্মোৎসাহী মহাশয়দিগের বাক্যে বিশ্বাস করিয়া ধনে প্রাণে মারা পড়িলাম।...

যিনি আত্মীয়-কুটুম্ব-সমাজের প্রবল বিরোধিতার মুখোমুখি তাঁর 'অজেয় পৌরুষ' ও 'অক্ষয় মনুষ্যত্ব' নিয়ে সামাজিক কুরীতিগুলির প্রতিরোধ করেছিলেন নিঃশঙ্কচিত্তে, তিনিই যখন ঘুরে দাঁড়াতে চান, তখন মনে হয়, কি অসহনীয় যন্ত্রণায় ক্ষুব্ধ হয়ে বিদীর্ণ-হৃদয়ে তিনি এমন বিপরীত কথা লিখেছিলেন!

দানে যিনি মুক্ত হস্ত ছিলেন, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে, প্রয়োজনে ঋণ করেও যিনি দান করেছেন, তাঁকে কখনও কখনও কীভাবে বিড়ম্বিত হতে হয়েছে, চিঠিপত্রে তার প্রমাণও মেলে। মাইকেল মধুসূদন দত্তকে বিদ্যাসাগরের আর্থিক সাহায্যের কাহিনি কিংবদন্তীতে পর্যবসিত হয়েছে। মধুসূদনকে লেখা বিদ্যাসাগরের একটি চিঠির অংশ বিশেষের উদ্ধৃতি থেকে তাঁর অসহায় মনঃস্থিতি সহজেই অনুমান করা যাবে—

> অনেকের এরূপ সংস্কার আছে, আমি যাহা বলি, কোন ক্রমে তাহার অন্যায় ভাব ঘটে না, সুতরাং তাঁহারা অসন্দিগ্ধ চিত্তে আমার বাক্যে নির্ভর করিয়া কার্য করিয়া থাকেন। লোকের এরূপ বিশ্বাসভাজন হওয়া যে প্রার্থনীয়, তাহার সন্দেহ নাই। কিন্তু আমি অবিলম্বে সেই বিশ্বাসে বঞ্চিত হইব, তাহার পূর্ব লক্ষণ ঘটিয়াছে।
>
> যৎকালে আমি অনুকূলবাবুর নিকট টাকা লই, অঙ্গীকার করিয়াছিলাম, আপনি প্রত্যাগমন করিলেই পরিশোধ করিব; তৎপরে পুনরায় যখন আপনার টাকার প্রয়োজন হইল, তখন যথাকালে টাকা না পাইলে পাছে আপনার ক্ষতি বা অসুবিধা হয়, এই আশঙ্কায় অন্য কোন উপায় না দেখিয়া শ্রীশচন্দ্রের নিকট কোম্পানীর কাগজ ধার করিয়া টাকা পাঠাইয়া দিই। তাঁহার ধার ত্বরায় শোধ করিব এই অঙ্গীকার ছিল। কিন্তু উভয়স্থলেই আমি অঙ্গীকারভ্রষ্ট হইয়াছি এবং ... বিলক্ষণ অপদস্থ ও অপমানগ্রস্ত হইব, তাহার কোন সংশয় নাই।
>
> এক্ষণে কিরূপে আমার মানরক্ষা হইবেক, এই দুর্ভাবনা সর্বক্ষণ আমার অন্তঃকরণকে আকুল করিতেছে এবং ক্রমে ক্রমে এত প্রবল হইতেছে যে রাত্রিতে নিদ্রা হয় না।...

ঋণভারে বিপন্ন বিদ্যাসাগর স্বয়ং সময়মত ঋণ পরিশোধ না করতে পেরে আর একটি চিঠিতে ডাক্তার দুর্গাদাস বন্দ্যোপাধ্যায়কে লিখেছেন— 'আমি নিজ প্রয়োজনের নিমিত্ত ... লই নাই। বিধবাবিবাহের ব্যয়-নির্বাহার্থে লইয়াছিলাম। ... বিধবাবিবাহপক্ষীয় ব্যক্তিরা ... অঙ্গীকৃত সাহায্য দানে পরাঙ্মুখ হইয়াছেন। ... আমি বিপদগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছি। ... ঋণ পরিশোধের সম্পূর্ণ চেষ্টা দেখিতেছি। ... আপন সর্বস্ব বিক্রয় করিয়াও পরিশোধ করিব, তাহার কোন সন্দেহ নাই।'

আবার এই বিদ্যাসাগরই ঘাটালে বিদ্যালয়ের গৃহনির্মাণে ৫০০ টাকার অনটন শুনে একটি চিঠিতে 'আমি স্বতঃপরতঃ তাহা সমাধা করিয়া দিব' বলিয়া অঙ্গীকার করেন।

প্রবঞ্চিত-পীড়িত-ক্লান্ত বিদ্যাসাগর ক্রমেই একক-নিঃসঙ্গ হয়ে পড়েছিলেন। প্রিয়জন, আত্মীয়-পরিজন, শহুরে-সুসভ্য-শিক্ষিত সমাজ সম্পর্কে বীতরাগ বিদ্যাসাগর মধ্যজীবনেই সংসার বিষয়ে নির্লিপ্ত হয়ে পড়েন এবং অকপটে তাঁর মনোভাব চিঠিপত্রে জানান তাঁর পিতা-মাতা, স্ত্রী-ভ্রাতাদের। ১১ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সালে, ৪৯ বছর বয়সে, মাতৃদেবী ও স্ত্রীকে লেখা দুটি পত্রে, কয়েকদিন পর, ২৬ অগ্রহায়ণ পিতৃদেবকে লিখিত পত্রে তাঁর 'মনে সম্পূর্ণ বৈরাগ্য', 'সাংসারিক সুখভোগে ... অনুমাত্র স্পৃহা নাই', 'ক্ষণকালের জন্যও সাংসারিক কোনও বিষয়ে লিপ্ত থাকিতে বা কাহারও সহিত কোনও সংস্রব রাখিতে ইচ্ছা নাই' ইত্যাদি কথাগুলি আছে। পিতৃদেবের পত্রে তিনি আরও লিখেছেন— 'সাংসারিক বিষয়ে আমার মত হতভাগ্য আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সকলকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত প্রাণপণে যত্ন করিয়াছি। কিন্তু অবশেষে বুঝিতে পারিয়াছি, সে বিষয়ে কোন অংশ কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই।' দীর্ঘ এগারো বছর পরে, ১৬ মাঘ ১২৮৭ সালে, প্রসন্নকুমার সর্বাধিকারীকে লেখা পত্রে সেই একই বেদনা প্রকাশ পেয়েছে— 'আমার আত্মীয়েরা আমার পক্ষে বড় নির্দয়; সামান্য অপরাধ ধরিয়া অথবা অপরাধ কল্পনা করিয়া আমায় নরকে নিক্ষিপ্ত করিয়া থাকেন। এই সংস্কার অনেকদিন পূর্বে আমার হৃদয়ে প্ররূঢ় হইয়া ক্রমে বদ্ধমূল হইয়া আসিয়াছে।'

সংসার সম্পর্কে নির্লিপ্ততা, কিন্তু সাংসারিক দায়দায়িত্ব, কর্তব্যকর্ম সম্পর্কে পূর্ণরূপে সচেতন— এমনই ছিলেন বিদ্যাসাগর। শারীরিক অসুস্থতা বা মানসিক অশান্তি যত প্রবলই হোক না কেন, পিতা-মাতা-বন্ধু-আত্মীয়-অনাত্মীয়-পরিচিত-অপরিচিত সকলের জন্য তাঁর হৃদয়ের দরজা সর্বদা খোলা রেখেছেন। শুধু তাই নয়, সকলের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য সুবিধা-অসুবিধার দিকেও ছিল তাঁর পূর্ণ দৃষ্টি, স্বতঃপ্রবৃত্ত হয়ে নানা ব্যবস্থাপনা করেছেন নিজেই। সাংসারিক দায়দায়িত্ব পালনে কোনোরূপ শৈথিল্য ছিল না তাঁর। ভাই শম্ভুচন্দ্রকে লেখা বিভিন্ন পত্রে তাঁর পাঠানো টাকা থেকে কোন মাসে কাকে কত টাকা দিতে হবে তার তালিকা নিয়মিত পাঠিয়েছেন; এমনই একটি চিঠির অংশবিশেষ—

বাটী			৪৪৪
অগ্রহায়ণ		ডাক্তারখানা	
মাতাঠাকুরাণী	৩০	কার্ত্তিক	২২
শম্ভুচন্দ্র বন্দ্যো	৬০	অগ্রহায়ণ	২২
			৪৪
ছোটো বৌ	৮		
সর্ব্বেশ্বর বন্দ্যো	১৫	স্ব-সম্পর্কীয় মাসোহারা	
দ্বারবান	১৫	কার্তিক	৯২
	১২৮	অগ্রহায়ণ	৯২
			১৮৪
			৬৭২

স্কুল

কার্ত্তিক	১৩৮	গ্রামস্থ মাসোহারা	
অগ্রহায়ণ	১৭৮	কার্ত্তিক ৫৫	
	৩১৬	অগ্রহায়ণ ৫৫	১১০
			৭৮২

অর্থের বিলিব্যবস্থার হিসাবে ভ্রাতা শম্ভুচন্দ্র বা অন্য ভাইদের দেওয়া অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি পেয়েছে পরবর্তী মাঘ বা চৈত্র মাসের চিঠিতে, তাদের ৭০টাকা করে দিয়েছেন। শম্ভুচন্দ্রের বাড়ির দেনা শোধ করতেও প্রয়াসী হয়েছেন। স্কুলের খাতে যুক্ত হয়েছে অধিকতর আর্থিক অনুদান। দূর সম্পর্কিত আত্মীয়দের নাম করে করে অর্থদানের ব্যবস্থাও করেছেন। আর্থিক সাহায্য শুধু নয়, যৌথ পরিবারের সকলের সুখ-সুবিধার দিকেও ছিল তাঁর আন্তরিক লক্ষ, যদিও তিনি নিজে সংসার থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন, অনবরত শারীরিক অসুস্থতায় ভুগেছিলেন। এই তেজস্বী, মানসিক শক্তিধর মানুষটির শরীর যে কত অসুস্থ-দূর্বল হয়ে পড়েছিল, চিঠিপত্রের ছত্রে ছত্রে তার পরিচয় মেলে।

১২ অগ্রহায়ণ ১২৭৬ সালে বিদ্যাসাগর কয়েকটি চিঠি লেখেন তাঁর মা, স্ত্রী, ভাইদের এবং দেশের বাড়ির পরিচারককে। এঁদের লেখা সেই চিঠিগুলিতে তিনি সংসার থেকে দূরে থাকার সংকল্প জানিয়েছেন। কয়েকদিন পরে ২৬ অগ্রহায়ণ পিতৃদেবকেও এই মর্মে পত্র লেখেন। এ-সব চিঠিতে বারে বারেই তিনি নানা ভাবে জানিয়েছেন— 'আমার মনের ও শরীরের অবস্থা অতি মন্দ হইয়াছে। অধিক দিন বাঁচিব এরূপ বোধ হয় না।' মাত্র ৪৯ বছর বয়সেই সংসারে বীতস্পৃহ, শারীরিক অসুস্থতায় বিড়ম্বিত হয়ে পড়েছেন বিদ্যাসাগর। বীরসিংহ গ্রামের বীর সিংহরূপে যিনি বিশেষিত হয়েছেন, তিনিই লিখছেন— 'নানা কারণ বশতঃ স্থির করিয়াছি আমি আর বীরসিংহায় যাইব না'। এ-সব চিঠির ছত্রে-ছত্রে তাঁর যন্ত্রণার, বেদনার, বঞ্চনার ইতিহাস লুকিয়ে আছে। ১২৭৬ সালের চিঠিপত্রে অসুস্থতার যে উল্লেখ আছে, দুঃখের বিষয়, পরবর্তী কালে লেখা চিঠিগুলিতেও বারে বারে সেই অসুস্থতার কথা এসেছে। কয়েকটি চিঠির তারিখসহ অংশবিশেষ উল্লেখ করা হচ্ছে —

১৯ পৌষ ১২৮২, রাজা কালীনারায়ণ রায় বাহাদুরকে লেখা পত্রে— 'আমি আষাঢ় মাসে অতিশয় অসুস্থ হইয়াছিলাম।'

১৬ মাঘ, ১২৮৪, বন্ধু ব্রজনাথ মুখোপাধ্যায়কে লেখা পত্রে— '১৫-১৬ দিন হইতে শিরোরোগ ও নিদ্রার ব্যাঘাত বিলক্ষণ হইয়া উঠিয়াছে। একেই অতিশয় দুর্বল তাহাতে এই কয়দিনে একেবারে অকর্মণ্য হইয়া পড়িয়াছি।'

১ চৈত্র ১২৮৫ ও ১৫ মাঘ ১২৮৭ তারিখের পত্র দুটিতেও 'অতিশয়', 'বিলক্ষণ', 'অত্যন্ত' অসুস্থতার কথা আছে।

২ আষাঢ় ১২৯০ ও ২৯ আশ্বিন ১২৯০-এর পত্রে 'আমি চৈত্র বৈশাখ দুই মাস শয্যাগত' ও 'আমি পীড়িত হইয়া শয্যাগত আছি' জানিয়েছেন।

১ আষাঢ় ১২৯১ সালে পৌত্রী মৃণালিনীকে লিখেছেন— 'প্রায় একমাস হইল আমার পেটের অসুখ হইয়াছে। ... অতিশয় দুর্বল হইয়াছি'।

৩ চৈত্র ও ২৬ চৈত্র ১২৯১ এবং ৩০ বৈশাখ ১২৯২ তারিখে পুত্রবধূ ভবসুন্দরীকে লেখা তিনটি চিঠিতে 'অদ্যাপি সম্পূর্ণ সুস্থ হইতে পারি নাই' কথাগুলি এসেছে।

১ শ্রাবণ ১২৯৭ লিখছেন— 'প্রায় এক পক্ষ হইল আমি অতিশয় অসুস্থ ও দূর্বল হইয়াছি'।

১৮ জ্যৈষ্ঠ ১২৯৮ লিখছেন 'আমার অবস্থা ক্রমে মন্দ হইয়াছে। এক দিনের জন্যও সুস্থ নাই'।

চিঠিপত্রে বিদ্যাসাগরের শারীরিক অসুস্থতার কথা ১২৭৬ সাল থেকে ১২৯৮ সাল পর্যন্ত পাওয়া যাচ্ছে। বাইশ বছরের এই দীর্ঘ সময়সীমায়, ৪৯ বছর থেকে নিয়ে ৭১ বছর বয়স পর্যন্ত অর্থাৎ মৃত্যুর আগে পর্যন্ত তিনি ক্রমেই অসুস্থ থেকে অসুস্থতর হয়েছেন। কিন্তু তাঁর যথোপযুক্ত চিকিৎসার ব্যবস্থা হয়েছিল কি না, চিঠিপত্রে তার কোনো উল্লেখ নেই।

লোকহিতৈষণা যাঁর স্বভাব-ধর্ম ছিল, অপরের অভাববোধে যিনি উদ্বেলিত হতেন, সেই বিদ্যাসাগরের শারীরিক মানসিক ক্লেশের সংবাদে পাঠকমন স্বভাবতই ব্যথিত বিচলিত হয়, তাঁর জন্য বেদনাবোধ হতে থাকে। কারণ পত্রগুচ্ছের মধ্যে দিয়ে তিনি তাঁর অসামান্য মহিমা সত্ত্বেও নেমে এসেছেন সাধারণ পাঠকের মনের কাছাকাছি, তাদের কাছের মানুষ হয়ে পড়েছেন, হয়ে পড়েছেন পরিচিত অন্তরঙ্গ মানুষ।

শহীদ কাদরী : বাংলা কবিতার এক জ্যোৎস্নাময় অধ্যায়

কুমার দীপ*

কেবল চিত্রকরই নন, নন্দনশিল্পের সকল শাখার লোকেরাই ছবি আঁকেন। গল্পকার গল্পের মাধ্যমে, নাট্যকার নাটকের বরাত দিয়ে এবং কবি আঁকেন কবিতার পংক্তিতে। সকলেই আসলে জীবনের ছবিই অঙ্কন করেন বা করবার চেষ্টা করেন। এই ছবি আঁকবার কাজে যিনি যত বেশি পারদর্শিতা বা অভিনবত্ব দেখাতে পারেন, তাঁকেই ততো বড়ো জীবনশিল্পী হিসেবে সম্মান জানানো হয়। তবে অন্য যে কোনো শিল্পশ্রেণি অপেক্ষা কবিতায় ছবি আঁকাই সবচেয়ে অভিনব এবং আশ্চর্য অনুভূতিদায়ক। অতল গভীরতাস্পর্শীও বটে। বাংলাদেশের কবিতার এক পৌরুষদীপ্ত চরিত্র শহীদ কাদরী এরকমই অভিনব ও আশ্চর্য অনুভূতিদায়ক কিছু কাব্যছবির স্রষ্টা; যিনি শহরে থেকেও বঙ্গ-নিসর্গকে কবিতা নির্মাণের অন্যতম অনুসঙ্গ করে তুলেছেন।

খুব তরুণ বয়সেই কবিতা লিখে শামসুর রহমানের মতো মহান অগ্রজের দৃষ্টি আকর্ষণে সক্ষম হয়েছিলেন শহীদ কাদরী। পেয়েছিলেন ঘনিষ্ঠ সান্নিধ্য। আরেক অগ্রজ আলমাহমুদও তাঁকে দিয়েছিলেন বন্ধুত্বের মর্যাদা। হাসান হাফিজুর রহমানের মতো পূর্বজ কবি-সমালোচকের নিকট থেকে অল্পেই আদায় করে নিয়েছিলেন কবি সম্মান। অথচ বাংলাদেশের যেকোনো কবি, অল্পকবি কিংবা অ-কবির তুলনায় তাঁর কবিতা ও কাব্যসংখ্যা শোচনীয়ভাবে অল্প। কবিতার সংখ্যাগত দিক থেকে কেবল তিরিশোত্তরকালের অন্যতম প্রধান কবি সুধীন্দ্রনাথ দত্তের সাথেই তাঁর তুলনা চলে। ১৯৬৭ সালে প্রথম কাব্য 'উত্তরাধিকার' প্রকাশের সাত বছর পর ১৯৪৭ সালে 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'; পাঁচ বছর পর তৃতীয় কাব্য 'কোথাও কোনো ক্রন্দন নেই'; এর তিন দশকেরও বেশি সময় পরে ২০০৯-এ মার্কিন প্রবাসে অবস্থানকালে প্রকাশিত হল 'আমার চুম্বনগুলি পৌঁছে দাও'। কাব্য প্রকাশে এমন দীর্ঘ বিরতি যে তুলনারহিতপ্রায় তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

২.

কাদরীর কবিতায় ছবির যে নান্দনিক উপস্থাপন চোখে পড়ে, মাসনচক্ষে অপরূপ দোলা দেয় তার অপূর্ব রূপায়ণ গ্রন্থভুক্ত প্রথম কবিতাটিই। শহরের বুকে হঠাৎ বৃষ্টি নেমে এলে, বিদ্যুৎ চমকালে বা বজ্রপাত হলে যে চিত্র তৈরি হয় তার অনুপম উপাখ্যান। অনিন্দ্য সব উপমা-চিত্রকল্পে ঠাসা কবিতাখানিতে দেখা যায় সন্ধ্যায় সহসা সন্ত্রাসে আক্রান্ত মানুষের মতো বৃষ্টি আক্রান্ত মানুষগুলো, কবির ভাষায় 'ঝাঁকে ঝাঁকে লাল আরশোলার মতো দৌড়াচ্ছে'। এমন সময় সবাইকে ঘাবড়ে দিয়ে চমকে ওঠে বিদ্যুৎ। কবির কলমে চিত্রায়িত হল ভয়ঙ্করের নান্দনিক চিত্রকল্প, 'সুগোল তিমির মতো আকাশের পেটে / বিদ্ধ হল বিদ্যুতের উড়ন্ত বল্লম!' লক্ষ লেদ মেশিনের শব্দ

*** প্রাবন্ধিক, ঢাকা, বাংলাদেশ।**

সৃষ্টিকারী এই বজ্রের আবির্ভাব, মেঘ, জল, হাওয়া সবকিছু মিলিয়ে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয় তাতে বিপদগ্রস্থ হয় ঘর-দোর, ডানা মেলে দিতে চায় জানালা কপাট, শহরের প্রাচীন বাড়িটি যে টিরোনসিরসের মতোন নড়ে ওঠে! আর জল! 'বিমর্ষ স্মৃতির ভার নিয়ে সহর্ষে সদলবলে / বয়ে চলে জল পৌরসমিতির মিছিলের মতো নর্দমার ফোয়ারার দিকে'। বৃষ্টির জলের বয়ে চলা দেখেছি আমরা, এমন মিছিলের মতো অনুভব করেছি ক'জন? আর সেই জলে, সিগারেট টিন, ভাঙা কাঁচ, সন্ধ্যার পত্রিকা, রঙিন বেলুন... ইত্যাদি ভেসে যায় ঘুঙুরের মতো! কাদরীর কবিতায় বৃষ্টির ছবি মেলে বার বার; ভিন্ন ভিন্নরূপে। 'ভরা বর্ষায় : একজন লোক' কবিতায় বৃষ্টি তার লম্বা আঙুল দিয়ে একজন লোককে হাতড়ে দেখে; তার স্বপ্নের দেয়ালে হলদে স্যাঁতসেতে চিত্র আঁকে। আর 'তোমাকে অভিবাদন প্রিয়তমা'র 'ছুরি' কবিতায় দেখি, 'তীক্ষ্ণ ছুরির ফলার মতো চতুর্দিক বৃষ্টি পড়ে'। বৃষ্টি আছে আরও দু'চারটি কবিতায়। কিন্তু বৃষ্টি নয়, শহীদ কাদরী জ্যোৎস্নারই পাঁর ভক্ত। তাঁর বেশ কিছু কবিতায় জ্যোৎস্নারাতের তীব্র প্রভাব রয়েছে। আছে জ্যোৎস্নালোকের অপরূপ সব চিত্রমালা। 'নশ্বর জ্যোৎস্নায়' দেখা যায় কবি জ্যোৎস্নামুগ্ধ হয়ে চোখের বিষাদ বদলে নিয়ে, 'হতাশারে নিঃশব্দে বকুল তলায়' বিছিয়ে রাখতে চেয়েছেন। ভেবেছেন ভবিষ্যপ্রসারী এক অনিন্দ্য চিত্রকল্পরস—

> পরিত্যক্ত মূল্যবোধ, নতুন ফুলের কৌটোগুলো
> জ্বলজ্বলে মণির মতন সংখ্যাহীন জ্যোৎস্না ভরে নিয়ে
> নিঃশব্দে থাকবে ফুটে মধ্য-বিশ শতকের ক্লান্ত শিল্পের দিকে চেয়ে
> —এইমতো নির্বোধ বিশ্বাস নিয়ে আমি
> বসে আছি আজ রাত্রে বারান্দার হাতল-চেয়ারে
> জ্যোৎস্নায় হাওয়ায়।

জ্যোৎস্নার, বিশেষত বঙ্গজ্যোৎস্না আর তার আধার চাঁদের সৌন্দর্য অপরূপ। এবং অপরূপ জ্যোৎস্না-চাঁদকে নিয়ে বাংলা কবিতায় লোফালুফিও হয়েছে অপরূপতায় অপরিমেয়। কত কবি যে তাকে কত ভঙ্গিতে রূপায়িত করেছেন তার কোনো পরিসংখ্যান মেলানো ভার। আধুনিক কবিতায় চাঁদ তার চিরকালের নম্ররূপ পরিত্যাগ করে কখনও 'কাস্তে'; কখনও আবার 'ঝলসানো রুটি'রূপে ধরা দিয়েছেন। আরো পরে এসে 'আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মী' কিংবা 'ডাগর ক্ষতের মতো' চিত্রায়িত হয়েছে। কাদরীর কলমে এই চাঁদ 'বাউলের একতারার মতো' বেজে ওঠে; কখনও বাখানে ঝুলে থাকে 'জবার মতো' লাল হয়ে।

প্রেম নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতার কবিতা 'সমকালীন জীবন দেবতার প্রতি'। এখানে উদ্দীষ্ট নারীটির অশ্রুর সাথে সখ্য ঘটেছে চাঁদের। কবি বলেছেন, 'এই তো সখ্যতা তোমার দিগন্তে গেঁথে দিল শুধু নির্বীজ কান্নার মত একফোঁটা চাঁদ, অনুধ্যানে যার / জোটে না মাধুরীকণা মনে হয় নিঃশেষিত সকল গেলাস!'। এই কবিতাতেই আবার নারীকে 'মাঝরাতের মন্ত্রে-তন্ত্রে ভরা চন্দ্রের' মতো মনে হয়েছে। এছাড়া চাঁদের অনিন্দ্য অস্তিত্ব আছে বন্ধুকবি রফিক আজাদকে নিবেদিত 'নিসর্গের নুন' কবিতায়। তবে চাঁদ এখানে কেবল সৌন্দর্যের প্রতীক নয়, ব্যতিক্রমী

ঐতিহ্যেরও আধার। নিসর্গের নিকট অকপটে ঋণস্বীকারকারী কবি এই কবিতার শেষে বলেন:

ইচ্ছে ছিলো কেবল তোমার নুন খেয়ে আজীবন
গুণ গেয়ে যাবো
অথচ কদ্দিন পরে বারান্দা পেরিয়ে
দাঁড়িয়েছি ঝোপে
ধারালো বটির মতো কোপ মেরে
কেন যে, কেন যে
দ্বিখণ্ডিত করছে না
এখনও সুতীক্ষ্ণ বাঁকা
ঐ বঙ্গদেশীয় চাঁদ!

যদিও চাঁদই শেষ পর্যন্ত উক্ত কবিতায় প্রাধান্য পেয়েছে, তবু একতাও উল্লেখের দাবি রাখে যে, 'নিসর্গের নুন' কবিতাটিতে কেবল চাঁদ নয়, নিসর্গের অন্যান্য অনুষঙ্গও উঠে এসেছে অনন্য রূপময়তায়। তবে হ্যাঁ, নিসর্গের সে অনুসঙ্গসমূহ নয়, এই কবিতার আসল বিষয় কিন্তু কবিত্বের আত্মবঞ্চনাহেতু বাংলার প্রতি একধরনের বিদ্রূপও জেগেছে মনে। 'চন্দ্রালোকে' কবিতাখানি তো বিশাল্যকরণির অনিবার্যতা নিয়ে হাজির হয়েছে চাঁদ; হয়ে উঠেছে সুরললিত প্রেম অন্যদিকে অনন্য সৌন্দর্য নির্ভর চিত্রকল্পে ভরা কবিতা 'নর্তকী'তে চাঁদকে দেখি নর্তকীর শরীরী সৌন্দর্যের উপমায়। তবে চাঁদকে নিয়ে অত্যন্ত রূঢ় অথচ অনায়াস স্বাচ্ছন্দ্যময় কবিতা 'চন্দ্রাহত সাঙাত্'। এর শুরুতেই কবি বলেন, 'দ্যাখো, দ্যাখো, দ্যাখো হে সাঙাত্ / কী ইত্রামি জানে অই চাঁদ / অপেক্ষায় কল্কে জ্বলে গ্যালো, সাঁঝ-রাত/ আইলো না উঁচু ঢিবি থেকে নেমে রূপায় মোরগ'। চাঁদকে এমন অপূর্ব রূপার মোরগরূপে চিত্রায়িত করার অব্যবহিত পরে পুনরায় সেই চাঁদকে যখন কবির মনে হয়, 'নোংরা জলে ভেসে এলে যেন পাতিহাঁস', তখন অবাক না হয়ে পারা যায় না। কিন্তু এর ব্যাখ্যাও যেন দিয়ে দিতে চান কবি। বলেন, 'আন্ধা যে সে বান্ধা পড়ে যায় এমন হঠাৎ / কোকিলও মাঝে মাঝে বনে যায় কাক'। তবু রোমান্টিক-এন্টিরোমান্টিক যেভাবেই দেখতে চান, চাঁদ ও চন্দ্রিমাই যে কবির আসল স্যাঙাত্ সেকথাও স্বীকার করেন। চাঁদকে নিয়ে মাঝে মধ্যে অত্যন্ত নেতিবাচক চিত্র তৈরি করলেও চাঁদের আলো তথা জ্যোৎস্নাকে নিয়ে অত্যন্ত ইতি-আপ্লুত শহীদ কাদরী। প্রবল জ্যোৎস্নামুগ্ধ কবি 'একবার দূর বাল্যকালে' কবিতায় জ্যোৎস্নাকে নীরব-দূরস্থায়ী নৈসর্গিক সৌন্দর্য অপেক্ষা গৃহ ও গৃহস্থালী পরিবেশেই বেশি মানানসই রূপে অনুভব করেছেন। লিখেছেন,

জ্যোৎস্না শুধু ধ্যানমৌন পাহাড়ের চূড়ায় কোনো
ত্রিশূলদেহ একাকী দরবেশ কিংবা হিমালয়ের পাদদেশে,
তরাই জঙ্গলের অন্ধকারে, ডোরাকাটা বাঘের হলুদ শরীর নয়,
বরং ছাদ থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে পোষমানা পায়রা যখন ওড়ে,
তখনও জন্মায় জ্যোৎস্না; ঝরে পড়ে গৃহস্থের সরল উদ্যানে।

দেখেছেন,

জ্যোৎস্নার জ্বলজ্বলে লাবণ্য
আজীবন খুচরো পয়সার মতো পার্কে, ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে
ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে থাকে।

কী নান্দনিক জ্যোৎস্নাকাব্যচিত্রায়ণ!

প্রকৃতপ্রস্তাবে, শহীদ কাদরীর কবিতায় জ্যোৎস্না সর্বপ্লাবী। ক্যাপটেনের বুটের ভেতরেও সে কুণ্ডলী পাকিয়ে শুয়ে থাকে; মানবশরীর থেকে বের হওয়া যে বর্জ্য, সেই পরিত্যক্ত প্রস্রাবও ঝলমল করে জ্যোৎস্না মেখে! কোথাও আবার শিশিরের টলটলে ফোঁটার ভেতর জ্যোৎস্না হয়ে ওঠে করোগেট শিট। কাদরী যখন বলেন, 'রাত্রে গাছের পাতায় আর ঘাসের ফাঁকে ফাঁকে / খুচরো পয়সার মতো ছড়ানো জ্যোৎস্নারাজি দেখে / ভিক্ষুকের মতো বারবার আমিও দাঁড়িয়েছি / হাতের রুক্ষ তালু প্রসারিত করে'। তখন অনুভব করা যায় কী ব্যাপক জ্যোৎস্নাবুভুক্ষু তিনি! আর যখন বলেন, 'মেধার চেয়েও মেধাবী জেনেছি জ্যোৎস্নাকে'; তখন বুঝতে বাকি থাকে না যে, জ্যোৎস্না কবির কাছে কেবল সৌন্দর্যের সীমানায় প্রস্ফুটিত কোনো কুসুমমাত্র নয়, জ্যোৎস্নাকে কবি অন্য অনেক বস্তু বা প্রাণের প্রকৃতি স্বরূপ এবং রূপ-রহস্য আবিষ্কারের পাথেয় হিসেবে ব্যবহার করেছেন। টেলিফোনের ও প্রান্তে কোনো নারীকণ্ঠ শুনে প্রথম যৌবনে কবি যখন বলেন, 'কী জ্যোৎস্না কণ্ঠস্বরে!' তখন জ্যোৎস্না আর আকাশের কার্নিশে ঝুলন্ত চাঁদের আলোমাত্র থাকে না, হয়ে ওঠে একটি রোমান্টিক চেতনার নাম। এই চেতনা থেকেই তিনি জ্যোৎস্না কিংবা জ্যোৎস্নার আধার চাঁদকে অবলোকন করেন বিচিত্র মধুরতায়। এমনকি সুদূর মার্কিন মুলুকে থেকেও তিনি বিদিশার তীরে বসে চন্দ্রজ্যোৎস্নাকে উপভোগ করেন পরম আগ্রহ ভরে। অনুজ, অনুরক্ত কবি হাসান আল আবদুল্লাহের সাথে কতার ফাঁকেই বলে ওঠেন, 'টাকা জমাচ্ছি, পূর্ণিমার ওই চাঁদটা আমি কিনবোই।' এমনকি প্রবাসে থেকে লেখা সর্বশেষ কাব্য (এখনও পর্যন্ত) 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও'; যেখানে তিনি মূলত দীর্ঘ প্রবাসজীবনের যন্ত্রণাকেই বড়ো করে দেখিয়েছেন, মা-মাটি আর শেকড়ের টানে, স্বাধীনতা ও সমাজতন্ত্রের টানে আলোড়িত হয়েছেন, সেখানেও 'সাদা খরগোশের মতো কম্পমান' (বিব্রত সংলাপ) অবস্থায় আবির্ভূত হয়েছে চাঁদ। বৈরি সময়কে অসাধারণ নান্দনিক রূপকল্পে উপস্থাপন করেছেন কবি। বলেছেন :

অমাবস্যার পুঞ্জ পুঞ্জ অন্ধকার
একদল কালো মুখোশ পরা
ডাকাতের মতো
শিকার করতে চাইছে সাদা খরগোশের মতো কম্পমান
চাঁদটাকে।

বস্তুত, দীর্ঘ প্রবাসজীবনে থাকলেও, দীর্ঘ সময় ধরে কবিতা না লিখলেও, বাংলাদেশের মানুষ ও তার কর্মকালকে প্রকৃতির দূর থেকেই যে অত্যন্ত নিবিড় পর্যবেক্ষণ করেন তার প্রমাণ 'আমার চুম্বনগুলো পৌঁছে দাও'—তে প্রবাসজীবনের যন্ত্রণা, স্বাধীনতা, সমাজতন্ত্র আর শেকড়ের প্রতি আকর্ষণের তীব্রতা ব্যক্ত হয়েছে; তবে এগুলোর মাঝেই যে বঙ্গনিসর্গ আর বাঙালিকে দারুণভাবে

উপলব্ধি করেছেন সেকথা বলাই বাহুল্য। প্রকৃতপক্ষে, মাইকেল মধুসূদন দত্ত যেমন ফ্রান্সে বসেও সাগরদাঁড়ি আর কপোতাক্ষ নদের কথা ভুলতে পারেননি, শহীদ কাদরীও তেমনি বিপরীত গোলার্ধের আমেরিকায় দিনাতিপাত করলেও তাঁর কবিতায় ফল্গুধারার মতো বয়ে চলেছে শ্রাবণের রাঙা জল; আষাঢ়ের ঘন মেঘের এবং শাড়ি পরা বাংলার মায়েদের দীর্ঘ ছায়া পড়ে আছে তাঁর কবিতার ওপর। বাংলার বর্ষণমুখর রাত্রির কালো হাওয়া যেমন অনুভব করেন মার্কিন মুলুকে বসে, তেমনি বাংলার সোনালী খড়বাহী গরুর গাড়ির মতো মন্থর গতিতে বয়ে চলে তাঁর কবিতা। বস্তুত, যত দূরেই থাকুন কাদরী, বাংলা মায়ের শাড়ির আঁচল আর বাংলার মাটির সোঁদা গন্ধ তাকে ছেড়ে যায়নি। পশ্চিমের প্রবল শীতেও বাংলার মমতা কবিকে উষ্ণ পোষাকের মতো আবৃত করে রাখে; কবির হৃদয়ের ক্যানভাসে ভাসে চিরায়ত বাংলার ছবি।

৩.

শহীদ কাদরী নাগরিক কবি। নগরজীবনই তাঁর কবিতার প্রধান উপাদান। চাঁদ-জ্যোৎস্না ছাড়া নিসর্গের আর কোনো উপাদানই তাই বিশেষ স্থান করে নিতে পারেনি তাঁর কবিতায়। এখানে জোনাকি আছে, তারা সোনালী জরির মতো নকশা জ্বেলে দেয়, অমাবস্যার অন্ধকারে গোলাপঝাড়ের মতো পুঞ্জ পুঞ্জ ভরে থাকে সে জোনাকিও আবির্ভূত হয় জ্যোৎস্না কিংবা অন্যকিছুর অনুষঙ্গ হিসেবে; বলা যায়, জোনাকির যে একটা স্বতন্ত্র ও সৌন্দর্যময় অস্তিত্ব রয়েছে তার উপস্থিতি নেই বললেই চলে। কাদরীর কবিতায় শর্করার মতো রাশি রাশি নক্ষত্রবিন্দুর দেখা পাওয়া যায়; হীরার কৌটোর মতো শিশির টলটল করে ফুটপাতে শুয়ে থাকা ন্যাংটো ভিখিরির নাভিমূলে; কবি নিজেও ওষুধের ফোঁটার মতো বিন্দু বিন্দু গলঃধকরণ করতে চান প্রতিশ্রুতিশীল শিশির; গাছ-মাছ-জলসহ সকল গ্রাম্য আবহই দু-একবার হাজির হয়েছে তাঁর কবিতায়; নিসর্গকে নিপুণ জেলেবলেও ভেবেছেন কখনও-বা; নিসর্গের আকর্ষণে বারবার যেতেও চেয়েছেন গ্রামে; তবুও, নৈসর্গিক চিত্র অথবা পল্লীপ্রধান বাংলাদেশ, কোনোটাই কাদরীর কবিতার কেন্দ্রীয় বিষয় নয়। বরং নগরের বাসিন্দা বলেই হোক আর নাগরিকতার সর্বগ্রাসীরূপের প্রভাবেই হোক, নগরজীবনই তাঁর কাব্যের প্রধান উপাদান। এমনকি তিনি যখন নৈসর্গিক কোনো উপাচারের নান্দনিক পংক্তি উপস্থাপন করেন, তখনও নগর ও নাগরিক ভঙ্গি এবং ভাষাপ্রয়োগেও নাগরিকতা লক্ষ করা যায়। তারপরও, বঙ্গপ্রকৃতি আর বাংলার নিসর্গের যে ছবিগুলো তিনি আঁকেন, যে মমতায় আঁকেন তা কেবল কাব্য হিসেবেই নয়; স্বদেশ, স্বজাতি এবং স্বনিয়ন্ত্রিত জীবনদর্শনেরও অনিন্দ্য নান্দনিকতার অসামান্য প্রতীক। প্রকৃত প্রস্তাবে, কাদরীর একটি বা দুটি কবিতা নয়, সমগ্র কবিতাপাঠেই রূপসী বাংলার নিসর্গকে অনিন্দ্য চিত্রময়তায় অনুভবযোগ্য করা যায়। কেবল নিসর্গঋদ্ধ কবিতা নয়, সমগ্র কবিতা প্রসঙ্গেই শহীদ কাদরী অনন্য প্রতিভা; বাংলা কবিতার এক অনিন্দ্য জ্যোৎস্নাময় অধ্যায়।

শশীভূষণ দাশগুপ্ত : মননসাহিত্যের এক জ্যোতিষ্ক

স্বামী শাস্ত্রজ্ঞানন্দ*

সাহিত্যের প্রাঙ্গণে জীবনের কত আলো যে ধরা পড়ে, সাহিত্যও তা জানে না সবসময়, জীবনও তা বুঝতে পারে না সবসময়। আমাদের সভ্যতার জীবনজিজ্ঞাসার আদিমন্ত্রে তদানীন্তন যতকিছু উত্তরহীন প্রশ্নগুলি ধরা পড়েছিল, অগ্রসর সভ্যতার এই প্রখর আলোক-উজ্জ্বল দ্বিপ্রহরে তার সবকটির রহস্য সমাধান হয়ে গেছে, এমন তো মনে হয় না। মেধা, প্রযুক্তি, আর্থ-সাংস্কৃতিক ক্ষমতায়নের উচ্ছল কাল দেউলে। আমরা হয়তো অনেকগুলিকেই উপেক্ষা করেছি, বাতিল করেছি, পরিপ্রশ্নের আকারে ধেয়ে আসার সময় ধমক দিয়ে থামিয়ে দিয়েছি আমাদেরই স্বঘোষিত বুদ্ধিজীবীত্বের আস্ফালনে, কিন্তু তাতেই তো না ফোটা ফোলার মতো তারা ঝরে পড়েনি ধরণীতে। বরং মনীষার জগতে বিরল কিছু কষ্টিপাথরে তাদের নিরীক্ষা হয়েছে সযত্নে। নদী-ক্ষেত-মেঘ-বর্ষা, সাপ-শালুক-এঁদো-মাটি ভরা বাংলার মানবজমিনে এমন উত্তরহীন প্রশ্ন নিয়ে এসেছিল বৌদ্ধ-তন্ত্র-বৈষ্ণব-বাউল-নাথ-সুফি সাধনায় মশগুল একদল মানুষ। তাদের ঈশ্বর-সাধনা সনাতন ভারতীয় দর্শনকে অবজ্ঞা করে নি, বরং গ্রহণ করেছে; অথচ সে সাধনায় বিমূর্ত কল্পনার কষ্টসাধনা নেই, মূর্ত দেহের দেবায়ন-সম্ভাবনাই অভিব্যক্ত। আমরা সেই সাধনার বেদভূমিজাত সাহিত্যসৃষ্টিগুলি পড়ি নিজেদের মতো ধারণা নিয়ে, আভিপ্রায়িক তাৎপর্যে প্রবেশের অধিকার থাকে না বা হয়তো সচেতনভাবে রাখতেও চাই না; কিন্তু এই বিপুল ঋদ্ধভাণ্ডার যে আমাদেরই। আজ খুব মনে হয়, আমাদের এই দারিদ্র্য দূর করার দায় একাই যেন নিয়েছিলেন ড. শশীভূষণ দাশগুপ্ত। বিস্ময়জাগানিয়া মেধা আর সম্ভ্রম সৃষ্টিকারী পরিশ্রমী অনুসন্ধিৎসা নিয়ে ড. দাশগুপ্ত প্রাক্-আধুনিক বাংলা সাহিত্যের অন্তরালভূমিতে থাকা হাজার বছরের এক অন্য কল্প-সাধনার অনন্য আখ্যান তৈরি করেছেন।

শশীভূষণ দাশগুপ্তের 'Obscure Religious Cults' গ্রন্থটির প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৪৬-এ। আমরা সকলেই জানি এটি তাঁর পি এইচ ডি ডিগ্রির গবেষণা পত্র। এটি তিনি ১৯৩৯ সালেই লেখা শেষ করেছিলেন। নিজেই জানিয়েছেন যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের ফলে জাত কাগজের আকাল গ্রন্থটির প্রকাশের ক্ষেত্রে দেরি হওয়ার কারণ। গ্রন্থটির দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬২-তে। আর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হয় ১৯৬৯-এ। তিনটি সংস্করণে যে তিনি কোনও বিপুল পরিমার্জন-পরিবর্ধন করেছিলেন এমন নয়। গ্রন্থটি উৎসর্গ করেছিলেন ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে। পুরো বইটাকে তিনি মোটামুটি পাঁচটি ভাগে ভাগ করেছেন। এর মধ্যে প্রথম চারটি ভাগকে Part I, II, III, IV নামে চিহ্নিত করেছেন। আর পঞ্চম ভাগটি আসলে Appendix।

---

* অধ্যক্ষ, রামকৃষ্ণ মিশন বিদ্যামন্দির, বেলুড়।

এটির আবার পাঁচটি অংশ। এই পঞ্চম অংশটি আমাদের এই আলোচনায় তত গুরুত্বপূর্ণ নয়।

Part I যেটি তার নাম 'The Buddhist Sahajiya Cult'। এখানে আছে চারটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়ে বৌদ্ধ সহজিয়া উদ্ভব নিয়ে আলোচনা আছে। দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ অধ্যায়ে আছে এই ধর্মমতের দার্শনিক ও সাধন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা। গভীর মনোনিবেশ সহ তিনি খুঁজে পেতে চেয়েছেন আমাদের এই নদী-পুকুর-জলা-মাটি বিধৌত দেশে দুটি দার্শনিক ও ধর্মাচারণের ধারার সংযুক্তির নানা দিককে। কোনো ভুল নেই যে তান্ত্রিক ধারা বলতে আমরা আজও যা বুঝি তা অনেকটাই খণ্ডিত, কারণ আমাদের ভাবনালোকে 'তন্ত্র' শব্দটি আসলে বামাচারের ধ্বনি ও প্রায়োগিক আবহকে বহন করে আনে। তান্ত্রিক শব্দটি যেন এক বিশেষ ধরনের সাধককে বোঝায় যারা বলি-মদ্য- মাংস-নারী শরীর প্রভৃতিকেই বুঝি সাধনার একমাত্র উপাদান বা যন্ত্র বা তত্ত্ব বলে মনে করেন। ধারণাটির মধ্যে জনপ্রিয়তা যতই থাক, এর আকর্ষণীয়ত্ব, সারগর্ভত্ব নেই একটুও এতে। তবে সে আলোচনা অনেক দুরবগাহী দর্শনের আলোচনা। শশীভূষণ বুঝেছিলেন বৌদ্ধিকতা ও তান্ত্রিকতার দার্শনিক এবং প্রায়োগিক অধঃপতনের যুগে জন্ম নেওয়া সহজিয়া বৌদ্ধ তান্ত্রিক ধর্মের মধ্যে কয়েকটি পরিবর্তিত তাত্ত্বিক ক্ষেত্র রয়েছে যা কিনা এই দুই ধারার কয়েকটি উল্লেখযোগ্য মূল বক্তব্যকে আমাদের সামনে এনে দেয়। বজ্রসত্ত্ব আর বোধিচিত্তের ধারণার মধ্যে যে একটি সংযোগের পথ রয়েছে, তা তন্নিষ্ঠ পাঠের সূচনাতেই বোঝা যাবে। বোঝা যাবে যে শূন্যতা আর করুণার প্রাচীন দুটি বৌদ্ধ তত্ত্ব প্রজ্ঞা আর উপায় নামক দুটি অর্বাচীন তত্ত্বের সাথে একটি অদূরগত সম্পর্কে যুক্ত। শশীভূষণ দেখিয়েছেন চর্যাপদের আভিপ্রায়িক ভাবনাঋদ্ধ ভাষারূপে এরকম অজস্র ধারণার গীতিছবি রচিত হয়ে আছে।

আসলে আমরা যেন ভুলে না যাই যে বৌদ্ধ সঙ্গীতীগুলি বৌদ্ধ দর্শনের নানা অতিসূক্ষ্ম ভাবনাগুলিকে নিয়ে একসময় চুলচেরা বিচার করেছে। বৌদ্ধ দর্শন যা উদ্ভূত হয়েছিল পূর্বমীমাংসা দর্শনের জটিল বাক্যবিচার ও আচরণবাদী আধ্যাত্মিকতার বিকল্প হিসেবে আর উত্তর মীমাংসার সমতুল্য কিছু ধারণার পারিভাষিকতা পরিবর্তনের পথে, তাই কিন্তু সহস্রাব্দের উপলবিকীর্ণ পথে ধীরমন্থর যাত্রায় খ্রিস্টীয় দ্বিতীয় সহস্রাব্দের ভূমিকাদ্বারেই ফিরে গিয়েছিল পূর্ব মীমাংসার আচরণ কেন্দ্রিকতায়। পাশাপাশি বৈদিক সাহিত্যে বিমূর্ত চৈতন্যতত্ত্বের শক্তিপ্রকাশিকা ভাবনাটি বাক্, মেধা, নীলা, শ্রী, দুর্গা, দেবী, রাত্রি প্রভৃতি বিমূর্ত নারী-কল্পতত্ত্ব নির্মাণ করেও যখন সাধারণ মানব-সাধনার প্রয়োজন-আকীর্ণ সংকট-সমস্যার মুখোমুখি দাঁড়িয়ে অনাদৃত থেকে যাচ্ছে, তখনই মূর্ত দেহকে দেহীর দুর্গতোরণে পৌঁছে যাবার উপায় রূপে শিব-শক্তি তত্ত্বকে আনার প্রযত্ন দেখা দিল। সেই সরলীকরণের এবং সাধারণীকরণের শ্রমসাধ্য প্রয়াসে যোগ্য সহায়তা করেছিল ভারতীয় দর্শনের দুটি সমতন্ত্র ধারা — মনস্তত্ত্বমুখী সাংখ্যদর্শন আর প্রায়োগিক যোগদর্শন। খ্রিস্টপূর্ব সময়ের অনাড়ম্বর এবং সাম্প্রতিকের তুলনায় সরল জীবনবোধে এই নতুন ধারা ছিল বৈদিক দার্শনিকতার সমান্তরাল অথচ সহযোগী, প্রতিযোগী নয়। কিন্তু সময় চিরকাল পরিবর্তনের বিচিত্র জোয়ার আনে। তা ভাল হবে না খারাপ হবে, তা সময়ের জাতকরাও বুঝতে পারেন না,

জনকেরাও পারেন না। যে পরিবর্তনকে সূচনার ঊষাকালে প্রতিশ্রুতিমান মঙ্গল বলে বোধ হয়, প্রবাহমধ্যাহ্নে তারই শরীরে অজানিত-পূর্ব অমঙ্গলের দুরারোগ্য ব্যাধি দুর্ভাগ্য আঁধার চিহ্নে দেখা দেয়। বৌদ্ধ আর বৈদিক-সমকালের তথাকথিত তন্ত্রের ললাটলিখন বোধহয় এটাই ছিল।

শশীভূষণ এই জটিল ইতিহাস-দর্শন-সংস্কৃতির ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার চক্রব্যূহে ঢোকেননি যদিও, কিন্তু দেখিয়েছেন কম-বেশি কয়েকটি দৃষ্টান্তের মাধ্যমে যে বৌদ্ধ-যোগ-তন্ত্র ইতিহাসের এক বিচিত্র রাসায়নিক মিশ্রণে চর্যাপদের গোধুলিয়া ভাষার বাচ্য পরিবেশিত হয়েছিল।

Part II-টির নাম 'The Medieval Sahajiya Schools'। এর অধীনে আছে তিনটি অধ্যায়। প্রথম অধ্যায়টিতে বৈষ্ণব সহজিয়া ধর্ম-দর্শন ও তাদের সাধনধারা নিয়ে আলোচনা করেছেন। এই পর্বের দ্বিতীয় অধ্যায় তথা গ্রন্থানুযায়ী ষষ্ঠ অধ্যায়ে রয়েছে সহজিয়া মতবাদের অসাম্প্রদায়িক দিকগুলি নিয়ে তাঁর নিজস্ব ভাবনার পরিবেশনা। এই পর্বের শেষ অধ্যায় তথা গ্রন্থের সপ্তম অধ্যায়ে আছে বাংলার বাউল সম্প্রদায়ের নানান দিক নিয়ে বেশ কিছু আকর্ষণীয় তথ্য ও চিন্তার উপস্থাপন। এই পর্বটির পাঠক অনায়াসেই বুঝতে পারেন যে বৌদ্ধ সহজিয়া ধর্মসাধনার যে বিষয়গুলি নিয়ে প্রথম পর্বে শশীভূষণ আলোচনা করেছেন, তার লক্ষণেই দেখবার চেষ্টা করেছেন বৈষ্ণব ও বাউল সহজিয়াকে। অবশ্যই তিনি নিজে বুঝেছিলেন এই দুই ধারার মধ্যে একটা বড়সড় পার্থক্য আছে। বৈষ্ণবের রাধা-কৃষ্ণ বা বাউলের মনের মানুষ সহজ সাধনার সাধ্য হতে পারে, কিন্তু এই সাধ্যের স্বরূপ আলাদা। বৌদ্ধ দর্শনের প্রজ্ঞা আর উপায়কে নারী-পুরুষরূপে কল্পনা অথবা যোগদর্শনের প্রকৃতি-পুরুষ তত্ত্বের সাথে রাধা-কৃষ্ণের আপাত সাদৃশ্য আছে বলে মনে হয়; কিন্তু গভীরে মিল খোঁজার চেষ্টা বৃথা। এই পর্বের আলোচনা করতে করতে শশীভূষণ নিজেও নিশ্চয়ই তা উপলব্ধি করেছিলেন। বৈদিক নারায়ণসূক্ত, পুরুষসূক্ত প্রভৃতিতে বৈষ্ণবধর্মের উদ্ভিন্ন বৃক্ষের প্রশাখা দেখা গিয়েছিল। খ্রিস্ট-পূর্বাব্দ তামিল থিরুক্কুরলের পদগুলিতে, উত্তরাপথের নারদপঞ্চরাত্রের বিচিত্র সাদৃশ্য কেউ বের করে দেখাতেই পারেন। সুতরাং বৈষ্ণব সহজিয়া সাধনা হিসেবে যে ধারা বাংলা বৈষ্ণব পদাবলী সাহিত্যকে উৎফুল্ল বর্ণাঢ্যতায় ভরিয়ে দিয়েছে, তার সূচনা আছে আসলে এক অনেক আগের দিনরাতের হিসেব খাতায়। এখানেও অবশ্যই পাল্টে যাওয়ার গন্ধটা উগ্র, কিন্তু তার ভিতরের দার্শনিক সত্যবচন না খুঁজে পেলে বিভ্রান্তিতে গোলকধাঁধা ভ্রমণ হবে মাত্র।

তৃতীয় পর্বটির নাম 'The Nath Cult'। এখানে দুটি অধ্যায়ে তিনি তাঁর যাবতীয় আলোচনাকে নিবদ্ধ রেখেছেন। প্রথমে আলোচনা করেছেন নাথ ধর্মমতের ইতিহাস নিয়ে আর তার পরে আছে নাথ সিদ্ধসাধকদের সাধন পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা এবং সেই প্রসঙ্গে এসেছে এই মতাবলম্বীদের কিছু দার্শনিক ভাবনার কথাও। শশীভূষণ যথার্থই বুঝেছিলেন যে, পরবর্তী ইতিহাসজাত তথাকথিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মভাবনা, সৌর দার্শনিক চিন্তা, যোগদর্শনের বিভূতিপাদ, অর্বাচীন বৌদ্ধ দার্শনিকতা এবং বৈদিক দর্শনভাবনার কয়েকটি মূল সূত্রের অক্ষম ও দুর্বল সংস্করণ তৈরি করে মিশিয়ে দিয়েছিল নাথপন্থার মধ্যে। অসাধারণ বুৎপত্তি নিয়ে শশীভূষণ বিশ্লেষণ

করেছেন নাথকাহিনি ও নাথসিদ্ধাচার্যদের জীবন — দেখিয়েছেন নাথ-যোগীদের উল্টো সাধনার আসল তাৎপর্য নিহিত আছে যোগদর্শন বা প্রাচীন বৈদিক দর্শনের অষ্টাঙ্গ সাধনাদির মধ্যে, পারিভাষিক 'পঞ্চক্লেশ' নিবারণের পদ্ধতির মধ্যে। হয়তো সময়াভাব বা স্থানাভাবের জন্যে দেখাতে পারেননি যে এই নাথপন্থার সাথে ভারতীয় দর্শনভাবনার কাশ্মীরী শৈবগাণপত্য-পাশুপত দর্শনেরও নানা বিচিত্র মিলের খোঁজ পাওয়া যেতে পারে। বড়ো বিস্ময়ের সঙ্গে আমরাও লক্ষ্য করি যে যাকে আধা-লোকায়ত বা পূর্ণ-লোকায়ত দর্শন ভাবনা বলে তকমা দেওয়ার চেষ্টা করেছি আমরা, তার সঙ্গে বৃহত্তর ভারতীয় বেদান্ত-বৌদ্ধ-যোগ দর্শনের অনবচ্ছেদ্য যোগ বর্তমান। ভারতীয় দর্শনের যে বিভাগ প্রতীক-উপাসনা, সম্বর্গ-উপাসনা নিয়ে বিস্তৃত আলোচনা করে, তার পাশে এই সাধনার বক্তব্যগুলি রাখলে একটি বৃহত্তর গবেষণার পথ দেখা যেতে পারে।

গ্রন্থটির Part IV হল 'The Dharma Cult and Bengali Literature'। এই পর্বে পাঁচটি অধ্যায়ে তিনি ধর্মঠাকুর কেন্দ্রিক যে দার্শনিক ও আচারপ্রধান একটি সাধনার ধারা গ্রামীণ বাংলায় দীর্ঘকালাবধি প্রচলিত আছে সে বিষয়ে আলোচনা করেছেন। বাংলা সাহিত্যে ধর্মঠাকুর কেন্দ্রিক যে সৃষ্টিগুলি অনেকদিন আমাদের পল্লীজীবনের মাটি-নিকানো দাওয়ায় আনন্দ-ভক্তি-জীবন জিজ্ঞাসার পারহীন মোহনা নির্মাণ করেছে, ড. দাশগুপ্ত সেগুলির মধ্যে দিয়ে ধর্মসাধনার স্বরূপ বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করেছেন অনবদ্য মুন্সিয়ানায়। তারই মধ্যে দেখাবার চেষ্টা করেছেন ধর্মের সাথে কেমন করে বুদ্ধ, শূন্য, সূর্য প্রভৃতিরা কখনও সাদৃশ্যের মঞ্চে পাশাপাশি বসছেন, আবার কখনো অমিলের দূর পংক্তিতে আসন তাদের। আর একটি চমৎকার ক্ষেত্রও আমাদের মন টানে, যেখানে তিনি ধর্মসাধনায় ইসলাম সাধনার কিছু আচারের অন্তর্ভুক্তির উল্লেখের মাধ্যমে প্রাক্-আধুনিক বাংলার সমন্বয় ভাবসাধনার আকর্ষণীয় ইতিকথার একটি এপিসোড উপস্থাপিত করেছেন।

এই প্রসঙ্গে ড. দাশগুপ্তের লেখা আরো দুটি গ্রন্থের উল্লেখ করতে চাই। একটি হল 'An Introduction to Tantric Buddhism'। এই গ্রন্থটি কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশ করে ১৯৫০-এ। এটিও তাঁর একটি গবেষণা গ্রন্থ। গ্রন্থটির তৃতীয় ও শেষ সংস্করণ প্রকাশ পেয়েছিল তাঁর দেহাবসানের পরে। গ্রন্থটি পরবর্তী বৌদ্ধ দর্শনের ওপর একটি চমৎকার আলোচনা গ্রন্থ। তান্ত্রিক বৌদ্ধ ধর্মভাবনার এমন সারগর্ভ বিশ্লেষণ এদেশে খুব বেশি হয়নি। বস্তুত 'Obscure Religious Cults' গ্রন্থটির মধ্যে স্থানাভাব প্রভৃতির কারণে বৌদ্ধ তান্ত্রিক দর্শনের নতুন যে দিকগুলি সংক্ষেপে আলোচিত বা অনালোচিত থেকে গিয়েছিল, এই বইটিতে শশীভূষণ তা বিস্তৃত আকারে পরিবেশনার চেষ্টা করেছেন। দেখিয়েছেন 'অদ্বয়', 'যুগনদ্ধ' তথা মিলন-সূত্র, রাগ, সমরস, মহাসুখ প্রভৃতি পরিভাষাগুলির গভীরার্থ। দেহকে অবলম্বন করে দেহাতীত হওয়ার যে সাধনপ্রক্রিয়া এই মতাবলম্বীরা অনুসরণ করতেন, ভাবলে অবাক হতে হয়, কী অনবদ্য দক্ষতায় সেই সাধনার পদ্ধতি তিনি বুঝেছেন, তাকে ব্যাখ্যা করেছেন এই বইটিতে।

অপর যে গ্রন্থটির উল্লেখ এখানে করতে চাই সেটি হল ১৯৫৭-তে প্রকাশিত 'Aspects of Indian Religious Thought'। এই গ্রন্থটিতে ভারতীয় ধারায় শক্তিসাধনা ও মন্ত্রতত্ত্বের নানা দিক নিয়ে আলোচনা করেছেন ড. দাশগুপ্ত। আমার মনে হয়েছে এই বইটির কথা সাধারণ্যে আগের দুটি বইয়ের চেয়ে কম প্রচলিত। বিশেষত এর 'The Role of Mantra in Indian Religion' অধ্যায়টি ব্যক্তিগতভাবে আমাকে আকৃষ্ট করেছে অনেক বেশি। মন্ত্রের ধারণাকে আলোচনা করতে গিয়ে ড. দাশগুপ্ত শুরু করেছেন বৈদিক মন্ত্রসাহিত্য থেকে। দেখিয়েছেন আমাদের ব্যক্তিগত আধ্যাত্মিক সাধনায় মন্ত্রের ভূমিকা কতটা গভীর, কতটা প্রেরণাদায়ক। আবার তারই সঙ্গে পূর্বমীমাংসা দর্শনের শব্দতত্ত্ব সম্পর্কিত ভাবনা বা ব্যকরণ দর্শনের অতি পরিচিত স্ফোটতত্ত্বকেও প্রাসঙ্গিকভাবে স্মরণ করেছেন, ভাবনার একটি যোগসূত্র তৈরি করেছেন।

আমাদের সকলেরই নিশ্চয়ই মনে আছে যে এই মেধা উজ্জ্বল জীবনের অন্তিম পর্বটি ব্যয়িত হয়েছিল বৌদ্ধ তান্ত্রিক সাধন-সাহিত্যের সাড়া-জাগানো একটি আবিষ্কার 'নবচর্যাপদ' গ্রন্থনা প্রয়াসের মধ্য দিয়ে। এই ইতিহাস সবার জানা যে ১৯৬৩ নাগাদ যখন তিনি লণ্ডনে যান রবীন্দ্রস্মারক বক্তৃতা দিতে তখন London School of Oriental Studies-এর সংস্কৃতের অধ্যাপক ড. আর্নল্ড অ্যাডরিয়ান বাকে-র সাথে তাঁর পরিচয় ঘটে আর সেই সূত্রে তিনি জানতে পারেন যে ড. বাকে ১৯৫৪-৫৫ সাল নাগাদ নেপালে গিয়ে তখন প্রচলিত কিছু চর্যাপদের গান সংগ্রহ করতে পেরেছেন। দেশে ফিরে ড. দাশগুপ্ত দ্রুত নেপালে যান এবং সেখানে সকলানন্দ বজ্রাচর্য ও অন্যান্যদের সাহায্যে নতুন চর্যাপদ সংগ্রহ করেন। ১৯৬৩-র ৭ সেপ্টেম্বর বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদে আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে আয়োজিত একটি সভায় শশীভূষণ এই সম্পর্কে একটি বক্তৃতা করেন এবং উপস্থিত শ্রোতাদের কিছু গান নিজের সংগৃহীত টেপরেকর্ডার থেকে বাজিয়েও শোনান। নব চর্যাপদ গ্রন্থ প্রকাশের কাজও চলতে থাকে তবে আমরা জানি যে গ্রন্থ প্রকাশের আগেই তাঁর দেহাবসান হয়।

যে পাণ্ডিত্য নিয়ে ড. দাশগুপ্ত এই বিপুল গবেষণার উপলাস্তীর্ণ পথে নেমেছিলেন, তার সামান্যও আমার অন্তত নেই। কিন্তু জীবনজিজ্ঞাসার এক সুনির্দিষ্ট ও স্বেচ্ছাবৃত পথতীর্থে দাঁড়িয়ে বুঝতে পারি, এই কাজ কেবল মনীষা দিয়ে হয়নি। উপনিষদ বলেছে 'হৃদা মনীষা মনসা'র কথা। মেধা কিছুটা পথ হাঁটে, ক্লান্ত হয়ে পড়ে; অনুভূতি আর জীবনের সাথে মেলানোর সামর্থ্য না থাকলে 'সত্যমূল্য না দিয়ে' 'শৌখিন মজদুরি' মাত্র করা হয়। ড. দাশগুপ্ত সেই শৌখিনতায় গা ভাসাতে নারাজ ছিলেন বলেই এই বিরাট আর গভীর মনন প্রমাণ করতে পেরেছেন।

আমাদের আজকের গবেষণা অনেকসময়ই পল্লবগ্রাহিতা আর মৌলিকতাহীনতার দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত। কী লিখছি আর কেন লিখছি, এর একটাই উত্তর আমাদের কাছে আছে, আর সেটা হল পি এইচ ডি ডিগ্রি পাওয়ার জন্যে বা পাবলিকেশনের সংখ্যা বাড়াবার জন্যে। ড. দাশগুপ্ত এই ক্ষেত্রে আমাদেরই কালের সামান্য আগে দাঁড়িয়ে থাকা অন্য এক আদর্শ। তাঁর মতের সাথে আমরা হয়তো কোথাও সহমত না হতেও পারি, কিন্তু গবেষণার অন্যতম যে লক্ষ্য

এক প্রশ্নের উত্তর খুঁজে অনেক প্রশ্ন তৈরি করা, সেই পরিপ্রশ্ন নামক সেবাকার্যের পুরোহিত তিনি মেধাচিহ্নিত শ্রমের জগতে দুর্ভিক্ষ লাগা আমাদের আজকের এই সংসারে। গবেষণাকে সাধনার স্তরে উন্নীত করেছিলেন তিনি, অধ্যয়নের সাথে নিঃসন্দেহে পেয়েছিলেন উপলব্ধির স্বলব্ধ কোনো উত্তরাধিকার। আগামীদিনের বাংলা সাহিত্য আর সংস্কৃতির কাছে তারই লিপিবদ্ধ প্রকাশ তাঁর এজাতীয় লেখাগুলি। আমাদের জীবনসাধনার জগতে নতুন আসা 'Art of Living' অথবা 'Bipassana' বিশ্বায়ত দুনিয়ার শপিং মলে তৈরি হওয়া সাধন প্রক্রিয়া। ড. দাশগুপ্তের সাধনা ছিল এদেশের জল-হাওয়ার মেদুর গন্ধ মাখা, এদেশের আকাশ-আলোর মাধুর্যস্নিগ্ধ ছোঁয়া ভরা সাধন পদ্ধতিকে লোকায়ত দুনিয়া থেকে বিশ্বায়ত দুনিয়ার সামনে নিয়ে আসা। সেকাজে তাঁর সিদ্ধি কালের প্রহরা পেরিয়ে গিয়েছে অনায়াসে। আমাদের কাজ শুধু সে সিদ্ধিফলকে নিজেদের সাহিত্য-সংস্কৃতির গোলায় সযত্নে সংরক্ষণ করা, না হলে ইতিহাসের যে আশীর্বাদ তিনি পেয়েছেন তা আমাদের জন্যে বরাদ্দ থাকবে না।

নাটক করা, নাটক দেখা

সৌমিত্র বসু*

নাম মনে নেই, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের কোনো একটি লেখার নায়ক প্রত্যাখ্যান করেছিল রাজা অয়দিপাউস নাটক দেখতে, তার কারণ তার মনে হয়েছিল অত কষ্ট না করে সে নাটক বাড়িতে বসে পড়ে নিলেই চলবে। পাশাপাশি মনে পড়তে পারে রবীন্দ্রনাথের সেই বিখ্যাত রঙ্গমঞ্চ প্রবন্ধ, যেখানে তিনি বাস্তবের অনুকরণে মঞ্চসজ্জা করার বিপক্ষে কথা বলতে গিয়ে জানাচ্ছেন, 'সাহিত্য পাঠ করিবার সময় আমরা সকলেই মনে মনে অভিনয় করিয়া থাকি; সে অভিনয়ে যে কাব্যের সৌন্দর্য খোলে না সে কাব্য কোনো কবিকে যশস্বী করে নাই। বরঞ্চ এ কথা বলিতে পার যে অভিনয়বিদ্যা নিতান্ত পরাশ্রিতা। সে অনাথা নাটকের জন্য পথ চাহিয়া বসিয়া থাকে। নাটকের গৌরব অবলম্বন করিয়াই সে আপনার গৌরব দেখাইতে পারে।' সাহিত্য হিসেবে নাটক আর নাট্যের সম্পর্ক বিষয়ে সুনীল তাঁর চরিত্রের সঙ্গে সহমত পোষণ করেন কিনা জানি না, তবে বিশ শতকের প্রথম পর্বে, ইউরোপীয় বাস্তববাদী নাটকের তুঙ্গ মুহূর্তে দাঁড়িয়ে রবীন্দ্রনাথের এই মন্তব্য, এই প্রবন্ধের মধ্যে দিয়ে তিনি ইউরোপীয় থিয়েটারভাবনার বিপরীতে ধ্রুপদী ভারতীয় থিয়েটারের শক্তি সম্পর্কেও আমাদের সচেতন করতে চাইছেন, এ কথা মনে না রাখলে হয়তো আমরা মানুষটির প্রতি অবিচার করব। কিন্তু কথাকে যদি কথার মানেতেই ধরে নিই, তাহলে তো স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে, রবীন্দ্রনাথের মতে যাকে বলি নাট্য, তা আসলে লিখিত নাটকের একটি দৃশ্য ও শ্রুতিনির্ভর প্রসারণ মাত্র, লেখা যদি দুর্বল হয়, তবে নিজস্ব কোনো ভাষা দিয়ে সে উপভোক্তার মনে সাহিত্য পাঠের থেকে সমৃদ্ধতর কোনো প্রতিক্রিয়া তৈরি করতে পারে না। এর বিপরীত দিকে হয়তো রাখতে পারি মোহিত চট্টোপাধ্যায়ের অভিমত, নাটককে সাহিত্য হিসেবে দেখাই উচিত নয়, দীর্ঘদিন ধরে এমন কথা বলছেন তিনি। নাট্য নিশ্চয় সাহিত্যকে অবলম্বন করেই গড়ে ওঠে, কিন্তু বিদেশে তো বটেই, আমাদের এই বাংলাতেও বারবার দেখা গিয়েছে, লিখিত সেই পাঠকে অস্বীকার করে, এমনকি উড়িয়ে দিয়ে, মঞ্চপাঠ অবলম্বন করেই তৈরি হতে চাইছে না, মুহূর্তের তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়ায় অভিনেতারা গড়ে নিচ্ছেন কোনো পাঠ, তাই নিয়েই তৈরি হয়ে উঠেছে নাট্য।

বিষয়টি বহু চর্চিত, কিন্তু আমার ইচ্ছে, সাহিত্য আর নাট্যের এই সম্পর্ককে দেখা যাক শিল্পী এবং উপভোক্তার দৃষ্টিকোণ থেকে। অর্থাৎ, এই দুই শিল্পসংরূপের উপভোক্তার মধ্যে ফারাকের জায়গাগুলো কোথায়, সাহিত্য কেমনভাবে পাঠকের মনে তার প্রতিক্রিয়া তৈরি করে, আর নাট্যে দর্শকের প্রতিক্রিয়া তৈরির ধরনগুলোই বা কী কী? এ নিয়ে কথা বলতে গেলে আমাদের

* অধ্যাপক, নাট্যবিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

দুটি প্রাচীন সাহিত্যতত্ত্বের দ্বারস্থ হতে হবে। সংস্কৃত অলঙ্কার শাস্ত্রে কাব্যকে দুভাগে ভাগ করা হচ্ছে, দৃশ্য আর শ্রাব্য। অর্থাৎ, নাটক হল দৃশ্যকাব্য, সে যে সাহিত্য সংরূপ হিসেবে আলাদা, তা গোড়াতেই মেনে নেওয়া হচ্ছে। নাটক বলতে আমরা যা বুঝি সংস্কৃতে তাকে বলা হত রূপক, যার আভিধানিক মানে হল আকৃতি বা গঠন, যার সঙ্গে চোখে দেখার সম্পর্ক অবিচ্ছেদ্য। যে কোনো নাট্যশাস্ত্রের আলোচনা শুরুই হচ্ছে এখান থেকে, কেবলমাত্র শ্রুতিনির্ভর (বলা বাহুল্য, তখনো ছাপাখানা আসেনি, তাই মূলত পাঠ্য সাহিত্য রচনার চল হয়নি তখনো), না হওয়ার কারণেই নাট্যের যে বিবিধ বৈশিষ্ট্য তৈরি হয়, তার কথাই বলা হচ্ছে এই শাস্ত্রে। আবার, শিল্পের মূল কথা অনুকরণ, এই মত প্রতিষ্ঠা করে গ্রিক পণ্ডিত অ্যারিস্টটল বাহন, প্রকার এবং বিষয়ের নিরিখে শিল্পকে তিনভাগে ভাগ করেছেন। কাব্য যেহেতু বর্ণনীয় আর নাট্য অভিনেয়, তাই অনুকরণের প্রকারের দিক থেকে নাট্য আলাদা হয়ে যাচ্ছে কাব্যের থেকে। Drama শব্দটি এসেছে গ্রিক dran থেকে, যার অর্থ to do, act অর্থাৎ, তার সঙ্গেও দেখার একটা সম্পর্ক আছে। গ্রিক বংশোদ্ভূত থিয়েটার কথাটির উৎসও theatron (থেয়াত্রোন), যার আভিধানিক অর্থ হল দেখবার জায়গা। রোমান উৎস থেকে আসা অডিটোরিয়াম শব্দের মানে হল শোনবার জায়গা।

একটা কথা খুব সহজেই বলা যায়, লিখিত সাহিত্য আমরা পড়ছি হরফের মধ্যে দিয়ে, এবং হরফগুলো ফার্দিনান্দ দ্য সস্যুরের ভাষায় signifier, যার সঙ্গে signified বা বিষয়ের সম্পর্ক কোনো অবধারিত সূত্রে বাঁধা নয়। তাহলে, আমরা যখন কোনো লেখা পড়ি, তখন বস্তুত আমরা লেখায় ব্যবহৃত হরফ নামক চিহ্নগুলোকে মনের মধ্যে পঞ্চেন্দ্রিয়গম্য ভাষায় অনুবাদ করে নিই। যেমন ধরা যাক— স্তব্ধ পুকুর / ব্যাঙের লাফ / জলের শব্দ। আমার সামনে আছে কয়েকটা হরফ, কিন্তু পড়বার সময় সেই সব হরফ নামক চিহ্ন পার হয়ে তারা আমাকে দেখাচ্ছে একটি স্তব্ধ পুকুরের ছবি, ঝোপ থেকে বেরিয়ে একটি ব্যাঙ লাফ দিল জলে, শোনাচ্ছে জলে লাফিয়ে পড়ার শব্দ। নাট্যে কিন্তু এমন করে হরফ থেকে অনুবাদ করে নেওয়ার কথা নয়, সে সরাসরিই আমাকে দেখাবে সেই দৃশ্য, শোনাবে আওয়াজ, এমনকি শোঁকাতে পারে গন্ধ, জিভে দিতে পারে স্বাদ, কোনো কিছু স্পর্শ করার সুযোগও পেতে পারি আমি। সোজা কথায়, লেখায় যেখানে আমরা হরফ থেকে অনুবাদ করে নিচ্ছি ছবি ও শব্দ, নাটক, বা যে কোনো অভিকর শিল্পই সেখানে আপাতভাবে আমাদের পঞ্চেন্দ্রিয়কে নাড়া দিচ্ছে সরাসরি, বর্হিপ্রকৃতির সঙ্গে যে ভাবে আমাদের সংযোগ তৈরি হয় সেই ভাবেই। আমরা যখন কোনো নাটকের প্রযোজনা দেখি, তখন আমাদের সামনে উপস্থিত করা হয় অজস্র ছবি, প্রতিটি ছবি অপর একটি ছবির মধ্যে মিশে যাচ্ছে, অজস্র ধ্বনি, পরস্পর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্ক তৈরি করে এগিয়ে চলেছে তারা, সাধারণত হয় না, তবু নাসিকা, জিহ্বা এবং ত্বকের আওতায় পড়ে এমন উপাদানও সমবেতভাবে এসে দাঁড়াচ্ছে সামনে। সেক্ষেত্রে মনে রাখা চাই, হরফনির্ভর সাহিত্যে signified আর signifier-র মধ্যে সম্পর্ক যতটা সংযোগহীন, নাট্যের বেলা ততখানি নয়, সেখানে এ দুয়ের মধ্যে আত্মিক সম্পর্ক থাকতেই হয়। এর ফলে, হরফনির্ভর সাহিত্যের পাঠক যতটা কল্পনাশক্তিকে খেলাতে পারেন, নিজের মনের মধ্যে স্থান-কাল-পাত্রকে নিজের মতো করে তৈরি করে নেওয়ার যতটা স্বাধীনতা

ভোগ করেন, নাট্যের দর্শক তা পারেন না। তাঁর সামনে এনে দেওয়া হয় কমবেশি স্থান-কাল-পাত্রের আন্দাজ, এমনটা নয় যে সেখানেও আমাদের কোনো কিছু অনুবাদ করে নিতে হয় না, কিন্তু তার ধরনটা আলাদা, এবং সেই সাতন্ত্র্যের কারণেই সাহিত্যের উপভোক্তা আর নাট্যের উপভোক্তার মধ্যে তফাৎ তৈরি হয়ে যায়।

সাহিত্যে এক একটা হরফ মনের মধ্যে যে সব অনুষঙ্গ তৈরি করে তার পথ ধরে তৈরি হয় সাহিত্যটি উপভোগের ধরন। ভুল শব্দ ব্যবহার যে ভুল অনুসঙ্গ তৈরি করে রসাস্বাদনের ক্ষতি করে দিতে পারে তার নানা উদাহরণ নিশ্চয় আপনাদের মনে পড়বে। নাটকেও সেই বিপাক হয়ে থাকে, কিন্তু তা কেবলমাত্র শব্দনির্ভর নয়। একটা মজার গল্প বলি। চেখভের বিখ্যাত থ্রি সিস্টার্স নাটকটি প্রযোজনা করছেন একটি বিখ্যাত নাট্যদল। শহরে আগুন লাগার দৃশ্যে মঞ্চে ছড়িয়ে দিতে হবে ধোঁয়া, ধোঁয়া বাড়াবার জন্যে জ্বলন্ত নারকোলের ছোবড়ায় খানিকটা করে ধুনো দিয়ে দেওয়া হল। ফল হল মারাত্মক। প্রথম রাত্রির অভিনয়ের শেষে দর্শক জানালেন, ধুনোর গন্ধ তাঁদের কেবলই মনে করিয়ে দিচ্ছে পুজোর কথা, শহর পোড়ার অনুষঙ্গ জাগছেই না মনের মধ্যে। এর পাশাপাশি মনে আছে, বহুরূপীর প্রযোজনায় রবীন্দ্রনাথের রাজা নাটকে প্রচুর সত্যিকারের ফুল ব্যবহার করা হত, অভিনয় চলার সময় সেই ফুলের গন্ধ ধীর কিন্তু অমোঘ গতিতে অধিকার করে নিত প্রেক্ষাগৃহ। নাটকের পরিবেশ তৈরিতে সেই গন্ধের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল।

এইখানে বলে রাখা যাক, সাহিত্যের থেকে নাট্যকে আলাদা করে রাখার কতকগুলি সমস্যা আছে। নাগরিক সংস্কার থেকে আমাদের মনে হয়, সাহিত্যের রূপ সব সময়েই লিখিত, কিন্তু সে কথা সত্যি নয়, মৌখিক সাহিত্যের একটি বড়ো ভাণ্ডার সব দেশের সাহিত্যেই খুব গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহ্যের অংশ হয়ে আছে। এই মৌখিক সাহিত্যের সঙ্গে নাট্যের তফাৎ করাটা খুব কঠিন। ছাপাখানা আবিষ্কৃত হওয়ার আগে সাহিত্যের প্রধান প্রবণতা ছিল মৌখিক হওয়ার দিকে, পুঁথি কিছু নকল হলেও মূলত সে সাহিত্য উপভোক্তার কাছে পৌঁছত কথকের মারফৎ। সকলেই বুঝতে পারি, কথক যখন কোনো একটি সাহিত্যকে পাঠ বা আবৃত্তি করছেন, তখন হরফের মতো নিরাসক্তভাবে তা করা তাঁর পক্ষে সম্ভবই নয়, তাঁর হাত-পা নড়ে যাচ্ছে, কণ্ঠস্বরে বা বাচনভঙ্গিতে ঢুকে পড়ছে নানা রকম ভাঁজ, ওঠাপড়া, আখ্যানে বিধৃত সংলাপ বলার সময় তিনি কখনো হয়ে উঠছেন চাঁদ, কখনো সনকা, বেহুলা বা লখিন্দর। অর্থাৎ ইচ্ছে থাক বা না থাক, তিনি আসলে সেই কাজই করছেন যাকে বলা যেতে পারে পারফর্মেন্স, সেই সুবাদে আমরা সেলিম আল দীনের মতো অনুসারে এই কথককে নাট্যপ্রয়োগকার হিসেবেই ধরব। শুধু লোকায়ত স্তরে নয়, নাগরিক বাংলা থিয়েটার দীর্ঘদিন আগেই কথকতাকে নাট্যের একটি মাত্রা বলে মেনে নিয়েছে। তৃপ্তি মিত্রের অপরাজিতার ধাঁচটা নাগরিক, কিন্তু আসলে সে কথকতাই করে, শাঁওলী মিত্র তিজন বাঈ-এর অনুসরণে নাথবতী অনাথবৎ বা কথা অমৃতসমান করতে গিয়ে লোকনাট্যের শৈলীকেই নাগরিক আকার দিয়েছেন, পরবর্তীকালে গৌতম হালদার বিজয়লক্ষ্মী বর্মণ প্রমুখরা খানিকটা একই ধরনে একক মানুষের বর্ণনাকেই কখনো বিবরণ কখনো অভিনয় মিশিয়ে প্রকাশ করতে

চেয়েছেন। শ্রুতি নাটক নামে পরিচিত পাঠাভিনয়ের ধারার কথাও আমাদের মনে রাখতে হবে। শরীরের অভিনয় বাদ দিয়ে, কেবলমাত্র কণ্ঠস্বরের কারুকাজে অভিনয় করা হয় সেখানে, তার থেকে কথকতা বা ধর্মগ্রন্থ পাঠের ধারা খুব দূরবর্তী নয়।

সমস্যার আরো একটি দিক আছে। উপস্থাপনা বা পারফর্মেন্স নির্ভর সাহিত্যের সঙ্গে লিখিত সাহিত্যের ফারাক না হয় করে ফেলা গেল, কিন্তু জন্মসূত্রেই সাহিত্যের মধ্যে এমন কিছু কিছু উপাদান থেকে গিয়েছে যা আসলে অভিকর শিল্পের আওতায় পড়ে। যেমন ধরা যাক ছন্দ। সাহিত্যের ছাত্রকে ছন্দ বিচার করতে হয়, কিন্তু আশা করি সকলে মানবেন, শুধু হরফের ওপর নির্ভর করে থাকলে সে বিচার কিছুতেই সম্ভব নয়, ছন্দের ধারণাটাই দাঁড়িয়ে আছে কণ্ঠনির্ভর উপস্থাপনার ওপর, গানকে যার সহোদর বলতে পারি। কবিতায় ছন্দ আর বিষয়ের মধ্যে মিলমিশ না হলে যে কি কাণ্ড ঘটতে পারে তা বোঝা যায় ছোটোবেলায় পড়া সেই কবিতাটি মনে করলে— 'নন্দপুর চন্দ্র বিনা বৃন্দাবন অন্ধকার'। ছন্দের দ্রুত লয় একটা ফূর্তির মনোভাব তৈরি করে এ কবিতায়, কখনোই কৃষ্ণের বিরহে আকুল বৃন্দাবনের ছবি ফুটিয়ে তুলতে পারে না। উচ্চারণ বা কোনো বিশেষ শব্দের ওপর ঝোঁক বা স্ট্রেসের বিষয়টিও অভিকর শিল্পের অন্তর্গত, কিন্তু সাহিত্যের ছাত্রকে সেই নাট্যের শিক্ষা মাথায় রাখতে হয়, নাহলে বদলে যেতে পারে লেখাটির মানে।

পড়া বলতে কী বোঝায়, তা না হয় বোঝা গেল, কিন্তু একজন পাটক যখন পড়েন তখন কী ধরনের প্রতিক্রিয়া চলে তাঁর মনের মধ্যে? এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব দেওয়া সম্ভব নয়, কারণ বিভিন্ন পাঠকের বোধবুদ্ধি রুচি পছন্দ পাঠাভ্যাস বা অভিজ্ঞতার জগৎ তো আর এক রকম নয়। তবু, খুব প্রাথমিকভাবে বলতে পারি, লেখকের লেখা পড়ছেন পাঠক, তার মানে হরফ থেকে অনুবাদকরে তিনি প্রবেশ করেছেন লেখকের তৈরি করা একটা জগতে, যে জগৎ তৈরি করা হয়েছে পড়বার সময়ের বেশ খানিকটা আগেই। সে লেখাটি তৈরি করেছেন লেখক তাঁর ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতা, কল্পনা, আবেগ ইত্যাদিও পাঠকের মনে সঞ্চারিত হয়ে যাচ্ছে তাঁর মতো করে। তাঁর মতো করে কোনো স্মৃতি বা আবেগ ইত্যাদি জাগিয়ে তুলছে, তার সঙ্গে লেখকের মনের যোগ থাকতে পারে, না থাকাও অসম্ভব নয়। এইভাবে, প্রত্যেক পাঠক লেখাটিকে অবলম্বন করে তৈরি করে নিচ্ছেন তাঁর নিজস্ব পাঠ, তাঁর নিজস্ব জীবনবলয়ের সঙ্গে জড়ানো।

লিখিত নাটককে অবলম্বন করে গড়ে উঠছে যে পাঠ, তার সঙ্গে নাট্যের পাঠ খানিকটা আলাদা তো হয়ে যাবেই। বিবরণ যখন ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য আকার পায় তখন তার চেহারা কেমন করে বদলে যেতে পারে তার একটা সহজ উদাহরণ দিই। ধরা যাক, গল্পের এমন একটা লাইন, এক ছিল রাজা, তার ছিল দুই রানি — সুয়ো আর দুয়ো। রাজা সুয়োরানিকে খুব ভালোবাসেন, দুয়োরানিকে সহ্য করতে পারেন না। লক্ষ করবেন, এর কোনোটিই অবিকৃতভাবে নাট্যে রাখা চলবে না। এক যে ছিল রাজা — এই বিবরণকে দেখানো যায় না, সেখানে রাজার পোষাক পরা মানুষটিকে দেখাতে হবে কোন ক্রিয়ার মধ্যে, কী করছেন তিনি তা দেখাতে না পারলে নিরালম্ব এই তথ্যের কোনো দাম নেই। দুই রানি বিষয়েও সেই একই কথা। সাহিত্যের বিবরণ যে মুহূর্তে

নাট্যে বদলে গেল, সেই মুহূর্তেই সেখানে এমন কিছু সংযোগের ভাষা চলে আসার কথা, যা সাহিত্যে তো বটেই অন্য কোনো শিল্পমাধ্যম দিয়ে প্রকাশ করা সম্ভব নয়। নির্দেশককে দিয়েই শুরু করি তবে দেখব, চূড়ান্ত ভূমিকায় পৌঁছানোর জন্যে তাঁকে কয়েকটি পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয়। প্রথম, আপাতদৃষ্টিতে যে কোনো মরমী পাঠকের মতো তিনিও পড়ছেন মূল লেখাটি, কিন্তু আর পাঁচজন পাঠকের সঙ্গে তাঁর তফাৎ হল, লেখাটি প্রথাগতভাবে নাটক হোক বা না হোক, কোন কবিতা উপন্যাস বা এমনকি প্রবন্ধ যাই হোক না কেন, পড়বার সময় তিনি রচনাটিকে দেখতে দেখতে চলেছেন তার নাট্যসম্ভাবনার দিক থেকে যা সাধারণ পাঠকের বেলায় হওয়ার কথা নয়। এখানে অবশ্য মেন রাখা দরকার, নাট্যপ্রয়োগের সম্ভাবনার শর্ত সকলের ক্ষেত্রে এক রকম হতেই পারে না, একজন নির্দেশক কোনো একটি লেখর ভিতর প্রয়োগের যে সব সম্ভাবনা আবিষ্কার করতে পারেন, আর একজন তা না পারতেই পারেন। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, লেখকের রচনার কাঁচামাল যেমন তাঁর অভিজ্ঞতা, নির্দেশকের কাঁচামাল তেমনি ওই লিখিত রচনাটি, যাকে ধরে, এবং সেই সঙ্গে যাকে ছাড়িয়ে তা তাঁর মনে সৃজনের একটা নিজস্ব প্রক্রিয়া তৈরি করছে। কিন্তু এই প্রক্রিয়া কেবলমাত্র নির্দেশকের মধ্যেই তৈরি হয় এমন তো নয়। সাহিত্যিকের লেখা প্রকাশের জন্যে যান্ত্রিক ছাপাখানার সাহায্য নেওয়া হয়, প্রাচীন বা মধ্যযুগে নেওয়া হত পুঁথিলেখকদের, যাঁদের কাজ ছিল নিজের ইচ্ছে অনিচ্ছের বালাই না রেখে যন্ত্রের মতোই মূল রচনাটিকে লিপিবদ্ধ করা। আধুনিক থিয়েটারের শর্তমতো নির্দেশককেই যদি নাট্যের প্রধান স্রষ্টা বলে মেনে নিই, তবে মনে রাখতে হবে, সম্পূর্ণ সৃষ্টির জন্যে তাঁকে যুক্ত হতে হয় কিছু জ্যান্ত শিল্পীর সঙ্গে, অভিনেতা-অভিনেত্রী, মঞ্চপরিকল্পনাকার, আলোকশিল্পী, পোশাক পরিকল্পক, রূপসজ্জাকার, আবহ সংগীতকার প্রভৃতি, যাঁদের প্রত্যেকের ব্যক্তিগত ইচ্ছে-অনিচ্ছে, রুচি-পছন্দ, আবেগ-অনুভূতির ভিন্নতা দিয়ে মূল নাটককে ঘিরে তাঁরা নিজের নিজের এক-একটি পাঠ তৈরি করে নেন। নির্দেশকের কাজ হল এই অজস্র পাঠের মধ্যে একটি সমন্বয় তৈরি করা। সে কাজ তিনি করতে পারেন তাঁর কর্মীদের পুতুলের মতো, বা আরো স্পষ্ট করে বলতে গেলে তাঁর আদেশ পালনের যন্ত্রের মতো ব্যবহার করে, অথবা তাঁদের স্বাধীনতা দিয়ে। বলা বাহুল্য, পুতুল করে রাখা আর পূর্ণ স্বাধীনতা দেওয়ার মাঝখানে আরো অনেকগুলো স্তর আছে, নির্দেশক তাঁর অভিপ্রায় অনুসারের একটি বা একাধিক পদ্ধতি বেছে নিয়ে থাকেন। কিন্তু এ কথা বিশ্বাস করি, মানুষকে ছাপাখানার মতো নৈর্ব্যক্তিক আদেশ পালনের যন্ত্র করে রাখা যায় না, কোনো না কোনোভাবে তার নিজস্বতা প্রকাশিত হয়ে পড়বেই।

কিন্তু আমরা ভাবছিলাম দর্শকের কথা। সাহিত্যের পাঠকের থেকে নাট্যের দর্শক দু-দিক দিয়ে আলাদা— ক. নাট্যটি তার পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে প্রবেশ করছে অন্য যে কোনো পার্থিব অভিজ্ঞতার মত, খ. একজন মানুষের নয়, সে উপভোগ করছে একটি সমবেত সৃজন প্রক্রিয়া, তার সামূহিক আবেদন যেমন তাঁর মনে সঞ্চারিত হতে চাইছে, তেমনি আবার আলাদা আলাদা করেও আছে না এমন নয়। অর্থাৎ, দেখতে বসে একজন দুজনের অভিনয় ভালো লাগছে তাঁর, মঞ্চ সাজানোটি আলাদা করে মনে ধরছে, আলোক সম্পাতের কোনো একটা মুহূর্ত বিহ্বল করে দিচ্ছে তাঁকে।

সার্থক সৃজনের ক্ষেত্রে , সেই আলাদা করে লক্ষ করা অংশগুলো মিশে যাচ্ছে সামূহিক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে, আর সৃজন সার্থক না হলে আলাদা হয়েই থাকছে।

মনে রাখতে বলি, নাট্যশিল্পের অভিজ্ঞতা দর্শকের পঞ্চেন্দ্রিয় দিয়ে সরাসরি প্রবেশ করছে বলে আমরা তাকে বলেছিলাম অন্য যে কোন পার্থিব অভিজ্ঞতার মত, কিন্তু নাট্যশিল্পের উপভোগের সঙ্গে পার্থিব অভিজ্ঞতার কিছু তফাৎও আছে। সেই আলোচনায় যাওয়া বাহুল্য হবে যে অন্য যে কোনো শিল্পের মত নাট্যশিল্পের অভিজ্ঞতাও হল অলৌকিক, তা প্রাত্যহিক লৌকিকতাকে অতিক্রম করে যায়। তার বাইরেও, যে কোনো শিল্পের মতোই নাট্যের প্রতিটি প্রকাশমুখ থেকে দর্শক খোঁজেন কোনো গভীরতর তাৎপর্য, যা আমরা জীবন থেকে সব সময় খুঁজি না। লেখায় যেমন প্রতিটি শব্দ, শব্দের ধ্বনিই তাৎপর্যপূর্ণ হতে পারে, কম-বেশি পার্থিবতার একটি আদল বজায় রেখেও তেমনি নাট্য চোখ, কান, ঘ্রাণ, স্বাদ বা স্পর্শের চেনা অভিজ্ঞতাগুলিকে আক্রমণ করে তাদের নতুন দ্যোতনা দেয়। বিশেষ করে বলার, এই দ্যোতনা দেওয়ার জন্য নাট্য তার সবকটি প্রকাশক্ষেত্রে বাস্তবকে অগ্রাহ্য করতে পারে। তার বাড়ি ঠিক বাড়ির মতো না হতে পারে, তার গাছ না হতে পারে গাছের মতন, একটিই নিরপেক্ষ মঞ্চকে সে নানা পটভূমি প্রকাশের জন্য ব্যবহার করতে পারে, আলোর জোর অথবা রং বদলে যায় শিল্পীর সচেতন নির্মাণে। সব কটি ক্ষেত্রেই এই বাস্তবোত্তীর্ণ হওয়ার স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে তাকে। যেহেতু নাট্য অনেকগুলি পথ দিয়ে সাধ্যমতো, আর অবিরত আমাদের চেষ্টা থাকে প্রকাশভঙ্গির নানাস্তরে ছড়িয়ে থাকা সেই তাৎপর্যগুলোর মধ্যে একটা সমন্বয় খুঁজে বার করা, যার মধ্যে দিয়ে গোটা প্রয়োজনটাই তাৎপর্যময় হয়ে উঠবে।

একটি-দুটি উদাহরণ দেওয়া যাক। বহুরূপীর রাজা অয়দিপাউস নাটকের শুরুতে প্রার্থীদের কাতর আহ্বান শুনে প্রসাদের দরজায় এসে দাঁড়াতেন গর্বোদ্ধত অয়দিপাউস, তোরণের দুপাশের দুটি থাম ধরে। নাটকের শেষে, হতভাগ্য, অন্ধ সেই রাজা গড়িয়ে গড়িয়ে নামতেন ওই তোরণের সিঁড়ি দিয়ে। দৃশ্যের এই বৈপরীত্য আমাদের মনে যে অভিঘাত তৈরি করতে পারে, সাহিত্যের ভাষায় তা প্রকাশিত হওয়া সম্ভবই নয়। দর্শক হিসেবে সচেতন বা অসচেতন ভাবেও আমরা লক্ষ রাখছিলাম শুরুর থেকে শেষ পর্যন্ত কেমন করে বদলে যাচ্ছে অভিনেতাদের কণ্ঠস্বর, শরীরের ভঙ্গি, কেমন করে বদলে যাচ্ছে আলো, হয়তো মঞ্চ বা পোষাকে ব্যবহৃত রংও। ইবসেনের এ ডল্‌স হাউস অবলম্বনে বহুরূপীর পুতুল খেলা নাটকের দুটি অঙ্কে খালেদ চৌধুরি কেমন করে দৃশ্যের মেজাজকে ধরতে বদলে দিয়েছিলেন মঞ্চের রং, তা আজ নাট্যশিক্ষার্থীদের পাঠ্যের অন্তর্গত হয়ে গিয়েছে। পিপলস্ লিটল্ থিয়েটারের প্রযোজনায় ব্যারিকেড নাটকের একটি দৃশ্যে দেখছি খবরের কাগজের অফিস, জানতে পারি, একটু পরেই রেডিওতে শোনা যাবে হিটলারের ভাষণ। দৃশ্যপটটি বাস্তবানুগ করা হয়নি, পেছনে প্রায় আধখানা মঞ্চ জুড়ে রাখা আছে সেই খবরের কাগজের প্রথম পাতার বিশাল ছবি। যথাসময়ে রেডিও চালিয়ে দেওয়া হয়, সেই খবরের কাগজের মাঝখান ফুঁড়ে বেরিয়ে আসেন হিটলার, বক্তৃতা শেষ হলে আবার মিলিয়ে যান তিনি। ফ্যাসিস্ট একনায়ককে কেমন করে সংবাদপত্র কিনে নিয়েছে, তা প্রকাশ করার এ হল এক থিয়েটারি উপায়, যা অন্য কোনো শিল্পমাধ্যম দিয়ে প্রকাশ করা যাবে না।

যে উদাহরণগুলো দিলাম, খেয়াল করলে দেখবেন, সেগুলি মূলতছবির ভাষায় কিছু অনুষঙ্গ তৈরি করেছে। তোরণের সোজা লম্বা রেখা, তার মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা অয়দিপাউসের ঋজু রেখা রাখা হয়েছিল সমবেত ব্যক্তিপরিচয়হীন প্রার্থীদের নতজানু রেখার পেছনে, গড়িয়ে নামা রাজা আর সেই ঋজু রেখাকে ধারণ করে নেই। পুতুল খেলার প্রথম দৃশ্যের উজ্জ্বল রঙ যখন বদলে যায় গাঢ় বিষণ্ণ রঙে, তখন তা নাট্যের ভাষ্য রচনা করে। কৌশিক সেন নির্দেশিত স্বপ্নসন্ধানীর ক্রীড়ানক (শতরঞ্জ কে খিলাড়ীর বাংলা রূপান্তর) নাটকের শেষে মানুষপ্রমাণ দাবার ঘুটিগুলি মৃতদেহের মতো ছড়িয়ে থাকে মঞ্চে, ওয়াজেদ আলি শাহ্ চলে গেলে ঝাড়বাতিটি দুলিয়ে দিয়ে মঞ্চ ছেড়ে চলে যায় নবাবের প্রিয় বাঈজী, গোটা মঞ্চ জুড়ে দুলতে থাকে সেই ঝাড়বাতি যেন প্রবল ঝড় উঠেছে, দুলতে থাকে আর ধীরে ধীরে নিভে যেতে থাকে তার আলো, এইভাবে মঞ্চ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ঢেকে যায়। বোঝা যাচ্ছে, ঝাড়বাতি, বাঈজী এইসব বিলাসিতার অনুসঙ্গের সঙ্গে কৌশিক মেলাচ্ছেন ঝড়ের ছবিকে, এ ঝড় তখন প্রাকৃতিক ঝড়ের চেয়ে গভীরতর মানে তৈরি করে। কিন্তু শুধু ছবি নয়, শব্দের ভূমিকাও গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠতে পারে নাট্যে, কণ্ঠের অভিনয়ে বা আবহের ব্যবহারে, নৈঃশব্দকেও আমরা তারই অন্তর্গত করতে বলব। রাজা অয়দিপাউস নাটকে তাইরেসিয়াস যখন রাজার বারংবার প্রশ্নের উত্তরেএকটি দীর্ঘ, ধাপে ধাপে চড়ায় উঠতে থাকা সংলাপের শেষে তুমি নিজেই সেই হত্যাকারী বলে হাতের লাঠিটি রাজার দিকেই বাড়িয়ে ধরতেন, অয়দিপাউসবেশী শম্ভু মিত্র তখন কয়েক লহমার জন্যে স্থানু হয়ে থাকতেন তাঁর আসনে, তারপর সহসা চড়া গলায় স্পর্ধা বলে লাফিয়ে উঠতেন ছিলে ছোঁড়া ধনুকের মতো। এই স্তব্ধতা এবং তীব্র কণ্ঠের বৈপরীত্য নাট্যের নিজস্ব ভাষা তৈরি করে। বিভাস চক্রবর্তীর নির্দেশনায় পুতুল খেলা প্রযোজনার কথা মনে পড়ছে। যে ফোলিও ব্যাগটি থেকে বুলুর সর্বস্বঘাতী দলিলটি বার করবে কেষ্টপদ, বিভাসের নির্দেশমত তার চেনটি একটু জং ধরা করে রাখা হয়েছিল, যাতে ব্যাগ খোলবার সময় তীক্ষ্ণ, চিরে যাওয়া একটা আওয়াজ বের হয়। নাট্যে কোনো তুঙ্গ মুহূর্তের অব্যবহতির পরে অনেক সময় রাখা হয় একটা দীর্ঘ নিরবতা, সেই নীরবতার শিল্পও লিখিত সাহিত্যের পক্ষে রচনা করা সম্ভব নয়।

উপভোক্তা হিসেবে সাহিত্যের পাঠকের সঙ্গে নাট্যের দর্শকের কিছু মৌল প্রভেদ আছে। দর্শক বলতে বুঝি একদল মানুষ একটি নির্দিষ্ট দিনে, নির্দিষ্ট সময়ে জড়ো হয়েছেন এক জায়গায়, নাটকটি দেখবার উদ্দেশ্য নিয়েই শুধু। পাঠকের স্বাধীনতা দর্শকের নেই, ইচ্ছেমতো বই নিয়ে বসা নয়, দর্শককে চলতে হবে নাট্য প্রযোজনার সময়ের সার্থকতা মেনে, যেতে হবে কলাকুশলীদের কাছে, তাঁদের ঠিক করা জায়গায়। পাঠক তাঁর বইটি পড়তে পারেন নির্জনে, দর্শক তা পারেন না, কিন্তু তিনি থাকেন ভিড়ের আড়ালে, বহু মানুষের মধ্যে বসে, আলাদা একজন হয়ে নয়, বরং মানুষের অন্তর্গত একজন হিসেবেই তাঁর প্রতিক্রিয়া প্রকাশ পায় সাধারণত। পাঠকের সঙ্গে নাট্যদর্শকের আর একটি বড়ো তফাৎ হল, দর্শক বসে আছেন নাট্যশিল্পীদের সঙ্গে একই সময়ে এক জায়গায়, তাঁদের প্রতিক্রিয়া সরাসরি চলে যাচ্ছে নাট্যের শিল্পীদের কাছে, প্রভাবিত করছে তাঁদের। নাটকের মানুষেরা জানেন, এই প্রত্যক্ষ উপস্থিতির চাপ কেমন করে প্রভাবিত করে

ফেলে প্রয়োজনটিকে। ঠিক যেমন করে নাট্যশিল্পীরা তাঁদের অব্যবহিত বর্তমানের মধ্যে থেকেও নাট্যের অন্তর্গত বর্তমানকে প্রকাশ করেন, এবং তৈরি করেন দুই বর্তমানের একটি সমন্বয়, দর্শকও তেমনি নাট্যে বিধৃত বর্তমানকে গ্রহণ করেন তাঁদের অব্যবহিত বর্তমানের মধ্যে বাস করেই। তাঁদের প্রত্যক্ষ সংযোগে সময়ের যে একাধিক স্তর পরম্পরা একসঙ্গে মিলে যেতে পারে, সাহিত্য পাঠে তা সম্ভব নয়।

যে কোনো শিল্পের সংরূপ এক ধরনের প্রাতিষ্ঠানিকতা তৈরি করে। সাহিত্য বলতে বা নাট্যাভিনয় বলতে কী বোঝায় তার একটা মাপ ঠিক করা আছে আমাদের, তার আওতার মধ্যে থেকে অল্পস্বল্প পরিবর্তনকে স্বীকার করে নিয়েও সেই সংজ্ঞাকেই আমরা ধরে রাখতে চাই। কিন্তু মঞ্চের মানুষ হিসেবে অনুভব করতে পারি, তীব্রগতিতে পালটে যাচ্ছে আমাদের চারপাশের বর্তমান, বদলে যাচ্ছেন নাট্যকর্মীরা, দর্শকের মনোজগৎ, নাট্যানুষ্ঠানের প্রতি তাঁদের আকাঙ্ক্ষার ধরন। এখন খুব বেশি করে প্রয়োজন হয়ে পড়ছে দর্শকের সঙ্গে নাট্যশিল্পীদের সম্পর্কের পুনর্বিন্যাস। সে চেষ্টা যে একেবারে হচ্ছে না তা নয়, তবু এখনো পর্যন্ত বাংলা নাটকে তার অভিঘাত খুব সার্বিকভাবে এসেছে বলে মনে হয় না। ভয় হয়, সে কাজ যদি করে উঠতে না পারি, তাহলে নাটক করা এবং নাটক দেখা ব্যাপারটা জীবনের সঙ্গে সংযোগহীন একটা কৃত্য বা রিচুয়ালে না পর্যবসিত হয়ে যায়।

সমর সেন : এক নাগরিক কবি

তরুণকুমার মুখোপাধ্যায়*

'গ্রহণ' কাব্যে সমর সেন লিখেছিলেন —

বিকলাঙ্গ দিনের প্রসবে
আমাদের তন্দ্রা ভাঙে;
তারপর আকাশ ভারি হয়ে ওঠে,
বিরম কাজের সুরে
কতদিনের ক্লান্তিকে কলের বাঁশি বাজে;
পিছনে সমস্তক্ষণ ক্ষিপ্র গতি বাসের শব্দ।

সমর সেনের কবিতার অন্যমনস্ক পাঠকও বলবেন, ইনি নাগরিক কবি। নগরজীবনের রূপকার। রবীন্দ্রনাথ তাঁর কালেই বুঝেছিলেন পরিবেশ বিপন্ন; সবুজ অরণ্য নয় ইঁটকাঠের জঙ্গল এখন সভ্যতার পরিচয়। যে জন্য তিনি বলেছিলেন, 'দাও ফিরে সে অরণ্য লও এ নগর।' কিন্তু রবীন্দ্রোত্তর কবিরা জানেন ও মানেন—

শহর এখন আমাদের জীবনকে রূপায়িত করে, ধ্বংস করে,
পরিপূর্ণ করে। শহরের মধ্যে, শহরের প্রাণের মধ্যে আমরা বাঁচি।

(বুদ্ধদেব বসু / হঠাৎ আলোর ঝলকানি)

একইভাবে সমর সেন ভাবতেন, 'প্রকৃতির স্বপ্নলোক ক্লীবের অলীক সর্গ'। তাঁর দু'চোখ এই কলকাতা মহানগরীকে ছুঁয়ে ছেনে দেখেছে। কবিতায় আঁকা হয়েছে সেই বাস্তব চিত্র। যে শহরে বিমর্ষ মানুষের ভিড়, ট্রাম-বাসের আওয়াজ আর 'জনগণ ধোঁয়ার ফণা, চিমনিকে চিরেছে আকাশ' (হসন্তিকা: ৩)। এই সেই শহর যেখানে মধ্যবিত্ত রক্তে উর্বশীকে আহ্বান করা হয়। যেখানে মেয়েরা প্রেমের বদলে শয্যাসঙ্গিনী ও গর্ভবতী হয়। কফির রঙের সন্ধ্যা নামে ধূসর শহরে। শোনা যায় কালীঘাট ব্রিজে 'লম্পটের পদধ্বনি।' তাঁর 'নাগরিক' কবিতায় পড়ি—

মহানগরীকে এল বিবর্ণ দিন, তারপর আলকাতরার মতো রাত্রি
* * * * *
হাওয়ায় ভেসে আসে গলানো পিচের গন্ধ;
আর রাত্রি
রাত্রি শুধু পাথরের উপরে রোলারের
মুখর দুঃস্বপ্ন।
* * * * *
যতদূর চাই ইঁটের অরণ্য,
পায়ে চলা পথের শেষে কান্নার শব্দ।

---

* অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

কিংবা 'একটি বেকার প্রেমিক' কবিতায় লেখেন,

সকালে কলতলায়
ক্লান্ত গণিকারা কোলাহল করে,
খিদিরপুরে ডকে রাত্রে জাহাজের শব্দ শুনি;

কবির এই নাগরিক মনোভাব যেমন যুগসঞ্জাত, তেমনি প্রেরণা পেয়েছেন টি. এস. এলিয়টের কবিতা থেকে। তিরিশের কবিরা যে এলিয়টের অনুরাগী ও তাঁর দ্বারা প্রভাবিত, এটা নতুন তথ্য নয়। সমর সেনও তাঁর In defence of the decadents প্রবন্ধে বলেন,

> People consider Hopkins and Eliot to be among the rel pioneers of modern English poetry.

তাঁর কবিতার প্রভাবেই বাংলা কবিতার হাড়ে ও মজ্জায় অবক্ষয়, ক্ষয় এসেছে তাও স্বীকার করেছেন ('who is convinced to his bones of the decay of all civilisation')।

তাঁর কাব্যাদর্শ কী? এ নিয়ে স্পষ্ট কিছু পাওয়া যায় না। তবে কিছু প্রবন্ধে ও অন্য কবির আলোচনায় বলা তাঁর বক্তব্য ও ভাবনা থেকে তাঁর কাব্যদর্শন অনুমান করা যায়। তিরিশের অন্যতম এলিয়ট-প্রাণিত কবি বিষ্ণু দে যেমন ভাবেন, বলেন— 'কবিকুলকে ভাবতে হচ্ছে বাংলার জনসমাজের চৈতন্যের সঙ্গে, দেশজ সংস্কৃতির সঙ্গে সেতুবন্ধনের কথা' (ঈশ্বর গুপ্ত)। অন্যদিকে সমর সেন মনে করেন, 'সামাজিক পরিস্থিতি এবং অন্তঃপ্রেরণার মধ্যকার আত্মীয়তা জটিল কিন্তু অনস্বীকার্য' (বাংলা কবিতা)। কবিতায় ভাষা ও শৈলী নিয়ে সমর সেন যা ভাবেন, তাতে দেখি, তিনি মনে করেন, যেহেতু আমরা 'কোনো বিশেষ সমাজে বিশেষ সময়ে জন্মাই' ও প্রচলিত ভাষাই ব্যবহার করি, কবিতা লেখার সময় 'সে ভাষার উপরে যে স্বতন্ত্র ছাপ পড়ে, তার নাম ডিকশন' যা 'কবির পুরুষাকারের পরিচায়ক' (দ্র. বাংলা কবিতা)। পাশাপাশি তাঁর সুখ্যাত ও বিতর্কিত 'Decadents' প্রবন্ধে জানিয়ে দেন, যে লিখে দেশ ও জাতির মনোভাব আমূল বদলানো যায় না— 'We can not really hope to effect a revolution with our writings.' তিনি গদ্যকবিতা লেখা পছন্দ করতেন। যা রবীন্দ্রনাথের মনে হয়েছিল 'গদ্যের কবি বলেছিলেন রবি সিং-এর কবিতালোচনা প্রসঙ্গে–

> এঁর কবিতায় কোনো ভণিতা নেই, যে-কোনো বিষয়ে উনি বলেছেন খুবই সোজাসুজি।
>
> (সমর সেন প্রসঙ্গে)।

যাঁরা কবিতায় শব্দ ও শৈলী নিয়ে কসরৎ করেন, তাঁর মতে তা 'রীতিমতো অশ্লীল'। এই সহজ-সরল রীতি তাঁরা পছন্দ বোঝা যায়। তাঁর লেখায় জীবনানন্দ কথিত 'সময়চেতনা', 'ইতিহাসবোধ' থাকলেও তিনি মার্ক্সিস্ট বুদ্ধিজীবী রূপেই পরিচিত ছিলেন। যদিও পার্টির হুকুমনামা মানতে পারেননি। যেজন্য সরোজ দত্ত তাঁর কবিতাকে Text book Marxism বলেছিলেন। শ্রীদত্ত-র ধারণা সমর সেনের নতুন আঙ্গিকের কবিতা 'কেবলমাত্র chosen few-এর উপভোগ্য' (অতি আধুনিক বাংলা কবিতা)। তাঁর 'বাবু বৃত্তান্ত' গ্রন্থে এজন্য সমর সেন বলেন, 'আমাকে কেউ বিপ্লবী বললে মনে হতো–এবং এখনো হয়–যে বিপ্লবকে হেয় করা হচ্ছে।' আসতে একজন শিক্ষিত বুদ্ধিজীবী নাগরিক যেভাবে দেশ-কাল-সমাজ-মানুষকে দেখেন ও বিচার করেন, তিনিও

তাই করেছেন। পিতামহের সমৃদ্ধির যুগ নেই; বর্তমান বুর্জোয়া সভ্যতা ও সন্তোষজনক নয়। দুই নৌকায় পা রেখে চলাই নিয়তি। তাঁর কাব্যদর্শন ও জীবনদর্শন তাই বলে, 'আমি রোমান্টিক কবি নই, মার্ক্সিস্ট'। এবং তাঁর প্রত্যয় –

জীবনধারার ছাপ চেতনাকে গড়ে,
চেতনার ছাপ জীবনধারাকে নয়।

(ক্রান্তি)

এলিয়ট ইংলণ্ডের যে সমাজ ও পরিবেশে লালিত, সেখানে ফাঁকা ও ফাঁপা মানুষ ও যান্ত্রিকতা তাঁর চোখে পড়েছে। পৃথিবীটা তাই পোড়ো জমি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ভারত তথা বঙ্গদেশেও যে বন্ধ্যাত্ব, বেকারত্ব, দুর্যোগ কবি দেখেছেন, তার প্রেক্ষিতে এলিয়ট সমর সেনের কবিতায় ছায়াপাত করেছে। কিছু নমুনা উদ্ধৃত করছি।

১। স্বেদাক্ত মুখের উপরে টর্চের লাল আলোর পর (কয়েকটা দিন)

তুলনীয় : After the torchlight red on sweaty faces (the waste Land)

২। লুপ্ত পাহাড়, লুপ্ত বোধ,
শব্দ গন্ধ, স্পর্শ। (রোমন্থন)

তুলনীয় : I have lost my sight, smell, hearing, taste
and touch (Gerontion)

৩। রসহীন ফণিমনসায়, রুক্ষ বালুতে
(ক) প্রাণের প্রতিরোধে চক্রান্ত চলে। (শবযাত্রা)
(খ) হলুদ বালি দিনরাত্রি জ্বলে, দূরে ফণিমনসার ঝাড় (নানাকথা)

তুলনীয় : This is the dead land
This is Cactus Land (The Hollow men)

৪। আজ চলুন, শহরে বেরোই,
এখানকার সন্ধ্যা দেখুন,
কফির রং, কোন গোঁয়ারি দেবতার পানীয় যেন। (নানা কথা)

তুলনীয় : Let us go then, you and I,
When the evening is spread out againest the sky
Like a patient etherised upon a table.

(The Love Song of J. Alfred Prufrock)

প্রভাব ও অভিজ্ঞতা মিলে সমর সেনের বোধে যে ধূসরতা, নিঃসঙ্গতা ও বিষণ্ণতার জন্ম হয়, তাতে কখনো নিজেকে নাবিক, কখনো পর্যটক ভাবেন। তাঁর উপলব্ধি–

অবশেষে আজ
অসংখ্য নিরক্ষর দুঃস্থের দেশে
নিঃসম্বল পর্যটক মাত্র,
বিশাল ভারত,

জন্ম আর জরা; জীর্ণ জাল,
জন্ম আর জরা,
প্রতিষ্ঠিত বৃন্ত থেকে বিচ্ছিন্ন
লক্ষ্যহীন কত লোক, (রোমন্থন)

তবু আত্মসমালোচনায় মুখর এই কবি–

দু'নৌকার যাত্রী, এই বাঙালি কবিকে,
বুঝি না নিজেকে। (২২শে জুন)

তাঁর খেদোক্তি 'আজ দেবতা আমার বোবা আর কালা'। তবু সৎ কবির মতো তিনি আশাবাদী হতে চান।–

তবু জানি,
জটিল অন্ধকার একদিন জীর্ণ হবে চূর্ণ হবে, ভস্ম হবে,
আকাশগঙ্গা আবার পৃথিবীতে নামবে। (ঘরে বাইরে)

'কালের গলিত গর্ভ' থেকে 'বিপ্লবের ধাত্রী'কে তিনি স্বাগত জানান। স্বপ্ন দেখতে চান অনেক যন্ত্রণা পেরিয়ে–

নগর মন্থনে নীলকণ্ঠ আকাশের তলে
এক শ্রেণীহীন সাম্য রাজ্য পাশে খণ্ড ছিন্ন
বিক্ষিপ্ত পৃথিবী।

(বিতর্ক)

তবু ভিতরে ভিতরে যুগের অভিশাপে অভিশপ্ত এই নাগরিক কবির অনুভব–

আমার অন্ধকারে আমি
নির্জন দ্বীপের মতো সুদূর নিঃসঙ্গ।

(মুক্তি)

রবীন্দ্রনাথের দলিত-ভাবনা

সনৎকুমার নস্কর*

> ...দেবতার প্রতি আমাদের মানবদায়িত্ব নেই। ... সমস্ত বুদ্ধি, সমস্ত শক্তি নিয়ে মানব-ভগবানের অন্ন-বস্ত্র-পানীয়-পথ্যের আয়োজন করতে হয়। যুগে যুগে আমরা তাকে অবহেলা করেছি বলেই মন্দিরের ভগবান পাণ্ডা পুরুতের মধ্যেই পরিপুষ্ট হয়ে উঠেছেন, লোকালয়ে তাঁর কণ্ঠার হাড় বেরিয়ে পড়ল, তাঁর পরনে ট্যানা জোটে না।

রবীন্দ্রনাথ এ চিঠি লিখছেন ১৩৩৮ বঙ্গাব্দের ৪ বৈশাখ, তাঁর অন্যতম প্রিয়পাত্রী হেমন্তবালা দেবীকে। প্রাসঙ্গিকভাবে জানাচ্ছেন প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম নিয়ে তাঁর অবস্থানের কথা। আচার-সংস্কারের বেড়াজালে আবদ্ধ ধর্মের দেবতা তাঁর কাছে নিতান্ত 'খেলার দেবতা' মাত্র, প্রকৃত দেবতা লুকিয়ে রয়েছেন মানুষের অন্তরে, মানবতার প্রশস্ত আঙিনায়। এ চিঠির কদিন আগেই (২৯ চৈত্র ১৩৩৭) লিখবেন তাঁর সেই একান্ত উপলব্ধ সত্যটি : 'আমার দেবতা মানুষের বাইরে নেই। নির্বিকার নিরঞ্জনের অবমাননা হচ্ছে বলে আমি ঠাকুর ঘর থেকে দূরে থাকি একথা সত্য নয়—মানুষ বঞ্চিত হচ্ছে বলেই আমার নালিশ। যে সেবা যে প্রীতি মানুষের মধ্যে সত্য করে তোলবার সাধানাই হচ্ছে ধর্মসাধনা তাকে আমরা খেলার মধ্যে ফাঁকি দিয়ে মেটাবার চেষ্টায় প্রভূত অপব্যয় ঘটাচ্ছি। এইজন্যই আমাদের দেশে ধার্মিকতার দ্বারা মানুষ এত অত্যন্ত অবজ্ঞাত।' শাস্ত্রানুসারী আচারবাদী ধর্ম মানুষকে তার আপন আসন থেকে সরিয়ে কোথায় যে নামিয়ে দিয়েছে, রবীন্দ্রনাথ তাঁর প্রাত্যহিক জীবনের নানাক্ষেত্রে তা উপলব্ধি করেছেন। দেখেছেন জাত-ধর্ম-গোষ্ঠীর নামে মানুষ মানুষকে কীভাবে অপমান করেছে, অসম্মান করেছে অন্তরের মনুষ্যত্বকে। এসবই তাঁকে নির্মমভাবে পীড়িত করে, ব্যথিত করে। তিনি মানহারাদের পাশে এসে দাঁড়ানোর জন্য প্রবল আকুতি বোধ করেন। তাঁর সেই সান্দ্র অনুভব বাণী পেয়েছে 'পত্রপুট'-এর ১৫ সংখ্যক কবিতায়:

ওরা অন্ত্যজ, ওরা মন্ত্রবর্জিত
দেবালয়ের মন্দির-দ্বারে
পূজা-ব্যবসায়ী ওদের ঠেকিয়ে রাখে।...
কবি আমি ওদের দলে—
আমি ব্রাত্য, আমি মন্ত্রহীন,
দেবতার বন্দীশালায়
আমার নৈবেদ্য পৌঁছল না।

কেননা এই দেবতাকে তাঁর মনে হয়েছে খেলার দেবতা, যিনি প্রতিমুহূর্তে মানুষের দেবতাকে বঞ্চিত করে চলেন। এঁর মন্দিরের গায়ে লেগে থাকে দম্ভের চিহ্ন, মানুষের গায়ের অলংকার অপহরণ করে যিনি সেজে ওঠেন রাজকীয় জাঁকজমকে। এই দেবতার মন্দিরের পথ বারে বারেই

---

* অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

হারিয়েছেন রবীন্দ্রনাথ। ব্রাত্য, পঙ্‌ক্তিহীন, জাতিহারা কবি তাঁর অন্তরস্থ মহান পুরুষের কাছে প্রার্থনা জানিয়েছেন :

হে সকল মানুষের মানুষ,
পরিত্রাণ করো—
ভেদচিহ্নের তিলক-পরা
সংকীর্ণতার ঔদ্ধত্য থেকে।

বস্তুত রবীন্দ্র-জীবনের অন্যতম মর্মবাণী এই। চিরকাল যিনি সংগ্রাম করে গিয়েছেন যাবতীয় ইতরতা, নীচতা, বর্বরতা, সাম্প্রদায়িকতা, সংকীর্ণতা, অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে। ধর্ম, মানুষ, জাতপাত, ছোঁয়াছুঁয়ি সম্পর্কিত তাঁর এই অবস্থানকে রবীন্দ্রনাথ দলিতচিন্তার ভিত নির্মাণ করেছে।

বর্তমান ভারতীয় রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে যারা, 'দলিত' বলে চিহ্নিত, সামাজিক পরিচিতিতে তারা এতকাল অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, শূদ্র বলে চিহ্নিত হত। সুপ্রাচীন কালে আত্মগর্বী বহিরাগত আর্যরা এদেশ জয় করে বর্ণাশ্রম ধর্মের অন্তর্গত যে চতুর্বর্ণপ্রথা চালু করেছিলেন, শূদ্ররা ছিল তার সর্বনিম্নতর। তারা তথাকথিত উচ্চবর্ণের শোষণের যাঁতাকলে পড়ে ভয়ঙ্করভাবে পিষ্ট হচ্ছিল। আর এই বর্ণবাদী শোষণকে শাস্ত্রীয় স্বীকৃতি দিয়েছিল ব্রহ্মণ্যতন্ত্রের চূড়ান্ত সংবিধান 'মনুসংহিতা'। পৌরাণিক যুগ থেকে এদেশ হয়ে ওঠে বর্ণাশ্রমধর্মের এক কদর্য নরকভূমি। যেখানে শূদ্ররা কেবল জন্মায় অন্য তিন ক্রমোচ্চবর্ণের ক্রীতদাস, সেবাদাস ও শ্রমদাস হওয়ার জন্যে। সব রকমের শাস্ত্র এদের সামাজিক সম্মান কেড়ে নিয়ে মানুষের অধিকার থেকে বঞ্চিত করে রেখেছিল। মন্দিরে তাদের প্রবেশ ছিল নিষিদ্ধ। উচ্চবর্ণের ব্যবহার্য জলাশয় ব্যবহারেও নিষেধাজ্ঞা ছিল। সবার সঙ্গে একত্রে পান-ভোজনের অধিকার ছিল না। তাদের মুখ দেখা, এমনকি ছায়া মাড়ানোও নাকি অশুচি ছিল। শাস্ত্রের এই অবান্তর অর্থহীন বিধিবিধান তাদেরকে চিরকালই ঘৃণ্য করে রেখেছিল।

এসবের বিরুদ্ধে যে ক্ষোভ ধূমায়িত কিংবা উষ্মার বিস্ফোরণ হয়নি, তা কিন্তু নয়। মনুস্মৃতির বিরুদ্ধে অনেক শাস্ত্রীয় লড়াই হয়েছে। বৈদিক যাগযজ্ঞ ও পুরোহিত-প্রাধান্যকে অস্বীকার করে গৌতম বুদ্ধ পঞ্চশীল ও অষ্টাঙ্গিক মার্গের ধর্মদর্শন প্রতিষ্ঠাও করেছিলেন। ষোড়শ শতকে বঙ্গদেশে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীচৈতন্যদেব। তিনিও সমাজ-কাঠামো বদলের ফতোয়া দিয়েছিলেন— 'চণ্ডালোহপি দ্বিজশ্রেষ্ঠঃ হরিভক্তিপরায়ণঃ।' কিন্তু তাতে জাতপাতের যে ব্যবধান গোড়াতেই ছিল, তার খুব বেশি ইতর-বিশেষ ঘটেনি।

শূদ্র, অন্ত্যজ, দলিতদের সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের মনোভাব কী ছিল, তা তাঁর এ সম্পর্কিত ভাবনার ঐতিহাসিক পর্যালোচনা সূত্রে বিচার্য। ঠাকুর পরিবার গোড়ায় ব্রাহ্মণ ছিলেন। কলকাতায় উপনিবিষ্ট হওয়ার অনেককাল আগে যবন-সংসর্গে পাতিত্য ঘটবার কারণে তাঁরা 'পীরালি ব্রাহ্মণ' রূপে চিহ্নিত হন এবং কিছুটা ব্রাত্য বলে পরিগণিত হন। দেবেন্দ্রনাথের আমলে এ পরিবারে লাগে ব্রাহ্মধর্মের ঢেউ। তখন থেকে স্মৃতিশাস্ত্র-নিয়ন্ত্রিত আচারবাদী হিন্দুধর্মের অভ্যস্ত গণ্ডির বাইরে বেরিয়ে আসার পথ তৈরি হয়। তবু তখনও একটু অবরুদ্ধতা ছিল। আভিজাত্যের নির্মোক। রবীন্দ্রনাথের সে সংস্কারটুকুও দূর হল যখন জমিদারি পরিচালনা করতে পূর্ববঙ্গের

জনপদে গেলেন। এখানে পেলেন মাটির কাছাকাছি আতিথ্য ও সেবা, সঙ্গ-সাহচর্য, অকৃত্রিম ভালোবাসা ও আনুগত্য। এই প্রথম একজন শহুরে যুবক, আপাদমস্তক অভিজাত মানুষ কাছ থেকে দেখলেন গ্রামকে, গ্রামবাসীকে, দরিদ্র ও দারিদ্র্যকে, অন্ত্যজকে, দলিতকে। যুবক রবীন্দ্রনাথের মধ্যে নতুন দৃষ্টির জন্ম হল। পূর্ববঙ্গের হতশ্রী জনপদ রবীন্দ্রনাথকে দিল এক আশ্চার্য সম্পদ : মানবতাবাদী দৃষ্টি।

এখানে একটি বিষয় লক্ষণীয়। হিন্দু সমাজের অন্ত্যজদের নিয়ে সরাসরি ভাববার আগে, হিন্দুধর্মের ভণ্ডামি ও গোঁরামি বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আগে সচেতন হয়েছেন। 'মানসী' কাব্যের বেশ কয়েকটি ব্যঙ্গ কবিতায় তিনি হিন্দু মৌলবাদের বিরুদ্ধে ক্ষোভ, ধিক্কার ও ব্যঙ্গবাণ বর্ষণ করেছেন। 'দুরন্ত আশা', 'দেশের উন্নতি', 'বঙ্গবীর', 'ধর্মপ্রচার' প্রভৃতি কবিতাগুলি পড়লে হিন্দু হিপোক্রাসির নগ্নরূপ ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক স্থিরবুদ্ধির অধিকারী যুবক রবীন্দ্রনাথের চোখে যে কীভাবে ধরা পড়েছিল তা বুঝতে পারা যায়। এর পরের ধাপে তিনি অগ্রসর হয়েছেন প্রথা বা সংস্কারের বেড়ি ভাঙতে, আর সবশেষে ভেঙেছেন বর্ণাশ্রম ধর্মের বেড়া। জাতিভেদ ও তার থেকে জাত অস্পৃশ্যতা যে মুক্ত মানবতার পরিপন্থী, মনুষ্যত্বের নির্মম অপমান এটা বুঝতে তাঁর কিছুটা সময় লেগেছে। তথ্য হিসেবে এটা দেখা যাচ্ছে যে, শান্তিনিকেতনের ব্রহ্মচর্যাশ্রমে প্রথম দিকে জাতিভেদ প্রথা মেনে চলা হত। ব্রাহ্মণ ছাত্ররা অব্রাহ্মণ শিক্ষকের পায়ে হাত দিয়ে প্রণাম করত না। ছাত্রাবাসে আহরের সময়ও মেনে চলা হত বর্ণাশ্রম ধর্মানুযায়ী পংক্তিভোজনের বহুকালাগত ছুঁৎমার্গের নীতি। পরে রবীন্দ্রনাথ এগুলি নিষিদ্ধ করেন। সে কেবল অপ্রয়োজনের কারণে নয়, বরং মানুষের সঙ্গে মানুষের সম্পর্ক যে এতে অতি অস্বচ্ছ হয়ে পড়ে, মানুষের অন্তরের দেবতার যে এতে অপমান হয়—একথা ভেবে। ১৯০৫-এ যখন বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন শুরু হল, তখন সে আন্দোলনের পুরোভাগে এসে রবীন্দ্রনাথের চোখে প্রকট হয়ে দেখা দিল যুগ-যুগান্তরের জাতিভেদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিষময় কুফল। পূর্ববঙ্গের বৃহত্তর জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের শক্তিশালী নেতা গুরুচাঁদ ঠাকুর ও তাঁর অনুগামীরা চাইছিলেন বঙ্গদেশ বিভাজিত হোক, এতে নিম্নবর্ণের ওপর বর্ণহিন্দুদের অত্যাচার একটু কমবে। স্বদেশি আন্দোলনের উত্তাল ভাবতরঙ্গের মধ্যেই মুসলমানদের মধ্যে দাবি উঠল স্বতন্ত্র রাজনৈতিক মঞ্চের। তার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯০৬ সালের ডিসেম্বরে গঠিত হল 'অল ইণ্ডিয়া মুসলিম লিগ'। এসব ঘটনা রবীন্দ্রনাথকে নতুন করে ভাবতে বাধ্য করল। ফলে যে রবীন্দ্রনাথ মাত্র কয়েক বৎসর আগে প্রাচীন ভারতীয় সমাজকেই আদর্স বলে মনে করতেন, তিনি এখন সেই সমাজের উৎসৃষ্টি বর্ণাশ্রমপ্রথার সমালোচনায় মুখর হলেন। ঠিক ঠিক ভাবে ধরতে গেলে 'গীতাঞ্জলি' রচনার সময় (১৯১০) থেকে রবীন্দ্রনাথের সমাজ-ভাবনার এই পরিবর্তনটি ধরা পড়ে। ওই কাব্যের ১০৬, ১০৭, ১০৮ ও ১১৯ সংখ্যক রচনায় কবি যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন, তাতে তাঁর সামাজিক ভেদবুদ্ধি-রহিত বিশুদ্ধ মানবতাবাদী কণ্ঠস্বর বেজে উঠেছে। ১০৬ সংখ্যাত কবিতার নাম 'ভারত-তীর্থ'। এটি রবীন্দ্রনাথের দেশচেতনার এক আশ্চর্য বাণীরূপ। এ কবিতায় কবি ধর্ম-বর্ণ-জাত-গোত্র-ধনী-নির্ধন নির্বিশেষে সমস্ত দেশবাসীকে ভারতীয়ত্বের মহান ঐক্যমন্ত্রে

দীক্ষাব্রত দান করেছেন। নব্য ভারতের মিলনতীর্থে সকলকে কবির অকুণ্ঠিত আহ্বান :

এসো ব্রাহ্মণ শুচি করি মন—ধরো হাত সবারার।
এসো হে পতিত হোক অপনীত সব অপমান ভার।।

১০৭ সংখ্যক কবিতাটি 'দীনের সঙ্গী', যেখানে কবির ভগবদ্ভক্তির সঙ্গে মানবপ্রীতির আশ্চর্য মিশেল ঘটেছে। গীতাঞ্জলির রবীন্দ্রনাথ সংসার-বৈরাগী নন। বরং অসংখ্য বন্ধনের ভিতর দিয়ে মুক্তির স্বাদ পাওয়াই তাঁর সাধকসত্তার লক্ষ্য। যাঁরা ধন-মান-কুলের দম্ভে অন্ধ, তাঁরা দেবতাকে খোঁজেন মন্দিরের পাষাণবেদীতে। তাই মানুষের ভিতর ঈশ্বরের সানন্দ অবস্থানকে তাঁরা দেখতে পান না। কবি নিজেকে দাঁড় করিয়েছেন সেই তাঁদেরই দলে; দেবতার উদ্দেশে আক্ষেপ জানিয়ে বলেছেন :

তোমার চরণ যেথায় নামে অপমানের তলে
সেথায় আমার প্রণাম নামে না যে
সবার পিছে, সবার নীচে, সবহারাদের মাঝে।

রবীন্দ্রনাথের দলিত-ভাবনার অসামান্য প্রকাশ ঘটেছে গীতাঞ্জলির ১০৮ সংখ্যায় 'অপমানিত' কবিতায়। এ অপমান মনুষ্যত্বের অপমান, মানুষের বিশুদ্ধ আত্মার অপমান। ঈশ্বরের পৃথিবীতে সব মানুষ সমান, সকলের সম অধিকার। অথচ শত শতাব্দী ধরে হিন্দু সমাজের দোর্দণ্ডপ্রতাপ সমাজপতিরা এক শ্রেণির মানুষকে শূদ্র, অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য বলে দেগে রেখেছে। তাদের মাথায় চেপে বসেছে শত শতাব্দীর অসম্মানের গুরুভার। ওরা প্রবঞ্চিত, শোষিত, নির্যাতিত। এই কবিতায় রবীন্দ্রনাথ পক্ষ নিলেন এদের। এর প্রতিটি অক্ষর মানহারাদের প্রতি সহমর্মিতায় আর্দ্র। তাই এ কবিতাকে বলা যায় নিপিড়িত দলিতের শ্রেষ্ঠ 'ম্যাগনাকার্টা'। 'হে মোর দুর্ভাগা দেশ' সম্বোধনে কবি তাঁর ভাবনাকে পৌঁছে দিতে চেয়েছেন সমাজের সেই উচ্চকোটিতে যারা একতাল ধরে এদের দলিত করে রেখেছে। এরা অশুচি হওয়ার ভয়ে তথাকথিত অন্ত্যজদের ঘৃণা করে প্রাণের ঠাকুরের দূরে সরিয়ে দিয়েছে। এর সামাজিক প্রতিফলন যে কী ঘটতে চলেছে, কবি তা অগ্নিগর্ভ ভাষায় ছয়টি স্তবকের মাধ্যমে উপস্থাপিত করেছেন। সমস্ত রচনাটি জুড়ে রয়েছে অত্যাচারী উচ্চ সমাজের প্রতি কবির সাবধানবাণী :

যারে তুমি নীচে ফেল সে তোমারে বাঁধিবে যে নীচে
পশ্চাতে রেখেছ যারে সে তোমাকে পশ্চাতে টানিছে।
অজ্ঞানের অন্ধকারে
আড়ালে ঢাকিছ যারে।
তোমার মঙ্গল ঢাকি গড়িছে সে ঘোর ব্যবধান।
অপমানে হতে হবে তাহাদের সবার সমান।

এই যে গীতিময় রচনাতে রবীন্দ্রনাথ তুললেন যুগযুগান্তরের মনুষ্যত্বের অপমানের কথা। দীর্ঘদিন ধরে এক শ্রেণির মানুষকে সামাজিক দিক থেকে অস্বীকার করা হয়েছে। তাদের মাথায় চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে অসম্মানের গুরুভার। এতে তাদের অন্তরের দেবতাও হয়েছেন অপমানিত। সে অপমান বেজেছে কবির বুকে। তিনি উন্নাসিক ঊর্ধ্বদৃষ্টিসম্পন্ন উচ্চ সমাজকে ডেকে বলেছেন:

তবু নত করি আঁখি
দেখিবারে পাও নাকি
নেমেছে ধূলার তলে হীন-পতিতের ভগবান,
অপমানে হতে হবে সেথা তোরে সবার সমান।

বস্তুত, এই 'হীন-পতিতের ভগবান'ই ''গীতাঞ্জলি'' পর্বের রবীন্দ্রনাথের সর্বশ্রেষ্ঠ ঈশ্বরানুভব। অন্ত্যজদের অসম্মানকারী উচ্চবর্ণের প্রতি এমন বলিষ্ঠ সাবধানবাণী স্বামী বিবেকানন্দ ছাড়া আধুনিক ভারতের আর কোনো মনীষী উচ্চারণ করেছেন বলে জানা নেই।

আধ্যাত্মিক ভারতবর্ষে ধর্ম সুপ্রাচীনকাল থেকে ঈশ্বরবিশ্বাসীর মনে শিকড় গেড়ে বসে আছে। প্রতিটি প্রাতিষ্ঠানিক ধর্মের সঙ্গে মিশে আছে বাহ্যিক কিছু আচার-সংস্কার। গোটা পৃথিবী জুড়ে মানুষের ওপর মানুষের যে নির্যাতন হয়েছে এবং হয়ে চলেছে তার মূলে রয়েছে অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধর্ম। ধর্মের নামে জিগির তোলা সহজ, কেননা প্রাচীনকাল থেকেই ধর্মব্যবসায়ীরা একে অফিস হিসেবে ব্যবহার করে এসেছে। অথচ প্রকৃত ধর্ম যে মানুষের অন্তরস্থ হৃদয়বৃত্তির পরিপূর্ণ বিকাশ, মোল্লা-পুরুত-যাজকতন্ত্র সে সত্য উপলব্ধি করতে পারেনি। গোঁড়া ধর্মবণিকরা ধর্ম বলতে বোঝেন অনড় বাহ্যিক কিছু আচার-আচরণ। আর এসব জঞ্জাল দিয়েই যে মানুষের অন্তরাত্মাকে ক্লিন্ন করে তোলা যায়, রবীন্দ্রনাথ তা দেখেছেন তাঁর বাস্তব অভিজ্ঞতায়। হিন্দুধর্মের অনুশীলনযোগ্য এমন আচার-সংস্কারের মধ্যে ছুঁৎমার্গিতা অন্যতম। মুখে এ ধর্ম বলে 'সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম', আর কার্যক্ষেত্রে শুচি-অশুচির ভেদ করে। উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণের ব্যবধান গড়ে তোলে। এই ভণ্ডামি মানবতাবাদী রবীন্দ্রনাথের কাছে অসহ্য। তাই প্রতিষ্ঠানিক ধর্ম যে কতখানি মানুষের হৃদয়ধর্মকে লাঞ্ছিত করে রবীন্দ্রনাথ তা বিশদভাবে বুঝিয়েছেন 'ধর্মের অধিকার' (১৯১১) প্রবন্ধে। মানুষকে তার যোগ্য মর্যাদা না দিয়ে জাতবর্ণগতভাবে বিচার করা যে মূঢ়তা তা দৃষ্টান্ত দিয়ে তিনি দেখিয়েছেন। রান্না ঘরের বাইরের বারান্দায় পড়ে-থাকা একটি ঘুড়ি নেওয়ার জন্য 'পতিত' জাতির একটি ছেলে সেখানে উঠলে 'রান্না ঘরের সমস্ত ভাত ফেলা গিয়াছিল, অথচ সেই দাওয়ায় সর্বদাই কুকুর যাতায়াত করে তাহাতে অন্ন পবিত্র হয় না'। তিনি ঐ প্রবন্ধে আরও একটি উদাহরণ তুলে ধরেছেন নমঃশূদ্রদের সম্পর্কে উচ্চবর্গীয় সমাজের দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রে। লিখেছেন : 'আমি পল্লীগ্রামে গিয়া দেখিয়া আসিলাম সেখানে নমঃশূদ্রদের ক্ষেত্র অন্য চাষীতে চাষ করে না। তাহাদের ধান কাটে না, তাহাদের ঘর তৈরি করিয়া দেয় না—অর্থাৎ পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে মানুষের কাছে মানুষ যে সহযোগিতা দাবী করিতে পারে আমাদের সমাজ ইহাদিগকে তাহারও অযোগ্য বলিয়াছে; বিনা অপরাধে আমরা ইহাদের জীবনযাত্রাকে দুরূহ ও দুঃসহ করিয়া তুলিয়া জন্মকাল হইতে মৃত্যুকাল পর্যন্ত ইহাদিগকে প্রতিদিনই দণ্ড দিতেছি।'

পূর্ববঙ্গে পৈতৃক জমিদারির তত্ত্বাবধানে গিয়ে পল্লীজীবনের ব্যাপ্ত অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ। শিলাইদহ পর্বে সদিরাজপুরের নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের পাষাণ মণ্ডলের সঙ্গে তাঁর আলাপ হয়েছিল। পাষাণের কাছে থেকেই জেনেছিলেন চণ্ডাল জীবনের অভিশাপ। প্রায় সমকালে লেখা 'গোরা' উপন্যাসে তিনি চরঘোষপুরের যে কাহিনিটি উপস্থাপন করেছিলেন তাতে ধরা পড়েছিল তাঁর নিম্নবর্গের প্রতি সহানুভূতি। যে গোরা এক অসহায় মুসলমান বালক প্রতিপালিত

হচ্ছে বলে নাপিতের বাড়িতে জল খেতে চায়নি, উপন্যাসের শেষে সেই সংকীর্ণতা থেকে মুক্ত করে রবীন্দ্রনাথ তাকে দাঁড় করিয়েছেন মানবতার উদার উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে। গোরার দৃষ্টি আরো উন্মুক্ত হয়ে যায় যখন সে জানতে পারে তার জন্মরহস্য। এতদিনের আচার-বিচারের ক্ষুদ্র গণ্ডিকে সে ভেঙে ফেলে দিয়ে মা আনন্দময়ীকে বলে, 'মা, এইবার তোমার লছমিয়াকে ডাক। তাকে বল আমাকে জল এনে দিতে।'

'জল'। অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ এক শব্দ। ভারতবর্ষে সাম্প্রদায়িকতা ও অস্পৃশ্যতার সহস্রাব্দব্যাপী সামাজিক প্রেক্ষাপটে। হিন্দু সমাজের মান্যগণ্য সমাজপতিরা স্পৃশ্য-অস্পৃশ্যের যে ভাগ করেছিলেন, সেই বিভাজনের অন্যতম প্রধান মানদণ্ড ছিল জল। কার হাতের ছোঁয়া জল চলবে আর কারটা চলবে না, এরই নিরিখে সমগ্র হিন্দুসমাজ বিভক্ত ছিল দুটি শিবিরে—জলচল ও জল-অচল। বিশ শতকের দুয়ের দশকে মাহারগোষ্ঠীর নেতা ড. বি. আর আম্বেদকরের নেতৃত্বে যে চৌদারপুকুর আন্দোলন হয়েছিল, সেখানে 'জল' ছিল আন্দোলনকারীদের কাছে একটি প্রতীকী হাতিয়ার। উচ্চবর্ণের ফতোয়াকে অগ্রাহ্য করে ঐ পুকুরের জল স্পর্শ করে আম্বেদকর ও তাঁর অনুগামীরা আসলে আত্মসম্মান ও স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা করতে চেয়েছিলেন। রবীন্দ্রনাথও এই তাৎপর্যেই জলকে ব্যবহার করেছেন তাঁর উপন্যাসে, কবিতায়, নৃত্যনাট্যে।

রবীন্দ্রনাথের দলিত সম্পর্কিত চিন্তা ক্রমশ পুষ্ট হয়ে উঠছিল সর্বভারতীয় অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের নানা ঘটনায়। মহারাষ্ট্রে ও দক্ষিণ ভারতের কিছু মন্দিরে দীর্ঘদিন ধরে অন্ত্যজদের প্রবেশ নিষিদ্ধ ছিল। তা নিয়ে অস্পৃশ্য নেতারা আন্দোলন শুরু করেন। মহারাষ্ট্রের মতো এ প্রদেশেও শুরু হয়ে যায় অন্ত্যজ হিন্দুর মন্দিরপ্রবেশ আন্দোলন। ঢাকা জেলায় চণ্ডাল তথা নমঃশূদ্রদের বাস সব থেকে বেশি। সেখানকার মুন্সিগঞ্জ এলাকায় স্বামী সত্যেন্দ্রর নেতৃত্বে নমঃশূদ্ররা একটি কালীমন্দিরে প্রবেশের চেষ্টা করে। পুলিশ বাধা দেয় ও আন্দোলনকারীদের মারধর করে। ১৯২৬ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে রবীন্দ্রনাথ যখন পূর্ববঙ্গের কুমিল্লায় গিয়েছিলেন, তখন সেখানে নমঃশূদ্রদের কনফারেন্সে যোগ দিয়েছিলেন (২২ ফেব্রুয়ারি)। [তথ্যসূত্র : প্রভাত কুমার মুখোপাধ্যায়, রবীন্দ্রজীবনী ও রবীন্দ্রসাহিত্য প্রবেশক, ৩য় খণ্ড, বিশ্বভারতী, ১৯৬১, পৃ. ২৩৬] নমঃশূদ্ররা তখন গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে শিক্ষা, সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার লাভে ক্রমশ সংঘবদ্ধ হতে শুরু করেছিল। এ সম্মেলনে যোগ দিয়ে রবীন্দ্রনাথ হয়তো একথাই বুঝিয়ে দিতে চেয়েছিলেন যে অন্ত্যজদের অধিকার অর্জন ও উন্নয়নের এই উদ্যোগকে তিনি সর্বান্তঃকরণে সমর্থন করেন।

অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথের ভূমিকা কী ছিল তার কিছুটা অনুমান করা যায় তাঁর লেখা বইপত্র ও সমকালীন নানা ঘটনার প্রতিক্রিয়ায়। তাঁর প্রতিষ্ঠিত আশ্রম বিদ্যালয়ে যে সব কুসংস্কার প্রচলিত ছিল, সেগুলি বর্জন করার জন্য ১৯২৬ সালে কয়েকটি তরুণ ছাত্র মিলে একটি সমিতি গঠন করে। তারা সমিতিটির নাম দেয় 'সংস্কার সমিতি'। ১৯৩২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে বিশেষ পরিস্থিতিতে এই সমিতির পুনর্জন্ম হয়। তরুণদের আগ্রহে রবীন্দ্রনাথ এই সমিতির পৃষ্ঠপোষক হন। ঠিক এই সময়েই বেরিয়েছিল তাঁর অতি বিখ্যাত নাটক 'কালের যাত্রা'। এ বইয়ের দুটি অংশ — 'রথের রশি' ও 'কবির দীক্ষা'। এর মধ্যে 'রথের রশি' ১৩৩০ বঙ্গাব্দের

অগ্রহায়ণ মাসে প্রবাসী পত্রিকাতে প্রকাশিত 'রথযাত্রা' নাটিকাটির পরিবর্তিত ও আগাগোড়া পুনর্লিখিত রূপ। কবি 'রথযাত্রা'র ভাবনা-বীজ পেয়েছিলেন তাঁর অত্যন্ত স্নেহভাজন ছাত্র প্রমথনাথ বিশীর কোনো লেখা থেকে। সুতরাং ১৯২৩ সালের শেষ দিক থেকেই যে রবীন্দ্রনাথের মাথায় শূদ্র জাগরণ বিষয়ক ভাবনার অভ্যুদয় ঘটেছিল, তা নিয়ে কোনো সংশয় নেই। আর ১৯৩২-এ তিনি নাটকটির পুনর্লিখন করলেন সেই সময়, যখন দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার দাবি উঠল। রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজির অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে সহমত ছিলেন, কিন্তু সম্ভবত বাবাসাহেব আম্বেদকরের তোলা মৌলিক প্রশ্নটির অন্দরে প্রবেশ করেননি। গান্ধীজি যেখানে বলেছিলেন, তিনি অস্পৃশ্যতা মানেন না, কিন্তু বর্ণবিভাজনে তাঁর সায় আছে; সেখানে আম্বেদকরের বক্তব্য ছিল : অস্পৃশ্যতা আর বর্ণবিভাজন দুটোই ওতপ্রোতভাবে যুক্ত —একই মুদ্রার এপিঠ-ওপিঠ। 'কাস্ট সিস্টেম' যতদিন থাকবে, ততদিন আউট-কাস্টের প্রশ্নটিও থেকে যাবে। যাইহোক 'রথের রশি'তে রবীন্দ্রনাথ ভারতবর্ষের সমাজবিকাশের ধারাকে রূপান্তরালে বিবৃত করলেন নাট্য উপাখ্যানের ভিতর দিয়ে, যার মূল তাৎপর্যের সঙ্গে অনেকাংশে মিল রয়েছে স্বামী বিবেকানন্দের 'বর্তমান ভারত' (১৯০৫) গ্রন্থে উপস্থাপিত এ দেশের সামাজিক ইতিহাসের বস্তুনিষ্ঠ বিশ্লেষণের। স্বামীজি যে শূদ্র জাগরণের কথা দিয়ে সমাপ্তি টেনেছিলেন তাঁর সামাজিক চিন্তাঋদ্ধ গ্রন্থটির, বিশ্বকবিও তিন দশক বাদে গিয়ে দাঁড়ালেন উপলব্ধির সেই ভূমিতেই। 'রথের রশি' নাটকের মূল ভাবটি কী, কবি সেটি নিজেই লিখে গিয়েছেন কথাসাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে উদ্দেশ্য করে লেখা একটি আশীর্বাণীতে : 'রথযাত্রার উৎসবে নরনারী সবাই হঠাৎ দেখতে পেলে, মহাকাশের রথ অচল। মানব সমাজে সকলের চেয়ে বড় দুর্গতি কালের এই গতিহীনতা। মানুষে মানুষে যে সম্বন্ধবন্ধন দেশে দেশে যুগে যুগে প্রসারিত, সেই বন্ধনই এই রথ টানবার রশি। সেই বন্ধনে অনেক গ্রন্থি পড়ে গিয়ে মানব-সম্বন্ধ অসত্য ও অসমান হয়ে গেছে, তাই চলছে না রথ। এই সম্বন্ধের অসত্য এতকাল যাদের বিশেষভাবে পীড়িত করেছে, অবনমিত করেছে মনুষত্বের শ্রেষ্ঠ অধিকার থেকে বঞ্চিত করেছে, আজ মহাকাল তাদেরই আহ্বান করেছেন তাঁর রথের বাহনরূপে; তাদের অসম্মান ঘুচলে তবেই সম্বন্ধের অসাম্য দূর হয়ে রথ সম্মুখের দিকে চলবে।'

কেবল 'রথের রশি'ই নয়, ১৯৩২ সালে রবীন্দ্রনাথ দলিত তথা অস্পৃশ্যতা বিষয়ে একগুচ্ছ কবিতা লিখেছিলেন সমকালীন ভারতবর্ষের অভিঘাত অন্তরে নিয়ে। আন্তর্জাতিকতা বোধে উত্তীর্ণ কবির কাছে বিশুদ্ধ মানুষই তখন তাঁর ধ্যানজ্ঞান। কাব্যচর্চায় ততদিনে গোধূলির রঙ লাগতে শুরু করেছে। চলছে 'পরিশেষ' ও 'পুনশ্চ'-র পালা। 'পুনশ্চ'-র মধ্যে ৪-৫টি কবিতা রয়েছে যারা ভাবের দিক থেকে খুবই কাছাকাছি। 'প্রথম পূজা' (২৮ শ্রাবণ, ১৩৩৯) 'শুচি' (১৭ নভেম্বর, ১৯৩২), 'রঙরেজিনী' (২৫ অগ্রহায়ণ,১৩৩৯), 'প্রেমের সোনা' (২৪ পৌষ, ১৩৩৯), ও 'স্নানসমাপন' (১৫ ফাল্গুন, ১৩৩৯)—এই পাঁচটি কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে রবীন্দ্রনাথের বিশিষ্ট জীবনদর্শন, যার সঙ্গে নিম্নবর্গচেতনার ঘনিষ্ট যোগ রয়েছে। এদের অগ্রজা হিসেবে আগেই জন্ম নিয়েছে 'পরিশেষ' কাব্যের 'জলপাত্র' (২৪ জুলাই, ১৯৩২) কবিতা। এ কবিতায়

কবি ফিরিয়ে আনলেন সেই 'জল'কে যা দীর্ঘদিন ধরে অস্পৃশ্যতা বিরোধী আন্দোলনের প্রতীকী হাতিয়ার। এক অন্ত্যজ নারী যে তার জন্মের হীনত্বে কুণ্ঠিত, সমাজের একপাশে থাকে গুটিয়ে, হঠাৎ তার কাছে এক বিশ্বজয়ী দৃপ্ত পুরুষ চাইল তৃষ্ণার জল। মেয়েটির মনে নানা ভাবনা উঠল কিলবিলিয়ে, আনত হল সে হীন বর্ণে জন্ম নেবার অপরাধে। তখন সেই পুরুষ তার সেই সংকোচ ভেঙে দেবার জন্যে প্রসন্ন কণ্ঠে বললে : 'মোর কথা শোনো/ শতদল পঙ্কজের জাতি নেই কোনো।' সুন্দরের কোনো জাত নেই, পাঁকে জন্মানো পদ্মের সৌন্দর্য ভিন্ন অন্য কোনো পরিচয় নেই, নেই তার পাপড়িতে জন্মস্থান পঙ্কের মালিন্য ও দুর্গন্ধ—এই তত্ত্ব প্রচার করে রবীন্দ্রনাথ বিশুদ্ধ মনুষ্যত্বকেই দিলেন প্রতিষ্ঠা। আর মেয়েটি সেই জলপাত্রের গায়ে আলপনা এঁকে সেই জ্যোতির্ময় পুরুষটির উদ্দেশে করল নিবেদন, যে একদিন ঘুচিয়েছিল তার হীনতার আবরণ। এই ভাবনাটিকেই বীজ করে এরপর রবীন্দ্রনাথ লিখবেন 'চণ্ডালিকা' (১৯৩৩) গদ্য নাটিকা এবং সেটা ভেঙে বানাবেন 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা' (১৯৩৯)। সে প্রসঙ্গে যাওয়ার আগে 'পুনশ্চ'-র কবিতা-পঞ্চককে একটু ছুঁয়ে যাই।

আগেই বলেছি, দেশে অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলন শুরু হলে তার জোর ঢেউ এসে লেগেছিল কবির হৃদয়-তটে। গল্প-নির্ভর ওই পাঁচটি কবিতায় সেই তরঙ্গের স্পর্শ টের পাওয়া যায়। টুকরো টুকরো কাহিনি উপস্থাপনার মাধ্যমে কবি তুলে ধরেছেন তাঁর মানবতাবাদী বক্তব্য। ক্ষুদ্র সংকীর্ণ জাতপাতের তুলনায় মানবতা যে অনেক বড়ো এবং মহার্ঘ বস্তু রবীন্দ্রনাথ সে কথাই বলতে চেয়েছেন কবিতাগুলির ভিতর দিয়ে।

প্রথমে আসি 'প্রথম পূজা' প্রসঙ্গে। অস্পৃশ্যতা পাপ বিমোচনের লক্ষ্যে লেখা এ কবিতা। একই সঙ্গে কীভাবে বর্ণবাদীরা অন্ত্যজদের অস্তিত্ব ও অধিকারকে নস্যাৎ করে দেয়, একটি ছোট্ট কাহিনির আশ্রয়ে তা ফুটিয়ে তুলেছেন কবি। ত্রিলোকেশ্বরের মন্দির, যা ছিল একদিন কিরাতদের, কালক্রমে ক্ষত্রিয়রা এসে অন্ত্যজদের হটিয়ে পেশীশক্তিতে তা অধিকার করে নেয়। লাগায় তাদের আর্যসংস্কৃতির শিলমোহর। একদিন প্রকৃতির রুদ্ররোষে মন্দিরের চূড়া ভেঙে পড়ল। দেববিগ্রহও হল ক্ষতিগ্রস্ত। অস্পৃশ্য কিরাতরা ছাড়া আর কেউ পাথরের কাজ জানে না। রাজা পড়লেন সংকটে। ঠিক হল, কিরাতের দল বাইরে কাজ করবে, আর ওদের শ্রেষ্ঠ শিল্পী মাধব দেবতার মূর্তি গড়বে চোখ বেঁধে, যাতে দেবতার মূর্তির ওপর তার চোখের অসুচি দৃষ্টি না পড়ে। একদিন কাজ শেষ হয়। প্রহরী যায় রাজাকে খবর দিতে। আর মাধব খুলে ফেলে তার চোখের বাঁধন :

একদৃষ্টে চেয়ে রইল দেবতার মুখে,
দুই চোখে বইল জলের ধারা।
আজ হাজার বছরের ক্ষুধিত দেখা দেবতার সঙ্গে তার ভক্তের।

বাকি ঘটনাটুকু অতি সামান্যই! যা ঘটে আখছার নিম্নবর্ণের প্রতি উচ্চবর্ণের ব্যবহারে। কবি লিখেছেন :

রাজা প্রবেশ করলেন মন্দিরে।
তখন মাধবের মাথা নত বেদীমূলে।

রাজার তলোয়ারে মুহূর্তে ছিন্ন হল সেই মাথা।
দেবতার পায়ে এই প্রথম পূজা, এই শেষ প্রণাম।

'শুচি' কবিতাটির পিছনে দক্ষিণ ভারতের কোচিনের বিখ্যাত কেলাপ্পনের মন্দির প্রবেশ আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল বলে কেউ কেউ মনে করেন। তাঁর আন্দোলন আমৃত্যু অনশনে গিয়ে পৌঁছেছিল। রবীন্দ্রনাথ তখন কোচিনের মহারাজাকে এই জননেতার দাবি মেনে নেওয়ার জন্য একটি পত্র দেন। এই সময়েই লেখা হয় 'শুচি'র মতো কবিতা। রবীন্দ্রনাথের মতে, সত্য যা সে চিরন্তন। আমাদের অন্তর্দৃষ্টি তাকে চিনতে না পারলে সে আমাদেরই মূঢ়তা। আমাদের সত্যবোধকে আচ্ছন্ন করে অহংকার—জাতের, বর্ণের, ধর্মের নিরর্থক অহমিকা। ধর্মের পথে যখন সত্যদৃষ্টি আচ্ছন্ন হয়, তখন প্রকৃত ঈশ্বরকে আর খুঁজে পায় না মানুষ, আশ্রয় করে থাকে কিছু বাহ্য সংস্কার, আচারের জীর্ণ খোলস। এর চেয়ে মূঢ়তা আর কি হতে পারে? কবীরের গুরু রামানন্দের জীবনের একটুকরো অনুভবের মধ্য দিয়ে এ সত্যকে তুলে ধরেছেন রবীন্দ্রনাথ। রামানন্দের ধর্মবোধে একদিন সংকীর্ণতার ছায়া পড়ল, সেদিন 'প্রসাদ নামল না তাঁর অন্তরে'। তাঁর অন্তরের অন্তর্যামী তিরস্কার করলেন তাঁকে। ব্যথিত রামানন্দ প্রায়শ্চিত্তের পথে এগোলেন। রাত্রি প্রভাত হওয়ার আগেই তিনি মন্দির ছেড়ে গ্রাম পেরিয়ে গেলেন প্রত্যন্ত লোকালয়ে। নদীতীরে শ্মশানে দাহকার্য করছে অন্ত্যজ চণ্ডাল। দুহাত বাড়িয়ে তাকে জড়িয়ে নিলেন বুকে। গেলেন মুসলমান জোলা কবীরের ঘরে। ধরলেন তার গলা জড়িয়ে। এভাবে আত্ম-উদ্বোধন ঘটল রামানন্দের। ধর্মকে উপলব্ধি করলেন বৃহত্তর মানবতার পরিসরে।

'শুচি'র কয়েকদিন পরেই লিখলেন 'মুক্তি'। এবারের গল্পটা পেশোয়া বাজিরাওকে নিয়ে। অভিষেক ক্রিয়া সম্পন্ন হবে তাঁর। মন্দিরে ঠাঁই না-পাওয়া অন্ত্যেবাসী কীর্তনী এসেছে সেই অভিষেক উৎসবে। আঙিনার এককোণে পিপুল গাছের তলায় কুণ্ঠিত হয়ে বসে সে একতারায় বাজিয়ে চলেছে মরমিয়া গান। গান শুনে উদাসী হলেন বাজীরাও। তারপর তার পোহানোর আগেই রাজসিংহাসন দু'হাতে ঠেলে রাজবাড়ি ছেড়ে বেরিয়ে গেলেন যুবরাজ 'পথের পথিক হয়ে'। অহংকার আর আভিজাত্যের বেড়াজাল থেকে মুক্তি ঘটল তাঁর। বাজীরাও বিবাগী হলেন জাত-হারা এক কীর্তনীয়ার গান শুনে, যার করুণ সুরে তাঁর সুপ্ত প্রাণ জেগে উঠেছিল, তিনি আর আটকে থাকতে চাননি স্বার্থলীন মূঢ় দৈনন্দিন জীবন যাপনের গ্লানিময় গণ্ডিতে।

এমনই আর এক প্রান্তবাসী নারীর সহজ ভাবনার স্পর্শে জেগে ওঠে আর এক পুরুষের মন—যার ভিতরে বিদ্যার বিপুল দম্ভ, যুক্তির সূক্ষ্ম তর্কজাল। তিনি দিগ্বিজয়ী পণ্ডিত শংকরলাল। তাঁর ডাক পড়েছে রাজবাড়িতে তর্কযুদ্ধে। বিজয়ী হলে মিলবে রাজার জয়পত্রী, পাণ্ডিত্যের সেরা শিরোপা। মলিন পাগড়ি রঙ করতে দিয়ে গেলেন জসীম রঙরেজের কাছে। জসীমের মেয়ে আমিনা। বয়েস তার সতেরো। পণ্ডিতের পাগড়িতে লেখা দেখলে, 'তোমার শ্রীপদ মোর ললাটে বিরাজে।' অনেক ভেবে আমিনা তার পাশেই রঙিন সুতো দিয়ে লিখলে, 'পরশ পাইনে তাই হৃদয়ের মাঝে'। শংকরলাল লেখাটা পড়লেন, বুঝলেন নীরস শাস্ত্রচর্চা আর কঠিন জ্ঞানের সাধনার অহংকারে এতদিন অন্তরের ঠাকুরকে তিনি মাথাতেই তুলে রেখেছিলেন, হৃদয়ের উষ্ণ অনুরাগে তাঁকে আপন করে পাননি! অথচ সরল শাস্ত্রজ্ঞানহীন এক বিধর্মী কিশোরী মেয়ের

হৃদয়ের অনুভব কত সত্য, কত সজীব। তাই দেখি, 'রঙরেজিনী' কবিতার উপান্তে খ্যাতিমান পণ্ডিতশ্রেষ্ঠ শংকরলাল তাঁর আভিজাত্য বিসর্জন দিয়ে শেষ অব্দি ধরা দিলেন তুচ্ছ এক রঙরেজিনীর কাছে : 'রাজবাড়ির পথ আমার হারিয়ে গেল, আর পাব না খুঁজে।'

ঈশ্বরকে পাওয়া যায় কোথায়—ধর্মের শুষ্ক আচারে না হৃদয়ের নিভৃত অনুভবে? কে সত্যজ্ঞানের অধিকারী—পথের ধুলো ঝাঁট দেয় যে চামার, না স্মৃতিশিরোমণি ব্রাহ্মণ পণ্ডিত? 'প্রেমের সোনা' কবিতায় এ তর্কের অবসান ঘটিয়েছেন কবি একটি গল্পাণুর মাধ্যমে। সংস্কারমুক্ত রামানন্দের স্পর্শধন্যা রবিদাস চামার, অচ্ছুৎ। পথিকেরা চলে তার ছোঁয়া বাঁচিয়ে। চিতোরের রানি ঝালি রবিদাসের গানে পেলেন সহজ প্রাণের উত্তাপ। অস্পৃশ্য চামারের কাছে নিলেন হরিপ্রেমের দীক্ষা। সব শুনে ধিক্কার দিলেন রাজকুলের পুরোহিত। জানালেন এতে নত হয়েছে বর্ণশ্রেষ্ঠের মাথা, তার শাস্ত্রচর্চার গরিমা। প্রত্যুত্তরে রানি বললেন, আচারের হাজার গ্রন্থি দিয়ে যে ধর্ম বাঁধা, সেই বাঁধনের ফাঁক গলে কখন যে প্রেমের সোনা খসে পড়েছে, ব্রাহ্মণ তা জানতেই পারেননি। কিন্তু তাঁর ধুলোমাখা গুরু সে সোনা কুড়িয়ে নিয়েছেন ধুলো থেকে। রানি তাই স্পষ্ট জানালেন :

অর্থহারা বাঁধনগুলোর গর্বে, ঠাকুর
থাকো তুমি কঠিন হয়ে।
আমি সোনার কাঙালিনী
ধুলোর সে দান নিলেম নাথায় করে।

'পুনশ্চ'-র আর একটি অসামান্য কবিতা 'স্নান-সমাপন'। এ কবিতারও কেন্দ্রভূমিতে রামানন্দ যিনি অন্তরে দেবতার কল্যাণময় রূপ অনুভবের জন্য ব্যাকুল। গঙ্গার জলে শুচিস্নান করতে নেমেছেন তিনি। প্রাতঃকাল। সূর্যকে আজ প্রণাম করতে তাঁর প্রণাম বেঁধে গেল। হঠাৎ কী মনে করে জল থেকে উঠে পড়লেন তিনি। ভিজে কাপড়ে যাত্রা শুরু করলেন সেইদিকে, যেদিকে ভদ্রপাড়া নেই। এসে তিনি প্রবেশ করলেন অন্ত্যজ, অস্পৃশ্য, অশুচি ভাজন মুচির ঘরে। সঙ্গের শিষ্য ঘৃণায় গুটিয়ে গেল। ভাজন এসে লুটিয়ে প্রণাম করলে সাবধানে। গুরু তাকে তুলে নিলেন বুকে। বললেন, যে-স্নান গঙ্গার পাবনীধারাতেও সম্পূর্ণ হয়নি, আজ মুচির ঘরে তাকে আলিঙ্গন করে শুদ্ধ হলেন তিনি। 'এতক্ষণে তোমার দেহে আমার দেহে / বইল সেই বিশ্বপাবন ধারা।' মানুষকে অন্তর থেকে ভালোবাসতে না পারলে যে ঈশ্বরও ধর্মনিষ্ঠের কাছে অধরা থাকেন, এই জীবনসত্য এ কবিতায় প্রকাশ পেয়েছে।

শুধু কাব্য-কবিতায় উচ্চ জীবনবোধের আদর্শ প্রচার নয়, বাস্তব ক্ষেত্রেও রবীন্দ্রনাথ সেই আদর্শকে অনুসরণ করেছেন যথাসাধ্য। তিনি চিরকাল তাঁদেরই পাশে এসে দাঁড়িয়েছেন, যাঁরা বিশুদ্ধ মানবতার আদর্শে উদ্বুদ্ধ হয়ে লড়াই করেছেন দেশ থেকে সমস্ত ধর্মীয় কুসংস্কার, ভণ্ডামি, অনাচার ও তজ্জনিত পীড়নকে দূর করার জন্য। ১৯৩২ সালের ১১ ডিসেম্বর চন্দননগরে এমনই এক অস্পৃশ্যতা-বিরোধী সভার আয়োজন করেছিলেন প্রবর্তক সংঘের নেতা মতিলাল রায়। সংঘের তরফে সভায় আহ্বান জানানো হয়েছিল সত্তরোর্ধ রবীন্দ্রনাথকে। তিনি সশরীরে হাজির থাকতে পারেননি, তবে আহ্বানে সাড়া দিয়ে পাঠিয়েছিলেন একটি লেখা, যাতে তাঁর

অস্পৃশ্যতা-বিরোধী বক্তব্য অত্যন্ত জোরালো ও দ্বর্থহীন ভাষায় প্রকাশ পেয়েছে। তিনি লিখেছেন: ''প্রবাদ আছে, 'কথায় চিঁড়ে ভেজে না'। তেমনি কথার কৌশলে অসম্মান প্রমাণ হয় না। কুকুরকে স্পর্শ করি, মানুষের স্পর্শ বাঁচিয়ে চলি। বিড়াল ইঁদুর খায়, উচ্ছিষ্ট খেয়ে আসে, খেয়ে আচমন করে না, তদবস্থায় ব্রাহ্মণীর কোলে এসে বসলে গৃহকর্ম অশুচি হয় না। পঙ্কের মধ্যে মেছুনী মাছ ধরে, তাই বলে সকল অবস্থাতেই সে পঙ্কিল এমন কথা বলা চলে না। ... উচ্চবর্ণের মানুষ যেসব দুষ্কৃতি করে থাকে, তার দ্বারা তাদের চরিত্র কলুষিত হলেও দেবমন্দিরে তাদের প্রবেশ অবাধ। ... দেহ বা চরিত্র যার কলুষিত, ঘৃণা করে সেই সকল ব্যক্তিবিশেষকে দূরে বর্জন করলে দোষ দিতে পারিনে, কিন্তু কোনো সমগ্র জাতকে অবজ্ঞা করার স্পর্ধা দেবতা ক্ষমা করেন না। ... কোনো জাতির হীনতা জন্মগত ও নিত্য, একথা মনে করাকে আমি অমার্জনীয় অধর্ম জ্ঞান করি।''

শুধু দলিতদের অস্তিত্ব ও মানবিক পক্ষেই রবীন্দ্রনাথ সওয়াল করেননি, তিনি নিম্নবর্গের রচিত সাহিত্যকেও (যা মৌখিক সৃষ্টি) খুব গুরুত্বপূর্ণ স্থান দিয়েছিলেন তাঁর সাহিত্যচিন্তায়। নীচু জাতের মানুষেরা বিদ্যালয়ে লেখাপড়ার সুযোগ পায়নি, কিন্তু সৃষ্টিশীলতায় তারা নূন্য নয়। এই লোকসাধারণের গড়া সাহিত্যকে তিনিই প্রথম নামাঙ্কিত করলেন 'লোকসাহিত্য' অভিধায়। এই সাহিত্য অকৃত্রিম ও শাশ্বত। এর সৃষ্টির পিছনে দলিত জনগোষ্ঠীর ভূমিকার কথা উল্লেখ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন : 'যখন নমঃশূদ্র, ছুতার, জেলে, মুচি, ভুঁইমালী প্রভৃতি কুলে উৎপন্ন বাউলদের কথা ও রচনা দেখি তখন আমার মনে হয় এমন সব কথা বলিতে পারিলে আমরাও ধন্য হইলাম। ইহাই খাঁটি, শাশ্বত, সার্বভৌম গণসাহিত্য। আধুনিক এ দেশে কৃত্রিম গণসাহিত্যগুলি তো বিদেশের উচ্ছিষ্ট ও অধম অনুকরণ মাত্র।' অনক্ষর কিন্তু ব্যবহারিক জীবনের শিক্ষায় শিক্ষিত অন্ত্যজ মানুষের সৃজনশীলতার ব্যাপারেও তাঁর উচ্চ ধারণা ছিল। তিনি তাঁর নিজের গানে ও কবিতায় বাউল, ফকির, পল্লীকবিদের রচিত গানের বাণী ও সুরের প্রভাব স্বীকার করেছিলেন।

রবীন্দ্রনাথের দলিত-চেতনার আর একটি স্মারক তাঁর বিশিষ্ট গদ্য-নাটিকা 'চণ্ডালিকা'। এটি প্রথম আত্মপ্রকাশ করে ১৯৩৩ সালের ৪ অক্টোবর। এর সৃষ্টির পেছনে শ্রদ্ধেয় শান্তিদেব ঘোষ সমকালের অস্পৃশ্যতা-বিরোধী আন্দোলনের কথা উল্লেখ করেছেন। 'রবীন্দ্রসঙ্গীত' গ্রন্থে লিখেছিলেন—'''চণ্ডালিকা'র সময় ভারতবর্ষে মহাত্মাজির হরিজন-আন্দোলন খুব জোরে চলছে—এই আন্দোলনের সমর্থনেই গুরুদেব 'চণ্ডালিকা' নাটক লিখেছেন।'' এ নাটকের কাহিনি-সূত্র হিসেবে রবীন্দ্রনাথ নিজেই উল্লেখ করেছিলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র সম্পাদিত 'The Sanskrit Buddhist Literature of Nepal' গ্রন্থের 'শার্দুলকর্ণাবদান'-এর চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতি ও বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দর উপাখ্যানটিকে। আবার এ নাটক ভেঙে এরও পাঁচ বছর পরে প্রকাশ করলেন 'নৃত্যনাট্য চণ্ডালিকা'—নাচ ও গানের যুগল মিলনে যা অনন্য। নাট্যের এই দুই সংরূপেই রবীন্দ্রনাথ তাঁর কাহিনি-উৎসকে অনেকাংশে অনুসরণ করেও ভিন্ন লক্ষ্যের দিকে গল্পকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছেন। চণ্ডাল-কন্যা প্রকৃতির বর্ণগত পরিচয়টির ওপর আলো ফেলেছেন বেশি। জন্ম থেকে সে শুনে আসছে সমাজে চণ্ডালরা অস্পৃশ্য, অচ্ছ্যুৎ। তাদের সামাজিক মর্যাদা নেই কোনো। সবাই তাদের এড়িয়ে যায়। তার দিকে ঘৃণার দৃষ্টি ছুঁড়ে বলে : 'ওকে ছুঁয়ো না, ছুঁয়ো না, ছি / ও

যে চণ্ডালিনীর ঝি।' সবাই তাকে ঠেলে ফেলে দেয় পরিত্যক্ত আবর্জনার মতো 'অপমানের অন্ধকারে'। কুণ্ঠায়, অপমানে কুঁকড়ে থাকে সে। চণ্ডাল-জন্মের গ্লানি প্রতি পদে পদে অশুচিতার নরকে পচিয়ে মারে ফুলের মতো মেয়ে প্রকৃতিকে। গ্লানিজর্জর প্রকৃতি মাকে নীরব ব্যথায় প্রশ্ন করে, 'জন্ম কেন দিলি মোরে!' এমনই আত্মগ্লানির দিনে তার কাছে এসে তৃষ্ণার্তের জল চাইল এক সৌম্যদর্শন যুবক। সে বুদ্ধ-শিষ্য আনন্দ। পীতবসন পরনে। 'ভোরবেলাকার আলো দিয়ে তৈরি তার রূপ।' শিউরে উঠল প্রকৃতি, চমকে উঠল তার প্রাণ। বিস্ময় কাটিয়ে দূর থেকে প্রণাম করে নতমুখে সে জানাল : 'ক্ষমা করো প্রভু, ক্ষমা করো মোরে—/আমি চণ্ডালের কন্যা, / মোর কূপের বারি অশুচি।' ভিক্ষু আনন্দ তাকে বললেন—'যে মানুষ আমি, তুমিও সেই মানুষ, / সব জলই তীর্থজল, / যা তাপিতকে স্নিগ্ধ করে, তৃপ্ত করে তৃষিতকে।' সম্মোহিত, স্তম্ভিত, আপ্লুত প্রকৃতি দিল তাকে এক গণ্ডূষ জল। তৃষ্ণা-পরিতৃপ্ত আনন্দ চলে গেল প্রকৃতির কল্যাণ কামনা করে। এবার প্রকৃতির মনের মধ্যে শুরু হল তোলপাড়। তার নারীজন্মের সব পাপ যেন ধুয়ে গেল ওই এক গণ্ডূষ জলে। এ উপাখ্যান থেকে এটুকু বুঝতে অসুবিধা হয় না যে, রবীন্দ্রনাথ এ কাহিনি রচনা করে তুলে ধরতে চেয়েছেন মনুষ্যত্বের সেই অমর মহিমাকে, যা জাত-বর্ণ-ধর্মের সংকীর্ণ গণ্ডির মধ্যে আবদ্ধ থাকে না। বৌদ্ধভিক্ষু আনন্দ অযাচিতভাবে চণ্ডাল-কন্যাকে মানুষের সমানাধিকার দিয়ে তার হাতে তৃষ্ণার জল পান করে অস্পৃশ্য প্রকৃতির জন্মজন্মান্তরের কালি ধুয়ে মুছে তার হীনম্মন্যতা দূর করে আত্মবিশ্বাস জাগিয়ে দিয়ে গেলেন। জানিয়ে দিয়ে গেলেন যে, তার সেবাও চলবে বিধাতার সংসারে। এতদিনে ধর্মের প্রকৃত অর্থ বুঝতে পেরেছে প্রকৃতি : 'যে ধর্ম অপমান করে সে ধর্ম মিথ্যে।' এই অসাধারণ বাক্যে ধর্মসাধক রবীন্দ্রনাথ এসে হাত ধরলেন মানব-সাধক রবীন্দ্রনাথের, যিনি বিশ্বমানবতার প্রশস্ত আঙিনায় জগতের আনন্দযজ্ঞে সকল বিশ্বাবাসীকে করেছেন প্রাণখোলা আমন্ত্রণ, যেখানে ভেদ নেই ধর্মের, বর্ণের, জাতের, জন্মের। তাঁর দলিত-ভাবনা আসলে বৃহত্তর মানবচিন্তারই অংশ। অন্ত্যজদের প্রকৃত বন্ধু হয়ে-ওঠা রবীন্দ্রনাথের মধ্যে মেলে তাঁর 'বড় আমি'র এক সমুন্নত চেহারা। সেই বিরাট মহিমাময় পুরুষকে জানাই এক জন্ম-অন্ত্যজের দীন প্রণাম।

শ্রীকবিকঙ্কণ-চণ্ডী লোকাচার, প্রথা ও লোকবিশ্বাস লোকজীবনের ঐতিহ্য অনুশীলন

সন্দীপকুমার মণ্ডল*

লোকসংস্কৃতির মূল শিকড় আদিম সমাজের[১] গভীরে অবস্থিত হ'লেও এর ক্রমবিস্তারিত প্রকাশমান রূপ আধুনিক সমাজ-সংস্কৃতির স্পর্শ লাভ করেছে। শিষ্ঠ সমাজে আজও পুরাতন ঐতিহ্যময় প্রথা, আচার, বিশ্বাস বিদ্যমান আছে। সমাজজীবনে এসবের কোনো না কোনো মঙ্গলময় দিক নিশ্চিত ছিল কিংবা আছে, নতুবা ব্যক্তি এবং গোষ্ঠীগত মানবজীবন এই প্রথা, আচার, বিশ্বাসের প্রতি গভীর আনুগত্য দেখাবে কেন? অবশ্য সব 'আনুগত্য' যে মঙ্গলকে আহ্বান করে না কিংবা মূল্যবোধের দলিল হ'য়ে ওঠে তা সর্বত্র সত্য নাও হ'তে পারে। মঙ্গলকাব্য প্রাগাধুনিক সময়ের কাব্য। লোকায়ত সমাজ, সংস্কৃতির প্রভাব এ সময়ের আখ্যান কাব্যগুলির মধ্যে পাওয়া যায়। কবিরাও সামাজিক শৃঙ্খলের মধ্যে বসবাস করেও কখনো কখনো সময়কে অতিক্রম ক'রে যান। কবিকঙ্কণ সমকালীন প্রচলিত ঐতিহ্যের ওপর আঘাত ক'রে মূল্যবোধের সঙ্গীতকে মানস কর্ণে পৌঁছে দিতে পেরেছিলেন। মঙ্গলকাব্যে সেই রীতির কাঙ্ক্ষিত অনুশীলন আছে।

কাব্যে হোক আর দর্শনে হোক সমাজ-রাষ্ট্রকে যদি আরো সুস্থ, সবল, সাম্য ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত করতে হয় তবে পরিবর্তনের বীজগুলোকে গোড়া থেকে বপন করতে হয়। প্রাগাধুনিক ভারতীয় সংস্কৃতি তথা বাঙালি সংস্কৃতির মূল কেন্দ্রটি প্রধানত তার সংস্কার, বিশ্বাস, আচার, প্রথা নির্ভর। জানি, সব সংস্কার, বিশ্বাস, প্রথা, আচার—মানুষকে সংঘবদ্ধ করেনি। আবার সর্বজনীন হ'য়েও ওঠেনি। সর্বত্র গোষ্ঠীভেদে সংস্কৃতির রূপান্তর ঘটেছে যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রেক্ষিত তেমনি রচনাও করেছে। মঙ্গলকাব্যগুলোতে ভিন্ন ভিন্ন মানবগোষ্ঠীর ভিতর থেকে আখ্যান ভাগ সংবদ্ধ হয়েছে। ব্যাধ, ডোম, অন্ত্যজ বণিক প্রভৃতি আদিমগোষ্ঠী মঙ্গলকাব্যের ভরকেন্দ্রে অবস্থিত। 'ধর্মমঙ্গল কাব্যে' নিম্নবর্গীয়, তথা নিম্নবর্ণীয় অস্পৃশ্য যোদ্ধাদের (লক্ষ্মী ডোম, কালু ডোম প্রমুখ) কথা আছে। 'মনসামঙ্গল কাব্য'-এ চাঁদ সদাগরের একটা বিশ্বাসের জগত ছিল। পারিবারিক প্রথা, আচার নিঃসন্দেহে বণিক সংস্কৃতিরও অঙ্গ, আভরণ। সদাগরের আভিজাত্যে ছিল ঐতিহ্যের অনুসরণ, বিশ্বাসের বিস্তার, তবু মনসার নিষ্ঠুর হস্তক্ষেপে ঐতিহ্য ভেঙে যেতে দেখা গেছে, বিশ্বাসের ধ্বজা মুখ থুবড়ে পড়েছে। দীপ্তির পরাভব কাঙ্ক্ষিত নয় তবু ব্যক্তির আচার-বিশ্বাস পরিবার থেকে সমাজজীবন, লোকজীবনের মধ্যে সঞ্চারিত হ'য়ে যায়। মঙ্গলকাব্যের কবিরা যে প্রত্যয় নিয়ে কাব্য রচনায় প্রবৃত্ত ছিলেন

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

তা নিঃসন্দেহে সমকালীন বি(্বাসের পরিপন্থী। লোকবি(্বাসের ওপর আঘাত কিংবা লোকাচারকে অগ্রাহ্য সেকাল থেকে বোধকরি সম্ভব হয়েছিল। তবু সমকালীন লোকাচার, প্রথা বি(্বাসকে গ্রাহ্য ক'রে রচিত হয়েছে বাংলা মঙ্গলকাব্য।

কবিকঙ্কণের কাব্যে প্রাধান্য পেয়েছে লোকজীবনের সমাজ-সংস্কৃতি, ব্যাধ কালকেতু-ধর্মকেতুর জীবন যাপনের কথা। ব্যাধ সমাজের উত্তরণের সঙ্গীতভাষ্য রচনা করতে গিয়ে বাঙালির লোকাচার, লোকবি(্বাস, প্রথার প্রসঙ্গাদি কাব্যে অঙ্গাঙ্গিভাবে জড়িয়ে গেছে। কবির শিল্পিত প্রতিভায় উঠে এসেছে জন্ম, বিবাহ, মৃত্যু সম্পর্কিত লোকাচার, প্রথা, লোকবি(্বাস। বাদ যায়নি নিত্যকর্ম, সম্মান প্রদর্শন, কাজের দায়িত্ব প্রদানে পান, গুয়া, দান, নিষেধাজ্ঞা, বন্ধক, বলিদান, জাতিভেদ, বহু বিবাহ, অশুভ যাত্রা, শুভযাত্রা, মেয়েদের বাম চ(ু কম্পন, বশীকরণ প্রভৃতি আচার, প্রথা, লোক বি(্বাসের কথা। কাব্যে এ সকলের প্রকাশ কত বিচিত্র তা সন্ধানের আগে লোকাচার, লোকপ্রথা ও লোকবি(্বাসের স্বরূপ সম্পর্কে সং(েপে জেনে নেওয়া প্রয়োজন।

লোকাচার

'লোকাচার'-এর ইংরেজি প্রতিশব্দ বলা যেতে পারে 'Custom'। সংঘবদ্ধ বা গোষ্ঠীবদ্ধ লোকজীবনের ঐতিহ্যমণ্ডিত আনুষ্ঠানিক সর্বজনীন আচরণত্র(মকে 'লোকাচার' বলা যায়। সমাজজীবনে যে সমস্ত 'প্রথা' অনুষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত(হ'য়ে আচরিত হয় সেগুলিকে লোকাচার হিসেবে গ্রাহ্য করা হ'য়ে থাকে। লোকাচারও এক ধরনের প্রথা কিন্তু অনুষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্তি(র ফলে প্রথা (Folkways) লোকাচারে পর্যবসিত হয়। 'লোকাচার' সম্পর্কে বলা হয়েছে 'The word custom is used to apply to the totality of behaviour patterns which are carried by tradition and lodged in the group; as contrasted it with more random personal activities of the individual.'[২] মনে রাখতে হবে, প্রথা ও লোকাচার কোনো নির্দিষ্ট স্তরেই সীমাবদ্ধ এবং কখনো কখনো সমার্থক, উভয়েই লোকসংস্কৃতির অংশ।

লোকাচার গোষ্ঠীবদ্ধ লোকজীবনের একটি ধারণা (concept) মাত্র, সমাজজীবনে বাস্তব প্রয়োগের ওপর এর সার্থকতা নির্ভর করে। নানা কৃত্যের (Ritual) ওপর ভিত্তি ক'রে বা পদ্ধতি অনুসরণ ক'রে লোকাচারের ধারণাগুলিও বাস্তবায়িত হয়। অবিভক্ত(বাংলাদেশের সমাজজীবনে লোকাচারের বহু দৃষ্টান্ত ল(করা যায়। প্রাক্-বিবাহ লোকাচার থেকে জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু পর্যন্ত এর সুবিন্যস্ত পরিধি আছে। কৃত্যের সঙ্গে লোকাচারের সম্পর্ক হ'ল, একাধিক কৃত্য বাস্তবায়িত হ'য়ে লোকাচারে পরিণত হয় আর একই ভাবে একাধিক লোকাচর পরিণত হয় অনুষ্ঠানে (ceremony)। বলা যায় যে, সামাজিক অনুশাসনও কখনো কখনো একক কৃত্যের মাধ্যমে সম্পাদিত হয় আর তখন তা অনুষ্ঠান হ'য়ে ওঠে।

লোককথা

'Folkways'-কে মোটামুটিভাবে 'প্রথা' বলা যেতে পারে। প্রথার সঙ্গে লোকাচারের যোগ আছে। গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের ঐতিহ্যানুসারে ধারাবাহিক ও সর্বজনীন যে আচরণত্র(ম তাই হল

প্রথা। প্রথার সাহায্যে মানুষের কর্মধারা নিয়ন্ত্রিত হয় যদি তারা বিশেষ কোনো সমাজ বা গোষ্ঠীভুক্ত(হয়। প্রথা কিংবা লোকাচার প্রকৃতপ(সমাজের মধ্য থেকে উঠে আসা সাধারণ মানুষের দীর্ঘদিনের অলিখিত রীতি-নীতি। আধুনিক রাষ্ট্রীয় পরিকাঠামো গড়ে ওঠার অনেক আগে থেকেই মানবজীবনে প্রথা মূলত মূল্যবোধ, নীতিপরায়ণ ও শৃঙ্খলার নির্দেশক হিসেবে কাজ করেছে। W.G. Summer, বলেছেন 'they are like the products of natural forces which men unconsciously set in operation, or they are like the intinctive ways of animals, which are developed out of experience, which reach a final form of maximum adoption to an interest, which are handed down by tradition and admit of exception or variation, yet change no meet new condition, still with in the same limited methods, and without rational reflection or purpose.'[৩] প্রথাগুলোকে বি(-ষণে দেখা যাবে যে, এ ঐতিহ্যের প্রতি আনুগত্যের পাশাপাশি সামাজিক শৃঙ্খলা এবং সৌন্দর্য সৃষ্টির সহায়ক। প্রথার উদ্দেশ্য প্রধানত ব্যক্তি(গত ও গোষ্ঠীগত জীবনকে মঙ্গলের দিকে নিয়ে যাওয়া। অবশ্য গোষ্ঠী নির্ভরতার মাধ্যমে মানুষের সার্বিক জীবনে লোককথা প্রভাব সৃষ্টিতে ভূমিকাও গ্রহণ করে।

প্রথাকে মানুষ সামাজিক রীতি-নীতির কারণে মান্য করলেও এ সহজাত প্রবৃত্তি বা জীবনের অপরিহার্য কোনো আচরণের সমগোত্রীয় নয়। মূলত জৈবী প্রেরণার (Biological inspiration) দ্বারা তাড়িত হ'য়ে স্বার্থ র(ার তাগিদে মানুষ প্রথার কাছে আত্মসমর্পণ করে। আমরা জানি, সমাজের আভ্যন্তরীণ রীতি-নীতি পরিবর্তনের পাশাপাশি মূল্যবোধ পরিবর্তিত হ'তে থাকে। জীবনের প্রয়োজন নির্দিষ্ট কোনো সীমানায় বাঁধা নেই বলে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে মূল্যবোধ, মনুষ্যত্বগুলো বিবর্তিত হ'য়ে চলেছে। ফলে প্রথার বিলুপ্তি যেমন ঘটে চলেছে তেমনি নূতন প্রথার জন্ম হচ্ছে। অতীতের অনেক প্রথা আবার সময়ানুবর্তনে আজও টিকে আছে। প্রাগাধুনিক সাহিত্যের (ে ত্রে এ প্রবণতা উভয় দিকে সত্য। মূল কথা হ'ল, অনেক অনেক প্রথা লুপ্ত হয়েছে, আবার কিছু কিছু আজও টিকেও আছে।

লোকবিশ্বাস ও সংস্কার

গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের সামগ্রিক জীবন-যাপনে, প্রাগৈতিহাসিক জীবনে স্থিতিময় প্রজন্ম পরম্পরার ঐতিহ্যগত বিশ্বাস হ'ল-'লোকবিশ্বাস'। 'Folk belief'-কে লোকবিশ্বাসের ইংরেজি প্রতিশব্দ বলা চলে। বিশ্বাস হ'ল প্রত্যয়। কোনো কিছুর প্রতি বিশ্বাসী হওয়াতে কখনো কখনো কোনো যুক্তি(সঙ্গত বি(-ষণ সব সময় সব (ে ত্রে থাকে না। মানুষের সীমাহীন অসহয়তা ব্যক্তি(বা সমাজের মানসিকতার ওপর প্রভাব ফেলে আর মঙ্গল বা শুভ হবে ভেবে দ্বিধাহীনভাবে কখনো কখনো অনুসন্ধান না ক'রে পূর্বসূরিদের বিশ্বাস মেনে নেওয়া হ'য়ে থাকে। ব্যক্তি(গত কোনো বিশ্বাস গোষ্ঠীর ওপর স্থায়ী ছাপ ফেলতে সমর্থ হ'লেও লোকসংস্কৃতির আলোচ্য বিষয়ে গু(ত্ব দেওয়া হয় লোকসাধারণ বা গোষ্ঠীবদ্ধ মানুষের বিশ্বাসকে। যেহেতু বিশ্বাসের জগৎ অধিকার ক'রে থাকে মানুষের মন-মানসিকতা(তাই বৈজ্ঞানিক বি(-ষণ প্রায়শ এখানে

অপ্রাসঙ্গিক হ'য়ে পড়ে। সমাজ জীবনে লোকবিশ্বাসের গু(ত্ব সত্য হোক আর মিথ্যাই হোক লোক বিশ্বাসের দ্বারা চালিত হ'য়ে নিত্য কাজে লোকে উৎসাহ পায় এবং কখনো হ'য়ে ওঠে আত্ম-প্রত্যয়ী। এ বিশ্বাস অলৌকিক জগত থেকে মানব মনে অনেক (ে ত্রে স্থায়ীত্ব লাভ করে।

লোকসংস্কারের সঙ্গে কেউ কেউ লোকবিশ্বাসকে অভিন্ন ক'রে দেখেন। মানসিক প্রত্রি(য়া যখন কাজে রূপ পায় তখন তাকে লোকসংস্কার বলা যায়। লোক বিশ্বাসের প্রায়োগিক দিক হ'ল, লোকসংস্কার। যেমন কোথাও যাবার সময় 'হাঁচি' পড়লে কিছু(ণ বসে তারপর যেতে হয়। একে বিশ্বাস বললে সামগ্রিক কাজটি হবে লোকসংস্কার। লোকবিশ্বাস ও লোকসংস্কার সম্পর্কে 'বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ' গ্রন্থে বলা হয়েছে 'লোকবিশ্বাস যেখানে একান্তভাবে একটা ধ্যান-ধারণা মাত্র, সে(ত্রে সংস্কারে কিছু আচার-আচরণ প্রত্য(ভাবে যুক্ত(। লোকবিশ্বাস অনুসৃত না হ'লে তেমন মানসিক প্রতিত্রি(য়ার সৃষ্টি হয় না, কিন্তু সংস্কার অনুসৃত না হ'লে একটি বিরূপ মানসিকতার সৃষ্টি হয়।'[৪] লোকবিশ্বাসকে কেউ আবার কুসংস্কার মনে করেন। এ ভাবনা সর্বত্র ঠিক নয়। বৈজ্ঞানিক পরী(া-নিরী(া কিংবা নৃতাত্ত্বিক অগ্রগতিতে প্রচলিত অনেক বিশ্বাস ভ্রান্ত প্রমাণিত হ'লেও তা যদি সযত্নে কার্যকরী ক'রে তোলা হয় তবে তা কু-সংস্কার বিবেচিত হ'তে পারে। কিন্তু যতদিন সংস্কারের মধ্যে ভ্রান্তি প্রমাণিত না হচ্ছে তা লোকবিশ্বাসের স্থায়ী দাবিদার।

চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য

লোকাচার, প্রথা ও লোকবিশ্বাসের প্রয়োগ

'চণ্ডিকামঙ্গল কাব্যে' জন্ম-বিবাহ-মৃত্যু সংত্র(ান্ত নানা লোকাচার, প্রথা, বিশ্বাসের কথা কবি উল্লেখ করেছেন। কালকেতুর জন্ম উপল(ে নিদয়াকে 'সাধ দেয়' ধর্মকেতু। মনে করা হয়, গর্ভবতী রমণীর গর্ভের শিশুর দৈহিক বিকাশ বা গঠন সাধভ(ণের সময়কালে পূর্ণতার পর্যায়ে আসে। তখন সন্তান-সম্ভবা মায়ের সুখাদ্য গ্রহণ কেবল নিজের প্রয়োজনে নয়, সন্তানের কথা মনে রেখেও। এ কথা মনে রেখে 'সাধভ(ণ' এর মতো লোকাচার পালন করা হ'য়ে থাকে। মুকুন্দরাম বলেছেন 'নয় মাসে নিদয়ার সাধ দেয় ব্যাধ।/নিদয়া ভাবিয়া কহে প্রভুরে বিষাদ।।' এ ধরণের দৃষ্টান্ত বিজয় গুপ্তের মনসামঙ্গলে 'সাধভাত সোনকা খাইল তখনি।।' মানিকরামের ধর্মমঙ্গলে 'সাধ দিল সুস্থ হেতু সুশস্ত বাসরে।।' ল(করা যাবে।

সাধভ(ণের পরে আসে সন্তান প্রসবের কাল। প্রসুতির জন্য থাকে সুনির্দিষ্ট 'আঁতুড় ঘর' কিংবা 'সূতিকা-ভবন'। সন্তানের আসন্ন বিপদ থেকে র(া করতে আঁতুড় ঘরে আগুন প্রজ্জ্বলিত করার রীতি আছে। কবি সে কথাও উল্লেখ করেছেন। 'পুত্র হৈল ধর্ম্মকেতু হরষিত মনে।/চাল ফাঁড়ি অগ্নি জ্বালে সূতিকা-ভবনে।।' শিশুর জন্মের প্রায় ছ'দিনের পর থেকে শু(হ'য়ে যায় নানা রকম আচার। ছ'দিনের কালে হয় যেটেরা, আট দিনে অষ্টকলাই, নয় দিনে 'নবনত্তা', ষষ্ঠীপূজা ইত্যাদি। কবি এ সকল বিষয়ের যথাযথ উপস্থাপন করেছেন। কাব্যে পাই

'তিন দিনে নিদয়ার সুপথ্যি পাচন।/ছয়দিনে যাটিয়ারা কৈল জাগরণ।।/অষ্টদিনে অষ্টকলাই কৈল ধর্ম্মকেতু।/নয়দিনে নবনত্তা কৈল শুভ হেতু।।/ ... ষষ্ঠীপূজা কৈল তার একত্রিশ দিবসে।।'

কালকেতুর 'নামকরণ' এর ক্ষেত্রে দেখা গেছে প্রথার অনুশীলন আছে, 'দৈবজ্ঞ আনিয়া নাম থুইল কালকেতু।' ছ'মাসে আছে অন্নপ্রাশনের উল্লেখ, 'ওদন করাল্য বলি দিয়া ছাগ মেষ।' ব্যাধসন্তান কালকেতুর শিক্ষার অধিকার নেই বলে হয়তো 'হাতে খড়ি'র মতো কোনো লোকাচারের উল্লেখ কবি রাখেননি। বিজয় গুপ্ত বা বৃন্দাবন দাসের কাব্যে 'হাতে খড়ি' উল্লেখ আছে। উপনয়নের ক্ষেত্রেও সেই একই প্রথার উল্লেখ অন্যান্য মঙ্গলকাব্যে পাই।

বিবাহ প্রসঙ্গে কবি প্রায় কোনো প্রথাকে অগ্রাহ্য করেননি। লোকাচরেরর কথাও উল্লেখ করেছেন। বিয়ের পশ্চাৎভূমিতে ঘটক ও ঘটক বিদায় নামক প্রথা ও লোকাচার থাকে। ঘটক সোমাই পণ্ডিতকে দিয়ে ফুল্লরার সঙ্গে কালকেতুর বিবাহ পাকাপাকি করা হয়েছে এবং শেষে সোমাই পণ্ডিতকে যথাযথ 'ঘটকালী' প্রদান করাও হয়েছে। 'কালকেতুর বিবাহের অনুবন্ধ' এ সোমাই পণ্ডিতকে ধর্ম্মকেতু বলেছেন

সোমাই পণ্ডিত সনে বসিয়া বিরলে।/চরণে ধরিয়া ধর্ম্মকেতু কিছু বলে।।...
পুত্রের বিবাহ হেতু করি অভিলাষ।/কিরাত নগরে কর কন্যার তল্লাস।।...
পণের নির্ণয় কৈল দ্বাদশ কাহন।/ঘটকালী পাবে ওঝা তুমি চারিপণ।।

সম্ভবত তখন কন্যাপণের দিন ছিল। পুঁযতান্ত্রিক ব্যবস্থা কর্তৃত্ব করায় আধুনিককালে বরপণ মাথা তুলেছে। পণ নেওয়ার যে প্রথা ছিল এ থেকে তা প্রতিপন্ন হয়। 'দ্বাদশকাহন' পণের কথা উল্লেখ থেকে কবিকঙ্কণ তৎকালীন প্রথাকে গ্রাহ্য করলেন।

'অধিবাস' দিয়ে বিবাহানুষ্ঠানের শুরু হয়। হিন্দু সংস্কারে যে কোনো অনুষ্ঠানের সূচনা অধিবাসের মধ্যে দিয়ে ঘটে। অধিবাস উপলক্ষ্যে একটি বরণডালাও সাজানো হয়। সেই ডালাতে রাখা হয় তামা, রূপা, সোনার ধাতুর পাশাপাশি, হরিদ্রা, চন্দন, ফল, ফুল মহী, দূর্বা, দান ইত্যাদি দ্রব্য। 'গৌরীর অধিবাস' অংশে মুকুন্দরাম এর বিস্তৃত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেছেন। ফুল্লরার অধিবাসের কথায় পাওয়া যায়, 'নিয়া অধিবাস ডালা কিরাত নগরে গেলা/ বন্ধু মেলি সোমাই ব্রাহ্মণ।' কাব্যে কবি সরাসরি গায়ে হলুদের কথা বলেননি, কিন্তু 'হরিদ্রাযুক্ত(' ধুতির কথা বলে তিনি প্রকারান্তরে গায়ে হলুদকে স্বীকার করলেন। চাঁদোয়া টাঙানো হয় বিয়ে বাড়ির প্রাঙ্গনে। কবি 'কালকেতুর বিবাহ উদ্যোগ' এ বলেছেন 'শুভ(ণে বান্ধিল ছান্দলা।/গোময়ে লেপিয়া মাটি আলিপনা পরিপাটি / চারিদিকে বন্ধুগণ মেলা।।'

এছাড়া নান্দীমুখ, বণিকখণ্ডে বর বরণ, দেবখণ্ডে সাতপাক, বাসর ঘর প্রভৃতি লোকাচারের কথা কবি উল্লেখ করেছেন। বণিকখণ্ডে লোকাচার, লোকবিশ্বাসের নানা কথা আছে। বিবাহে যে লোকবিশ্বাস কাজ করে বণিকখণ্ডে তার যথার্থ দৃষ্টান্ত আছে। স্বামী ধনপতি সদাগরকে বশ করতে খুল্লনার প্রচেষ্টাতে লোকবিশ্বাস ল(করা যায়। 'বণিকখণ্ড'-এ পাই

আনিল পুজাতি গাছ হাই হামলাতি।/কবরে তুলিয়া আনে কালিমা বিভাতি।
ইহা দরশনে তার বশ হবে পতি।/উলঙ্গ হইয়া আনে নিশাভাগ রাতি।।

'দান' সাধারণ প্রথা হ'লেও 'দ্বিজকে দান' করার মধ্যে বিশেষ একটা বিশ্বাস আছে। পূণ্য অর্জন। সোমাই পণ্ডিত পারিবারিক পুরোহিত হ'লেও 'ঘটকালী'র বাইরেও ব্রাহ্মণ হিসেবে তিনি 'দান' গ্রহণ করতেন এমন আভাস কাব্যে আছে। 'বন্ধক' প্রথার মাধ্যমে তাৎ(ণিক

আর্থিক দূরবস্থা থেকে উদ্ধার পাওয়ার রীতি মঙ্গলকাব্য রচনাকালেও ছিল। যদিও প্রথাটি বাঙালির দৈন্যদশার সঙ্গে সঙ্গে সমকালীন আর্থ-সামাজিক প্রে(তকে উন্মোচিত করে। মুকুন্দরামের কাব্য থেকেও 'বন্ধক' প্রথাটির কথা জানা যায়। চণ্ডী ত্রিশূল 'বন্ধক' দিয়ে 'তণ্ডুল' আনতে চেয়েছিলেন। 'হরগৌরীর কলহারম্ভ'এ উল্লেখ আছে

আজিকার মত যদি বান্ধা দেহ শূল।/তবে সে আনিতে পারি প্রভু হে তণ্ডুল।।

বলিদান একটি প্রাচীন প্রথা। নিষাদ ও কিরাত জাতির (Indo-Mongoloid) সংস্কৃতিতে এই প্রথার গভীর তাৎপর্য ছিল। আদিবাসী (দ্রাবিড়) গোষ্ঠীর প্রথা ত্র(মে আর্যীকৃত হয়েছে। হিন্দু শাক্ত(দেবীর উৎসবে 'বলিদান' যে প্রথায় পরিণত হয়েছে তা মুকুন্দরাম থেকে ভারতচন্দ্র প্রমুখের কাব্যে ল(করা যায়। অনুবাদিত মহাভারতে আছে, 'তারপর রাজবলি আনিয়া তখন।/ছাগ মেষ মহিষাদি দিলেক রাজন।।/' 'ফুল্লরার বারমাস্যা'য় বলিদানের ঐতিহ্যকে মান্য ক'রে বলা হয়েছে 'আশ্বিনে অম্বিকা পূজা করে জনে জনে।/ছাগল মহিষে মেষ দিয়া বলিদানে।।'

মধ্যযুগ থেকে কেবল নয়, সুদূর প্রাচীনকাল থেকে 'বহুবিবাহে'র প্রচলন প্রথার মর্যাদায় ভূষিত। স্ত্রী বন্ধ্যা হ'লে বহুবিবাহের একটা সঙ্গত কারণ থাকে কিন্তু সামন্ততান্ত্রিক আদর্শের অনুবর্তী হ'য়ে ধনাঢ্যরা বহুবিবাহে উন্মত্ত হ'লে তখন তা বিলাস-ব্যাসনের সামিল নিশ্চয়। কুলীনের একাধিক বিবাহ একটি ঐতিহ্যময় প্রথা। এমন ঘটনা তৎকালীন সমাজে কুলীনের আভিজাত্যে পরিণত হয়েছিল। মহাভারত, রামায়ণে কারো কারো একাধিক বিয়ে হয়েছে। দশরথ, পাণ্ডুরা অ(ম পু(ষ অথচ একাধিক বিয়ে করেছেন। 'সন্তানের জন্ম'কে প্রাধান্য দিলে স্ত্রীলোকদের প(একাধিক বিয়ে করা তবে উচিত ছিল অথচ এসব (ত্রে তা হয়নি। এখানে প্রথা পু(ষতন্ত্রের অন্যায়-অযৌক্তি(ক দাস হ'য়ে পড়েছে। মালাধর বসু (ছয় বিভা করি রঙ্গি বসে বনমালি।'), দ্বিজমাধব ('বিদায় হইতে গেল সতীনের পাশ।') প্রমুখের কাব্যে বহুবিবাহের কথা আছে। মুকুন্দরামের কাব্যে দেবখণ্ড-নরখণ্ডে সতীনের প্রসঙ্গ বারংবার এসেছে। সেন রাজত্বের পরেই সতীন সমস্যা ভয়াবহ রূপ নিয়েছিল আর হয়তো সে কারণেই এর উল্লেখ এত বেশি। খুল্লনা, লহনা সহোদরা হ'য়েও সতীন। ফুল্লরা ছদ্মবেশী চণ্ডীকেও সতীন ভেবেছিল। আধুনিক ভারতীয় সংবিধানে আইন ক'রে বহুবিবাহ প্রথা তুলে দেওয়া হয়েছে। প্রচীন বা মধ্যযুগীয় প্রথা বা রীতি-নীতিবিরোধী ও আইন শাস্ত্রগত ভাবেও ঐতিহ্যের পরিপন্থী। তবু বিবাহ বিচ্ছেদের মাধ্যমে বহুবিবাহ প্রথা চলেছে। মধ্যযুগীয় সমাজ ব্যবস্থাতে সপত্নীর যে সমস্যার কথা কাব্যে পাই তা থেকে বহুবিবাহ প্রথার দৃষ্টান্ত পেতে পারি। বহুবিবাহের সাথে বাল্য বিবাহের (গৌরীদান প্রথা) কথা সমোচ্চারিত। ফুল্লরার বিয়েই তো বালিকা বয়সে হয়েছিল। অন্যদিকে বণিকখণ্ডে বাল্য বিবাহের কথা আছে।

সবিশেষ, জাতিভেদ প্রথা। হিন্দু সমাজের ভিত্তিতে 'জাতিভেদ' একটি অপরিহার্য দিক। শাস্ত্রানুসারে (বেদ, স্মৃতি, সংহিতা প্রভৃতি) লোকজীবনে এই বিশ্বাস প্রতিপন্ন 'জাতিভেদ' ঐশ্বরিক। প্রাচীন মধ্যযুগীয় লোকসমাজ এ বিশ্বাসের অধীন। কাব্যে কবি তার স্পষ্ট চিহ্(রেখেছেন। প্রায় সকল মঙ্গলকাব্যের কবিগণ এ বিষয়ে বিশেষ অবগত ছিলেন এবং কাব্যে

তা প্রকাশ করেছেন। গুজরাট নগরের প্রজার বর্ণনায় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, শূদ্রের কথা কবি উল্লেখ করেছেন। কালকেতু নিজেকে যে 'নীচু জাতি' বলে পরিচয় দিয়েছে তা জাতিভেদ প্রথার ফলশ্রুতি। জাতিভেদে দেখা যায় ব্রাহ্মণের সন্তান ব্রাহ্মণ হয়, শূদ্রের সন্তান শূদ্র। এই প্রথাকে মান্য করেই হয়তো কালকেতু উচ্চারণ করতে সমর্থ হ'য়েছিল, 'নীচ কি উত্তম হবে পাইলে বহুধন।' কবি সমাজ-সংস্কৃতি সচেতন। বাংলার লোকজীবনের সরস বৃত্তান্ত অনুশীলন ক'রে তাঁর কাব্যের পরিসর পরিব্যাপ্ত হয়েছে। ফলত লোকাচার, প্রথা কিংবা সংস্কারের আস্বাদন ব্যতীত 'চণ্ডিকামঙ্গল কাব্য'-র কাব্যরস লাভ অসম্পূর্ণ থেকে যায়। কবি গোষ্ঠীবদ্ধ সমাজ জীবন কাব্যে উপস্থাপিত করতে গিয়ে লোকজীবনের ঐতিহ্যকে কাব্যের পরতে পরতে স্পষ্ট ক'রে তুলেছেন।

তথ্যসূত্র

১। 'আর্য-ব্রাহ্মণ বা বৌদ্ধ, জৈন ইত্যাদি সম্প্রদায়ের ধর্মকর্ম শ্রাদ্ধ, বিবাহ, জন্ম, মৃত্যু প্রভৃতি সংক্র(ান্ত বিশ্বাস, সংস্কার ও আচার অনুষ্ঠান, নানা দেবদেবীর রূপকল্পনা, আহার, বিহারের ছোঁয়াছুঁয়ি অনেক কিছু আমরা সেই আদিবাসীদের কাছে থেকে আত্মস্যাৎ করিয়াছি। বিশেষভাবে হিন্দুর জন্মান্তরবাদ, পরলোক সম্বন্ধে ধারণা, প্রেততত্ত্ব, পিতৃ তর্পণ, পিণ্ডদান, শ্রাদ্ধাদি সংক্র(ান্ত অনেক অনুষ্ঠান, আভ্যুদায়িক শ্রাদ্ধ ইত্যাদি সমস্তই আমাদের প্রতিবেশির এবং আমাদের অনেকের রক্ত(স্রোতে বহমান সেই আদিবাসী রক্তে(র দান।' বাঙালির ইতিহাস, নীহররঞ্জন রায়, দে'জ, কলকাতা।

২। 'Encyclopaedia of the Social Science' vol. 3, p. 658

৩। Follkways, NewYork , 1934, p.4

৪। বঙ্গীয় লোকসংস্কৃতি কোষ , সম্পা ব(কুমার চক্র(বর্তী, অ.বু. ডিস্টি., ১৯৯৫, পৃ ৩৯১

মুর্শিদাবাদের পরিযায়ী পাখি

লক্ষ্মী নারায়ণ চক্রবর্তী*

মুর্শিদাবাদ জেলায় জলঙ্গী, ভৈরবী, ভাগীরথী, ব্রাহ্মণী, কুয়ো ও দ্বারকা নদীর ধারে ধারে অজস্র গাছ গাছালি এক অপূর্ব সমাবেশ রচনা করেছে, ঠিক যেন 'ছায়াসুনিবিড় শান্তির নীড়'। অপরদিকে এ জেলার আম বাগান, নারিকেল ও কাঁঠাল বৃক্ষের সমারোহ। তাই এই জেলা প্রাকৃতিক সম্পদে অতুলনীয়। আর এসব বৃক্ষরাজিতে সচরাচর পরিদৃষ্ট হয় বিচিত্র রং বেরং-এর পাখি। উল্লেখযোগ্য পাখিরা হল — টিয়া, বসন্তবৌরী, গোকুলকেষ্ট, চন্দনা, দোয়েল, শ্যামা, ফিঙে, শালিক, বুলবুলি, কোকিল, সোনাবৌ, শঙ্খচিল, মাছরাঙা ও হরবোলা ইত্যাদি।

বসতবাড়ির আনাচে-কানাচে দেখা যায় পায়রা, ঘুঘু, লক্ষ্মীপেঁচা, চড়াই, পোড়ো বাড়িতে থাকে কালপেঁচা। জলাশয়ের ধারে ঘুরে বেড়ায় বক, পানকৌড়ি, ডাহুক, বাজ আর মাঠে মাঠে চড়ে বেড়ায় শামুক, মানিকজোড় ও গোডহরে শকুনের দল। এসব প্রজাতির পাখি ভারতবর্ষের বুকে প্রায় নয়শত। এরা স্থায়ীভাবে বাস করে ভারতের মাটিতে। আনুমানিক তিনশত পরিযায়ী পাখি ভারতে আতিথ্য গ্রহণ করে। তন্মধ্যে মুর্শিদাবাদ জেলায় পরিযায়ী পাখির সংখ্যা সম্ভবত শতাধিক। প্রতিবছরই একটা নির্দিষ্ট মাসে দেশান্তরিত পাখিদের আগমন হয় মুর্শিদাবাদে। অক্টোবর মাস থেকে এদের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয়। মার্চ মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহ পর্যন্ত এদের অবস্থিতি। তারপর এরা দলবদ্ধভাবে উড়ে যায় স্বদেশ মুখে। সাধারণত পরিযায়ী পাখিরা বেছে নেয় বড়ো বড়ো হ্রদসদৃশ জলাভূমিকে। আবার হ্রদের পরিবর্তে জেলার বিভিন্ন বিলকেই আশ্রয়স্থল মনে করে। বহরমপুর সন্নিকটে ভাণ্ডারদহ বিল, তেলকর বিল, ডোমকল থানার দুধসরোবর বিল, জঙ্গীপুরের নিকট অহিরণ বিল, ফারাক্কাবাঁধের জলাধারে, বালল বিলে, সাকুড়ে বিল ও পাটন বিলে ও আখড়াইয়া দিঘিতে এরা শোভা বর্ধন করে। পরিযায়ী পাখি শ্যাওলা, পদ্মফুল এবং শাপলা ফুলে শোভিত জলাশয়কেই বেশি পছন্দ করে। সেখানে আহারের প্রাচুর্য অধিকা, তাই ওইসব জলাভূমি পরিযায়ী পাখিদের নিরাপদ আশ্রয়স্থল। এদের আগমনে ঐসব জলাশয়ের শোভা অপূর্ব হয়।

অধিকাংশ দর্শক এ দৃশ্য দেখে মোহিত হয়ে পড়ে। এসব পাখিরা তিনটি কারণে পরিযায়ী হয়; যেমন- (এক) বিরূদ্ধজনিত প্রাকৃতিক পরিবেশ, (দুই) খাদ্যের অপ্রাচুর্যতা, (তিন) প্রজননের তীব্র চাহিদা। বছরের পর বছর তারা পরিযানের সময় গত বছরের নির্দিষ্ট স্থানে হাজির হয়। সূর্যের আলো, আকাশের তারা ও পাহাড় পর্বত লক্ষ করে সঠিক স্থানে উপস্থিত হয়। আবার অনেক পরিযায়ী পাখি পথভ্রষ্ট হয়ে অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করে থাকে। এসব পরিযায়ী পাখিরা দলবদ্ধভাবে উড়ে চলে এবং এক নাগাড়ে ১০ ঘন্টা পথ অতিক্রম করতে সক্ষম হয়। একটানা ৫০০ মাইল

---

* শিশু সাহিত্যিক ।

উড়তেও পারে বলে জানা গেছে। এ পরিযানের বিষয়ে সবার চেয়ে যে পাখি অগ্রণী তার নাম আরটিকান, কেননা এরা প্রচণ্ড শীতকে ঝেড়ে ফেলতে এক মেরু থেকে অপর মেরুতে পাড়ি জমায়। এসব পরিযায়ী পাখিরা সাধারণত আসে বিহারের ছোটনাগপুর ও সাঁওতাল পরগনা থেকে। একদল আসে হিমালয় সন্নিহিত পার্বত্য অঞ্চল থেকে। আবার কিছু আসে কৈলাস পর্বত সন্নিহিত মানস সরোবর হতে। এছাড়াও সুদূর সাইবেরিয়া ও তৎসংলগ্ন অঞ্চল থেকেও।

মুর্শিদাবাদের পক্ষী শিকারীদের কাছ থেকে যে সব পরিযায়ী পাখিদের তালিকা পাওয়া যায় সেইসব পাখিদের অন্যতম নাম হল বালিহাঁস সরাল, কালকুচ, নড়াইল, কটকধারা, মিটুয়া, বড়িহাঁস, সেভেলার, নীলশির, গিরিয়া, শিলাদামা প্রভৃতি। এসব পরিযায়ী পাখিদের মাংস অতিশয় তৈলাক্ত ও সুস্বাদু। সরাল পরিযায়ীদের ওড়ার সময় ছন্দময় একটা শব্দ হয় যাকে ইংরাজীতে বলা হয় 'লার্জ হুইসিলিং টিল'।

স্বভাবজাত পরিযায়ী পাখি ব্যতীত কিছু পাখি প্রতিকূল পরিস্থিতিতে পরিযায়ী হয়ে থাকে। পরবর্তী পর্যায়ে পরিস্থিতি অনুকূল হলে তারা আপন আবাস ভূমিতে ফিরে আসে। পরিযায়ী পাখিদের মধ্যে তরুণ পাখিদের দেশান্তরিত হওয়ার নেশা প্রবল। তারা বয়স্ক পাখিদের আগেই বেরিয়ে পড়ে। এর মূলে রয়েছে যৌন আকর্ষণ ও প্রজনন।

আপাত দৃষ্টিতে মনে হয় মুর্শিদাবাদ জেলার পক্ষীকুল আজ সত্যিকার বিপন্ন। কেননা পরিবেশের ক্রমাবনতি অনেকাংশে দায়ী বলে মনে হয়। ক্রমবর্ধমান শহর তৈরি, বৃক্ষছেদন, কৃষিক্ষেত্রে রাসায়নিক কীটনাশক ঔষধের ব্যবহার এদের বিচরণ ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতার সৃষ্টি হওয়ার দরুণ তারা আজ অসহায় বোধ করছে। এছাড়া জলাভূমির কোনো সংস্কার নেই। যার ফলে জলাভূমি শুষ্কপ্রায়। কৃষিকাজে ব্যবহৃত হচ্ছে এসব জলাশয়ের জল। পাখিদের আশ্রয়স্থলটুকুও হারিয়ে যেতে বসেছে। তাই পরিযায়ী পাখির দল আজ আর আসতে চাইছে না। পরিযায়ী পাখিদের সবচেয়ে বড়ো শত্রু হচ্ছে এক ধরনের লোভী শিকারীর দল। এরা সময়ে অসময়ে উপস্থিত হয়ে বন্দুক দিয়ে পরিযায়ী পাখিদের হত্যা করছে অবলীলাক্রমে। তাই পরিযায়ী পাখিরা এদের দৌরাত্মে দিশেহারা হয়ে পড়ছে। বর্তমানে পক্ষীকূলের আগমনে ভাঁটা পড়ছে। তাই সরকারের অগ্রণী ভূমিকা ও জনসাধারণের সহযোগিতা বিশেষ জরুরি।

অরুণ মিত্রের ‘ভাঙনের মাটি’ : একটি পর্যালোচনা

সেখ রফিকুল হোসেন*

প্রায়ই আমি রাত্রিকে বলি; শোনো,
আমাকে নিয়ে তুমি যে-স্বপ্ন বোনো
তার কিন্তু সত্যিই কোনো মানে নেই
কেননা আমার শান্ত ঘরের কাছেই
সমস্ত সময় আদরের মাটির ভাঙন।
তবে এটাও ঠিক মাঠঘাট যখন ভরে
সোনার রোদে আর পাতারা ফিসফিস করে,
যখন ঘরের চালে রিমঝিম ঝরে
আকাশ-ছাওয়া মেঘ নিয়ে শ্রাবণ
বা যখন মেয়েদের হাসি হাওয়ার পরতে
চূর্ণ চূর্ণ আর সেই বিন্দুগুলো শীতল স্রোতে
মেলে আমার মুখের ওপর, আমি তখন
মায়াবী চক্করে পড়ি, দুদণ্ডের কুহক-মাতন,
প্রজাপতিদের নিয়ে ছুটে যেতে চাই নরম
গোধূলির দিকে, এবং ঠিক তখনই
পাড় ভাঙার শব্দ। আমার প্রিয় মাটির ধমনী
এইভাবে ছেঁড়ে। একে কি বাস্তবিক বাঁচা বলে,
রাত্রি? তাই বুঝি আমায় বাঁচাতে চাও নানা ছলে।
কিন্তু আমি তো হাড়মজ্জায় অনুভব করি আমার নিঃশ্বাস
ভাঙনের কাছে সঁপে-দেওয়া, ভাঙনের ধারেই আমার বাস।

এই কবিতাটির নামেই অরুণ মিত্র ১৯৯৮-এর শুরুতে কলিকাতা পুস্তকমেলায় দে’জ পাবলিশিং-এর তরফে প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থটির নাম রেখেছিলেন ‘ভাঙনের মাটি’। প্রথম থেকেই তাঁর কবিতায় মাটি কখনো প্রতীক হয়ে, কখনো অনুষঙ্গ হিসেবে আবার কখনো বা বর্ণনীয় বিষয় হিসেবেই বারবার ব্যবহৃত হয়েছে। প্রান্তরেখা কাব্যগ্রন্থের ‘দোটানা’ এবং ‘মাটির কবর’ শিরোনামাঙ্কিত কবিতা দুটিতে মাটি প্রসঙ্গটিকে অসামান্য দক্ষতায় প্রয়োগ করেছিলেন তিনি।

---

* অধ্যাপক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রান্তরেখা থেকে কেন্দ্র তথা উৎসের দিকে যত এগোতে থাকেন তিনি, জীবনের গভীরতর প্রবাহের ঘনিষ্ঠ তাপ ততই তাঁকে সাজানো গোছানো কৃত্রিম মঞ্চ থেকে নামিয়ে শুদ্ধ মাটিতে প্রোথিত করে দেয়। মাটিতে দৃঢ়ভাবে পা রেখেই 'এক প্রখর সৌহার্দ্যের অবয়বে' কবি নিজেকে জাগিয়ে রাখেন। আর জীবনের সঙ্গে তথা মাটির সঙ্গে এই ঘনিষ্ঠ প্রখর সৌহার্দ্য-ই তো তাঁর সূর্যডোবার শেষ সমুদ্রেও ভোরবেলার যাত্রার আয়োজন ধ্বনিত করে তোলে। চারপাশের সমূহ বিপর্যয় এবং বিপন্নতার মাঝখানেও কবি তাঁর ইতিবাচক জীবনবোধকে হারিয়ে যেতে দেন না। এই ইতিবাচকতাকে সঙ্গী করেই কবি শূন্যতার বিরুদ্ধে যাত্রা শুরু করে খুঁজতে খুঁজতে গিয়ে হাজির হন কামিলার বিক্ষুব্ধ সময়ের ভিতরে। একটা 'ধস ভাঙা' জীবনের অমৃত-গরল ছেনে-মেখে, একটা বানভাসির মুখে দাঁড়িয়ে কবি আবার নতুন করে শুরু করার কথা ভাবেন, টুনি কথার ঘেরাও থেকে গুঞ্জন জাগিয়ে তুলতে চান, অনর্থক ওড়াউড়িতে না গিয়ে সেঁধিয়ে যেতে চান মাটির গভীরে। কিন্তু আঁকড়ে ধরতে চাওয়া মাটিই ক্রমশ আলগা হয়ে যেতে থাকে; বিশ্বাসের, ভালোবাসার আর সৌহার্দ্যের উত্তাপ হারিয়ে ঝুর ঝুর করে ভেঙে পড়তে থাকে তাঁর চারপাশে। সেই ভাঙনের মাঝখানে দাঁড়িয়েই কবি তাঁর আত্মপ্রবঞ্চনা মুক্ত সততা নিয়ে অস্তিত্বের দিনলিপি নির্মাণ করে চলেন ক্ষান্তহীনভাবেই।

অরুণ মিত্রের ছয় দশক ব্যপ্ত সাহিত্যিক জীবনের প্রথম তিন দশকে কাব্যগ্রন্থের সংখ্যা চারটি এবং সেগুলিতে মোট ১৭৯-টি কবিতা রয়েছে। অন্যদিকে শেষ তিন দশকে, যখন তিনি কলকাতায় ফিরে এসেছেন তখন ফারসি কবিতার প্রচুর অনুবাদ ও অজস্র গদ্য রচনার পাশাপাশি মোট ৫৪৪-টি কবিতা নিয়ে এগারোটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। এই এগারোটির মধ্যে আবার জীবনের শেষ দশকে প্রাজ্ঞ কবির কলম থেকে বেরিয়েছে সাতটি কাব্যগ্রন্থের ৩৩০-টি কবিতা। নিজের আশি থেকে নব্বই বছর বয়সে কবিতা নির্মাণে এরকম অফুরান থাকতে পারা সম্ভবত নজিরবিহীন।

কবির মৃত্যুর দেড় বছর আগে প্রকাশিত 'ভাঙনের মাটি' কাব্যগ্রন্থের তৃতীয় কবিতা এটি। বরাবরের মতো এই কাব্যগ্রন্থের ক্ষেত্রেও অরুণ মিত্র কবিতাগুলির হয়ে ওঠার দিনক্ষণ জানাননি, সেটা একদিক থেকে ভালোই। রচনার নির্দিষ্ট দিনকাল জানালে কবিতাটির পাঠ তথা ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের ক্ষেত্রে ওই নির্দিষ্ট তারিখটিকে ঘিরে কবির ব্যক্তিগত জীবন এবং বৃহত্তর সামাজিক রাষ্ট্রিক জীবনের ঘটনাবলির সঙ্গে কবিতাটির একটা সংযোগ খোঁজার চেষ্টা করা হয়, যা অনেক সময়েই পাঠককে ভুল পথে নিয়ে যেতে পারে বলেই মনে হয়। কোনো একটি তারিখের সুনির্দিষ্ট কোনো ঘটনা নয়—বরং দীর্ঘকাল ধরে ঘটে চলা ছোটো-বড়ো, ব্যক্তিক-পারিবারিক, সামাজিক-রাষ্ট্রিক, গোপনীয়-প্রকাশ্য, দৈহিক-মানসিক অভিজ্ঞতার সংমিশ্রণেই কবির অস্তিত্ব নির্মিত হয়। একটি কবিতার মধ্যে কবির সেই সামূহিক জটিল অস্তিত্বের মৌহূর্তিক উন্মোচন ঘটলেও সেই মুহূর্ত কখনোই ঘটমান বর্তমানে সীমিত থাকে না, তার শিকড় যেমন অতীতে

প্রোথিত থাকে তেমনি তার অভিমুখ প্রসারিত থাকে ভবিষ্যতে। ১৯৯৭ খ্রিস্টাব্দে 'ওড়াউড়িতে নয়' কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের পর থেকে ১৯৯৮-এর জানুয়ারির মধ্যে কোনো এক সময় কবিতাটি লেখা—কবিতাটি পাঠের ক্ষেত্রে এই তথ্যটুকুই যথেষ্ট। এই কাব্যগ্রন্থের ৫২-টি কবিতা যেমন, তেমনি আগে পরের অন্যান্য কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিতেও, একটা 'উচ্ছন্ন সময়ের' বিপন্নতা, অসহায়ত্বই প্রকাশ পেয়েছে।

কুড়িটি চরণের এই কবিতাটি পড়তে শুরু করলে মনে হয় কবি যেন রাত্রির সঙ্গে তাঁর কথাবার্তা, ভাববিনিময় তথা সম্পর্কের একটা বর্ণনা দিতে চলেছেন। কিন্তু অনেকটা এগিয়ে যাওয়ার পর বুঝতে পারি এটা নিছক বিবরণ নয়—বরং রাত্রির সঙ্গে কবির একতরফা আলাপ। গোটা কবিতাটি শেষ করে আবার সূচনায় ফিরে এলে প্রথম পাঠে উপেক্ষিত 'প্রায়ই' শব্দটি জানিয়ে দেয় এই আলাপ যেমন এককালীন নয় তেমনি একতরফাও নয়—সময়ের একটা বড়ো মাত্রায় প্রায়শই রাত্রির সঙ্গে কবির এই আলাপ চলেছে। আলাপ কী নিয়ে? কবিকে ঘিরে রাত্রি যে-সব স্বপ্ন বোনে তা যে কতটা এবং কেন অর্থহীন, অযৌক্তিক এবং বাস্তবের সঙ্গে সঙ্গতিহীন তা রাত্রিকে জানাতে চান কবি—জানাতে চান তাঁর অস্তিত্বের অস্থিমজ্জায় ভাঙনের টান কীভাবে থাবা বসিয়েছে।

রাত্রির সঙ্গে কথোপকথন সাধারণ কবিকল্পনায় একটুও অস্বাভাবিক নয়। দিবসের প্রকাশ্য সক্রিয় বাস্তবতায় প্রখর সজাগ চৈতন্যের বিপরীতে রাত্রি তার স্তিমিত শান্ত অপ্রকাশ্যতার ঘেরাটোপে আমাদের নিজের সঙ্গে নিজের বোঝাপড়ার সুযোগ করে দেয়—প্রকাশ্য আমি-র সঙ্গে অপ্রকাশ্য আমি-র, কেজো সত্তার সঙ্গে চিন্তাশীল ভাবুক সত্তার সংযোগের সেতু বানিয়ে দেয় রাত্রি। কবির ভিতরে যে আদর্শায়িত পূর্ণতাভিমুখী সত্তাটি রয়েছে, আসলে সেই সত্তাই হার না মানার, ভেঙে না পড়ার স্বপ্ন দেখে, অপ্রকট সেই সত্তাকেই কবি রাত্রির আড়ালে রাখতে চেয়েছেন। রাত্রি সার্থকতা, ইতিবাচকতার যে স্বপ্ন বোনে তার অর্থময়তার ন্যূনতম সম্ভাবনাকেও খারিজ করতে চান কবি। তাঁর যুক্তি 'কেননা আমার শান্ত ঘরের কাছেই / সমস্ত সময় আদরের মাটির ভাঙন।'

ঘর যখন শান্ত অর্থাৎ বিক্ষোভহীন, অচঞ্চল, ঘর কিংবা ঘরের কাছেই যখন বিপদের আশঙ্কা কেউ করছে না, বিপর্যয়ের বার্তা সোচ্চারে ঘোষিত হচ্ছে না কোথাও; তখন নিরবিচ্ছিন্নভাবে সমস্ত সময় ধরে ভাঙনের প্রক্রিয়া চলছে। 'আদরের মাটি' বলতে কবি এখানে এটাই বোঝাতে চান যে, মাটি তথা জীবনের সঙ্গে কবির নিবিড় আত্মিক সম্পর্ক এখনো অটুট এবং মাটির প্রতি কবির আত্মজনসুলভ মমত্বের কারণে ভাঙনের বেদনা অনেক মর্মস্পর্শী ও গভীরমূল হয়ে উঠতে পেরেছে।

আপাত শান্তিকল্যাণের মধ্যেই এমন ভাঙন তথা রক্তক্ষরণের মতো বিষণ্ণতার কথা জানানোর পর কবি রাত্রিকে মনে করিয়ে দেন যে দীর্ঘকাল ধরে এমন নিরবিচ্ছিন্ন ভাঙনের মাঝখানে

থেকেও তিনি মানুষ ও প্রকৃতির প্রতি তাঁর সংবেদনশীলতা এবং উন্মুখতাকে হারিয়ে ফেলেননি। 'মাঠঘাট যখন ভরে / সোনার রোদে আর পাতারা ফিসফিস করে', সেই পরিপূর্ণ রৌদ্রকরোজ্জ্বল এবং বাঙ্ময় শরৎ অথবা বসন্তে কিংবা সঘন নিবিড় বরষায়, 'যখন ঘরের চালে রিমঝিম ঝরে / আকাশ-ছাওয়া মেঘ নিয়ে শ্রাবণ' অথবা যখন মেয়েদের মহার্ঘ হাসির ছিন্ন হীরককণিকাগুলি শীতল স্রোতে কবির আগুন ঝড়ে ধ্বসা ভাঙা মুখের ওপর আছড়ে পড়ে, তখন দু'দণ্ডের জন্য ভাঙনের কথা ভুলে যান কবি :

আমি তখন
মায়াবী চক্করে পড়ি, দু'দণ্ডের কুহক-মাতন,
প্রজাপতিদের নিয়ে ছুটে যেতে চাই নরম
গোধূলির দিকে, ...।

প্রকৃতির ও মানুষের জীবনপ্রবাহের এমন অনাবিল ঐশ্বর্যের মুখোমুখি হতে তার কুহক তথা মোহিনী মায়ার প্রভাবে কবি যখন চারপাশের বিপর্যয় বা ভাঙনের কথা দু'দণ্ডের জন্য ভুলে তাঁর সৃজনশীল সত্তা নিয়ে রহস্যময় নরম গোধূলির দিকে এগিয়ে যেতে চান, 'ঠিক তখনই' দু'দণ্ডের কুহক-মাতন সদৃশ মায়াবী চক্কর খান খান হয়ে আছড়ে পড়ে 'পাড় ভাঙার শব্দ'। 'ঠিক তখনই' যেমন সমাপতনকে তেমনি আকস্মিকতাকেও ইঙ্গিত করে। আবার সমাপতন আর আকস্মিকতা একসাথে মিলে অমোঘ নিয়তির মতো অনিবার্যতাকে ব্যঞ্জিত করে। পাড় ভাঙাটা, কবির প্রিয় মাটির ধমনী ছিন্ন হওয়াটা যেন অনিবার্য এবং এইভাবে অনিবারণীয়ভাবে ছিঁড়তেই থাকবে। সারা শরীরের রক্ত বহন করে নিয়ে যায় যে ধমনী, সেই প্রাণরসবাহ যদি ছিন্ন হয়ে পড়ে তাহলে দেহের দূরবর্তী অংশগুলি ক্রমশ শিথিল ও পঙ্গু হতে থাকে। মাটি অর্থাৎ সমাজদেহের ধমনী যদি ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে সমাজ শীর্ণ এবং গতিহীন হতে থাকবে। অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং বিশেষত সাংস্কৃতিক দিক থেকে প্রতিদিনের এই বিপর্যয় এবং ভাঙনের মধ্যে বেঁচে থাকা যে প্রকৃত বাঁচা নয় সেটা অনুভব করেই যেন রাত্রি তার শান্ত স্তব্ধতার ভিতরে আত্মমগ্ন হওয়ার সুযোগ করে দেয়, ভাঙন-প্রতিরোধী 'শিকড়'-এর সন্ধান দিয়ে বাঁচার নতুন রাস্তা খুঁজে দেওয়ার চেষ্টা করে। কিন্তু এই চেষ্টা যে ছলনার নামান্তর তা কবির কাছে স্পষ্ট, কারণ কবি জানেন : 'অনিবার্য ভাঙনের হাত থেকে নিষ্কৃতি নেই : আমি তো হাড়মজ্জায় অনুভব করি আমার নিঃশ্বাস ভাঙনের কাছে সঁপে-দেওয়া, ভাঙনের ধারেই আমার বাস।'

নব্বুই বছরের দোরগোড়ায় পৌঁছে, মৃত্যুর মাত্র দেড়-দুবছর আগে কবি অরুণ মিত্র-র এই উচ্চারণে মনুষ্যগত তথা সমাজগত ভাঙনের বাস্তবতাকে ছাপিয়ে কবির ব্যক্তিগত মৃত্যুবোধের নিষ্করুণ অসহায়ত্বকে প্রকাশ পেতে দেখি। কোনও ছলনা দিয়েই নিজেকে আর প্রবোধ দেওয়া যায় না; নিঃশ্বাস তো আসলে ক্ষয় এবং প্রতিটি নিঃশ্বাসপাতের মধ্য দিয়ে অনিবার্যভাবেই একটু একটু করে চূড়ান্ত ক্ষয়, তা ভাঙন তথা মৃত্যুর দিকে এগিয়ে যাওয়া।

স্তবক-ছেদহীন অসম কুড়িটি চরণে বিন্যস্ত কবিতাটিতে মোট ছয়টি বাক্য রয়েছে। প্রথম বাক্যটি কবিতার প্রথম পাঁচ পংক্তি জুড়ে বিন্যস্ত। দ্বিতীয় বাক্যটি কবিতাটির ষষ্ঠ চরণ থেকে ষোড়শ চরণের মধ্যভাগ পর্যন্ত মোট সাড়ে দশটি চরণে ব্যাপ্তি পেয়েছে। পরের তিনটি বাক্য খুব সংক্ষিপ্ত এবং সূচিমুখ তীক্ষ্ণতা প্রাপ্ত। শেষ বাক্যটি কবিতার শেষ দুটি পংক্তি জুড়ে বিন্যস্ত এবং পূর্ববর্তী আঠারোটি চরণে বিন্যস্ত পাঁচটি বাক্যের সমূহ কথামালার উপর একটা আচ্ছাদনস্বরূপ হয়ে উঠেছে।

কথ্যভঙ্গির সাবলীল বিস্তারে কবিতাটির যে-দেহরূপ তৈরি হয়ে উঠেছে তাতে চরণ থেকে চরণে ভাবের গদ্যময় প্রবাহে বাড়তি মাত্রা বা কাব্যিকতা তৈরি করেছে চরণান্তিক মিল। প্রথম চারটি চরণে কক খখ এবং ষষ্ঠ-সপ্তম-অষ্টম চরণে গগগ মিল বিন্যস করে কবিতার পঞ্চম এবং নবম পংক্তির অসামান্য একটি মিল তৈরি করেছেন। এই মিল যেমন কবিতার প্রথম বাক্যের সঙ্গে দ্বিতীয় বাক্যের নির্মাণ-উপাদানগত সম্পর্কের ক্ষেত্র তৈরি করে দেয় তেমনি ভাবগত ক্ষেত্রেও একটি সংযোগের সেতু রচনা করে দেয়। (মাটির) ভাঙন-এর সঙ্গে শ্রাবণ-এর মিল তৈরি করে নদীমার্তৃক বাংলাদেশে এদের সম্পর্কের অনুসঙ্গটাকে আমরা স্পর্শ করতে পারি।

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' : প্রান্তিক-জনজাতির জীবনস্বরূপ

খোকন কুমার বাগ*

ভূমিকা

প্রাচীন সাহিত্য ধর্মাশ্রয়ী। আদি-মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে তো দেবতাদেরই আধিপত্য। কিন্তু সাহিত্য কেবল যদি ধর্মের কথা-ই বলত, তবে সামাজিক পরিবর্তনের সাথে সাথে তার তাৎপর্য মূল্যহীন হয়ে যেত। বাংলা সাহিত্যে দেবতাদের অন্তরালে মানব জীবনরসের সন্ধান পাওয়া যায়—এ সত্য আজ সর্বজনগ্রাহ্য। ভারতের প্রাচীন তিন হিন্দু দেবতা ব্রহ্মা-বিষ্ণু-শিব। তবে বাংলা সাহিত্যে ব্রহ্মার তেমন অস্তিত্ব নেই। মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে বিষ্ণুর রূপান্তর কৃষ্ণ এবং শিব সমান্তরাল ধারায় প্রভাব বিস্তার করে আছে। সামাজিক আভিজাত্য ও প্রকৃতিগত দিক থেকে এই দুই দেবতার অবস্থানগত বৈপরীত্য লক্ষণীয়। আসলে এই দুই দেবতা সমাজের দুই ভিন্নধারার পরিচয়বাহক। বাংলা মঙ্গলকাব্যে শিব মূলত বাংলার প্রান্তজনের প্রতিনিধি। আমাদের আলোচ্য রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যটিতে বাংলার তথাকথিত দরিদ্র শ্রেণির জীবনযাত্রার পরিচয় যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দেখা যায় সমকালীন বাঙালি প্রান্তজনের জীবন-ছবি। সেখানে শিব উচ্চবর্ণের 'মানুষ' হয়েও কখন যেন প্রান্তজনের সঙ্গে একাকার হয়ে গেছেন। বর্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য হল, সমকালীন সামাজিক প্রেক্ষাপটে রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' কাব্যের শিব চরিত্রের নিরিখে উক্ত জীবন-ছবির পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণ।

প্রাক্-বাংলা সাহিত্যে শিব: প্রান্তিক জীবনের এক ঝলক

মানুষের জীবন নিয়েই সাহিত্য। যুগে যুগে দেব নির্ভর সাহিত্যেও আমরা মানুষকেই দেখে এসেছি— সে বেদ-উপনিষদ্‌ই হোক, বা রামায়ণ-মহাভারতই হোক বা পুরাণনির্ভর দেব সাহিত্যই হোক। এই সব ধর্মীয় সাহিত্য পড়লে তৎকালীন মানব সমাজের বিভিন্ন ভাগগুলি উপলব্ধি করা যায়। দেখা যায় একই সমাজের মানুষের কত প্রভেদ — বর্ণগত, পেশাগত আরও অনেক কিছু। দিন যত এগিয়ে গিয়েছে বা সভ্যতার বিকাশ ঘটেছে তত সমাজের মানুষের প্রভেদের প্রকৃতিগত পার্থক্য ঘটেছে। তবে যে দুটি দিক আমাদের বেশি দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা অবশ্যই বর্ণবৈষম্য ও অর্থনৈতিক বৈষম্য।

'প্রান্তজন' বলতে সাধারণত সামাজিকভাবে 'প্রান্তে' বসবাসকারী মানুষদের ইঙ্গিত করে। তবে বর্তমান দৃষ্টিতে অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল মানুষও তো প্রান্তিক। সুতরাং, 'প্রান্তজন' শব্দের সঙ্গে বর্ণ ও অর্থ এবং অন্যান্য 'প্রান্তের' মানুষদেরও বোঝায়। প্রাচীন ভারতে চতুর্বর্ণের মধ্যে শূদ্ররা ছিল প্রান্তিক। বেদ, রামায়ণ, মহাভারত এবং পুরাণগুলিতে শূদ্রদের প্রতি অন্যান্য বর্ণের অবজ্ঞা ও তাচ্ছিল্য অত্যন্ত স্পষ্টভাবে বর্ণিত। আবার শূদ্র এবং অন্-আর্য এক নয়। তৎকালীন

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

সমাজে অন্-আর্যরা ও আর্যদের চোখে ছিল হীন অভদ্র। বেদে 'রুদ্র' রূপে শিব অন্-আর্য দেবতা। রামায়ণ মহাভারতেও শিব ব্রাহ্মণ নন। শিবের প্রতি বিভিন্ন উক্তিতে তা বোঝা যায়। পুরাণসমূহেও দেখা গেল, দক্ষের যজ্ঞসভায় শিবকে বিবাহ করার জন্য সতী নিন্দিত। 'বৃহদ্ধর্ম পুরাণে' আছে দক্ষ শিবের সঙ্গে সতীর বিবাহ দিতে সম্মত হননি, হয়তো বা শিব নিম্নবর্ণের মানুষ বলেই। এই পুরাণ-অনুযায়ী শিব সতীকে হরণ করেন। (বৃহদ্ধর্ম পুরাণ, মধ্যখণ্ড, ৫।৬-৭)। শিব বনচারী, মহাভারত ও পুরাণে তার উল্লেখ আছে। এখানে তিনি নিম্নবর্ণ রূপেই পরিচিত। কাজেই শূদ্র ও অন্-আর্য উভয়েই সেকালে প্রান্তজন। শিব সেই প্রান্ত জনজাতিরই প্রতিনিধি।

বৈদিক বা রামায়ণ-মহাভারতের যুগে ভিক্ষুকের সাক্ষাৎ পাই না। সেসময় অর্থনৈতিক বৈষম্য ছিল না, ছিল বর্ণগত বৈষম্য। পুরাণে ভিখারি শিবকে দেখা গেল। কাজেই অর্থনৈতিকভাবে দরিদ্র প্রান্তিক মানুষের রূপ ফুটে উঠেছে পৌরাণিক সাহিত্যে। আমাদের পৌরাণিক সাহিত্য থেকে এইটুকু বলা যায় যে, সামাজিকভাবে নিম্নবর্ণের মানুষেরাই অর্থনৈতিকভাবেও দরিদ্র। শিব হলেন সেই সমাজেরই মানুষ। শিব সম্পর্কে দক্ষের উক্তি তাই-ই প্রমাণ করে —

সর্পস্থিতমণ্ডিতগ্রীবস্ত্যক্ত্বা হেমবিভূষণম্।
ভিক্ষয়া ভোজনং যস্য কথমন্নং প্রদাস্যতি।।

(স্কন্দ পুরাণ, প্রভাসখণ্ডে—বস্ত্রাপথক্ষেত্রমাহাত্ম্যম্ ৯।২৪)

—'স্বামী তোর হেমভূষণ পরিত্যাগ করিয়া গ্রীবাদেশে সর্পাস্থি ভূষণ ধারণ করে। ভিক্ষায় যাহার ভোজন, সে কিরূপে তোকে অন্নদান করিবে'।

খ্রিস্টীয় অষ্টম শতাব্দীর পূর্বে বাংলাদেশে শিব ভিখারি রূপে প্রতিষ্ঠিত হয়ে গেছেন। সমকালীন সাহিত্যে চিত্রিত শিব চরিত্র ও অন্যান্য প্রসঙ্গ থেকে সেই সময়ের বাংলাদেশের আর্থ-সামাজিক অবস্থা সম্পর্কে একটা ধারণা করতে পারি।

হালের 'গাথাসপ্তসঈ' (গাথাসপ্তসতী), শ্রীধর দাস সংকলিত 'সদুক্তিকর্ণামৃত', বিদ্যাধরের 'সুভাষিত রত্নকোষ', জহ্লনের 'সুভাষিত মুক্তাবলী', বল্লভদেবের 'সুভাষিতাবলী' প্রভৃতি গ্রন্থে সমকালীন সমাজের আর্থ-সামাজিক ছবি কিছুটা দেখা যায়। এই সব গ্রন্থের বিভিন্ন শ্লোক থেকে প্রান্তিক জনজাতির অবস্থার স্পষ্ট ছবি পাওয়া যায়। তবে চতুর্দশ শতকের কবি বিদ্যাপতির 'শিবগীতি'তে শিবকে ভিক্ষুক থেকে কৃষকে পরিণত হতে দেখা গেল।

মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিব ও রামেশ্বরের 'শিবায়ন'-এ প্রান্তিক জীবন চিত্র

বেদ-রামায়ণ-মহাভারত-পুরাণে শিব অকুলীন হলেও বাংলা সাহিত্যে তিনি কুলীন ব্রাহ্মণে পরিণত হয়ে গিয়েছেন। বাংলা মঙ্গলকাব্যে শিব কুলীন পিতা হিমালয়ের কৌলীন্য রক্ষা করেছেন। তবুও মধ্যযুগের বাংলা সাহিত্যে শিবের উপস্থিতি দ্বিমাত্রিক—একদিকে কুলীন দেবাদিদেবে মহাদেব ও অন্যদিকে দরিদ্র প্রান্তজন রূপে লোকায়ত শিব।

বাংলা সাহিত্যের প্রথম নিদর্শন 'চর্যাপদে' বাংলার প্রান্তজনের ছবি আমরা দেখেছি। যদিও এই গ্রন্থে শিবের অস্তিত্ব নেই। বাংলা মঙ্গলকাব্যের সঙ্গে শিব ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। মনসামঙ্গল

কাব্যে শিবকে ডোমনী বা ডুমনীর সাহচর্য লাভের জন্য নগ্ন চেষ্টা দেখা যায়। বিজয় গুপ্তের 'পদ্মাপুরাণে' শিবকে বলতে শোনা গেল—

পরম সুন্দর কন্যা প্রথম যৌবন।
মদনে পীড়িত হইলা দেব ত্রিলোচন।।
শিব বলে ডোমনারী শুনহ বচন।
আমারে ভজহ তুমি কি লয়ে তোমার মন।।[১]

মনসামঙ্গল কাব্যে ডোমনীর পেশা নদীতে খেয়া পারাপার করা। এই কাব্যধারায় ডোমনীকে শিব একা পেয়ে আলিঙ্গনে মত্ত হতে চেয়েছেন। জগজ্জীবনের মনসামঙ্গল কাব্যে ডোমনীর পাশাপাশি কুচনির আসঙ্গ-লিপ্সু শিবকে দেখা যায়। জগজ্জীবন ঘোষাল লিখলেন—

শঙ্করের আগে দিয়া চলিল কুচুনী।
কুচুনীর রূপে মোহিত শূলপাণি।।
গোসাঞি বোলে কুচুনি বচন মোর ধর।
আলিঙ্গন দান দিয়া প্রাণ রক্ষা কর।।[২]

জীবনকৃষ্ণ মৈত্র হর-গৌরীর ঝগড়া প্রসঙ্গে দেখিয়েছেন শিবের কাজই হচ্ছে সকালে উঠে কুচনি পাড়া যাওয়া—

প্রভাতে উঠি বৈসে ভাঙ্গরি বুড়া।
বলদে চড়িয়া যায় কুচনীর পাড়া।।[৩]

অষ্টাদশ শতকের কবি রামেশ্বরের 'শিবায়ন' কাব্যে কোচ এবং বাগ্‌দি রমণীর সঙ্গে শিবকে একাত্ম হতে দেখা যায়। সেই সূত্রে এই কাব্যে শিবের মতো ভিখারী বা চাষিদের চারিত্রিক দৌর্বল্য প্রকাশিত। সমাজের তথাকথিত নিম্ন বর্ণের নারীদের প্রতি উচ্চবর্ণ বা অন্যান্য পুরুষদের উঁকি ঝুঁকি 'চর্যা'র যুগ থেকে অষ্টাদশ শতকের 'শিবায়নে'র যুগেও দেখা যায়। ভিখারি শিব প্রথমে ভিক্ষা করতে যান কোচ নগরে। কোচ রমণীর সঙ্গে তাঁর বড়োই ভাব। শিবের বিষাণ কৃষ্ণের বাঁশির মতো কোচ রমণীদের আহ্বান করে, আর কোচবধূরাও রাধার মতো ঘর ছেড়ে বেরিয়ে পড়ে—

সুরসাল বাজে গাল নাচে ভালে বিধু।
শিঙ্গা গায় দ্রুত আয় কোঁচবধূ।।
.....
বিকল হইয়া ছুটে যতেক কুচিনী।
শিব আল্য আল্য বলি হল্য হরিধ্বনি।।[৪]

শিবের ভিক্ষা উপলক্ষ্য মাত্র, লক্ষ্য কুচনিদের সাথে রঙ্গরস করা। কবি লিখেছেন—

কুচিনী সকল হৈল কুসুম উদ্যান।
শঙ্কর ভ্রমর তায় করে মধু পান।।

নিত্য নিত্য এই কীর্ত্তি করে কৃত্তিবাস।
দিন শেষে অবশেষে ভিক্ষা অভিলাষ।।[৫]

বাগ্‌দিনী বেশে শিবকে প্রলোভিত করার মধ্যেও সেকালের প্রান্তজনজাতির অন্য রূপটি প্রকটিত। শিবকে দুর্গা যেমন নাস্তানাবুঁদ করেছে, তেমনি আদি রসের দিকটিও উন্মোচিত হয়েছে। একদিকে বাগ্‌দিনীর ছলা-কলা অন্যদিকে শিবের কামুকতা সমাজের হার্দিক সম্পর্কহীন স্থূলতা প্রকাশ করে। এর সবটাই কবিকল্পনা বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। নীহাররঞ্জন রায় লিখেছেন: ''পল্লীসমাজে যে স্তরে ব্রাহ্মণ্য আদর্শ পুরাপুরি স্বীকৃতি ছিল না, আদিম কৌমগত সামাজিক আদর্শ ছিল বলবত্তর, সে স্তরে যৌনজীবনের আদর্শই ছিল অন্যমাপের, রীতিনীতিও ছিল অন্যতর"।[৬]

এখন প্রশ্ন কুচনী, ডোমনী বা বাগদিনীর সঙ্গে শিবের সম্পর্কের তাৎপর্য কী? আসলে, সামাজিক বিশেষ পরিস্থিতিতে চালচুলোহীন শিব বহু যুগান্তরের পথ হেঁটে বাংলার কুলীন ব্রাহ্মণে পরিণত হলেও তাঁর উদ্ভব আসলে আদিম কৌম সমাজে। বাংলা সাহিত্যে শিবের লৌকিক রূপের মধ্যে কোচ-ডোম-বাগদি নারীর সঙ্গে আন্তরিক যোগাযোগের মাধ্যমে শিবের প্রান্তিক জনজাতিরই প্রতিনিধিত্ব করছে।

পূর্বে আমরা দেখিয়েছি, কোচপল্লীতে শিব ভিক্ষা করতে যান না। ভিক্ষা করেন অন্য অন্য পাড়াতে। ভিক্ষার সামগ্রী হিসেবে লাভ করেন কোনো অর্থ-কড়ি নয়, নানান দ্রব্যাদি, চাষিরা দেয় — শশা, ফুটি, আখ, শাক, কচু, কলা, কাঁচকলা, কুমড়ো, করলা; মোদকরা দেয় — নাড়ু, মুড়ি, মুড়কি; তেলি দেয় তেল, বেনেবউ দেয় — ভাঙ্গ, হরিদ্রা, দারুচিনি, কর্পূর, চন্দন, মরিচ, আফিং, হিঙ্গ, হরিতকি, গুয়া ইত্যাদি। বোঝা যায় শিবের মতো ভিক্ষোপজীবীদের এখনকার মতো হাট-বাজার, দোকান-পাট যাওয়ার প্রয়োজন হত না।

শিবের মত দরিদ্র উচ্চবর্ণের পরিবারে অর্থনৈতিক অবস্থা স্বচ্ছল না হলেও মেয়েরা গৃহের বাইরে কাজ করতে যেত না, কিন্তু নিম্নবর্ণের মহিলারা গৃহের বাইরে কাজকর্ম করত— যেমন বাগ্‌দিনীকে দেখা গিয়েছে মাছ ধরতে অথবা মনসামঙ্গল কাব্যে ডোমনিকে দেখা যায় খেয়া পারাপার করতে। কাজেই যাদের গৃহে শিবের মতো একজন মাত্র উপার্জনক্ষম ব্যক্তি তাদের সাংসারিক অনটনের চিত্র 'শিবায়নে'র হরগৌরীর সংসারের অনুরূপ ছিল। এমন দরিদ্র পরিবারে অনিবার্য ফল স্বামী-স্ত্রীর দ্বন্দ্ব, এই কাব্যেও তাই দেখা যায়।

ভিক্ষা ছাড়া সাধারণ মানুষের আরও দুটি জীবিকার কথা এই কাব্যে আছে, একটি চাষ অন্যটি ব্যবসা। অন্নাভাব দূর করার জন্য দুর্গা শিবকে চাষ করতে বলেছেন। কিন্তু চাষে পরিশ্রম আছে। যেখানে 'হরি বলেই কাঁড়া চাল' সেখানে শিব পরিশ্রম করতে সম্মত নন। তাঁর মনে দ্বিধা—

ভিক্ষা দুঃখে সুখে আছি অকিঞ্চন পণে।
চাষ চষ্যা বিস্তর উদ্বেগ পাব মনে।।
শুনিতে সুন্দর চাষ আয়াস বিস্তর।

সকল সম্পূর্ণ যার তার নাহি ডর।।

....

গরীব ভাগ্যে যদি শস্য হয় তাজা।

বাব কর্যা সকল বেচিয়া লয় রাজা।।[৭]

শিবের কথায় তৎকালীন সমাজের দুটি প্রবণতা এখানে ব্যঞ্জিত। প্রথমত, যে চাষির চাষের সমস্ত উপকরণ আছে সে চাষে লাভবান হবে। দ্বিতীয়ত, চাষিদের ওপর ‘রাজা’ বা জমিদারের শোষণ। দরিদ্র কৃষকেরা যে রাজার অত্যাচারে ভালো ছিল না, শেষ কথাটিতে তার ইঙ্গিত আছে। মানরিক লিখেছেন: ‘‘রাজস্ব দিতে না পারলে, যে কোনও হিন্দুর স্ত্রী ও ছেলেপুলেদের নীলাম করে বেচা হত। এছাড়া, সরকারী কর্মচারীরা যখন-তখন কৃষক রমণীদের ধর্ষণ করত’’।[৮]

শিব দরিদ্র, নিরক্ষর (শিব সেকালের নিম্নবর্ণের নেশাখোর মানুষদের মত নিরক্ষর ছিলেন কাব্যে তার ইঙ্গিত আছে। ‘হরগৌরীর কলহ’ অংশে গৌরী সংসার খরচের হিসেব শিবকে বুঝে নিতে বললে শিব বলেন ‘লেখাজোখা নাঞি জানি রামরস খায়্যা’।) সরল প্রান্তজনের পক্ষে ব্যবসা কর্ম নির্বাহ করা সম্ভব নয়। দুর্গা শিবকে বোঝানোর চেষ্টা করে বলেন, ‘পুঞ্জি আর প্রবঞ্চনা বাণিজ্যের মূল’। সুতরাং কৃষিকাজ ছাড়া গত্যন্তর নেই। রমেশচন্দ্র মজুমদার লিখেছেন: ‘‘ব্যবসা-বাণিজ্যের খুব প্রচলন থাকিলেও, বাংলায় কৃষিই ছিল জনসাধারণের উপজীব্য। প্রাচীন একখানি পুঁথিতে আছে যে আত্মমর্যাদাসম্পন্ন লোকের পক্ষে কৃষিই প্রশস্ত। কারণ বাণিজ্য করিতে মূলধনের প্রয়োজন এবং জালপ্রতারণা করিতে হয়। চাকুরিতে আত্মসম্মান থাকে না এবং ভিক্ষাবৃত্তিতে অর্থলাভ হয় না।’’[৯]

‘শিবায়ন’ কাব্যে প্রান্তিক ব্যবসায়ী হিসেবে শাঁখারির সাক্ষাৎ পাই। যদিও শিবই শাঁখারির বেশে দুর্গাকে ছলনা করছে। তবুও এই শাঁখারিবেশী শিবের মধ্য দিয়ে সমকালীন শাঁখারি শ্রেণির ধারণা করা যায়। তারা গ্রামে গ্রামে ঘুরে ঘুরে গ্রাম্য বধূদের শাঁখা পরালেও এখনকার মতো সুন্দর বাক্সের মধ্যে শাঁখা নিয়ে যেত না। তাদের হাতে বাক্স নয়, পুঁটুলি থাকত। শিবকে দেখা গেল বস্ত্রের মধ্যে বিচিত্র শাঁখা বেঁধে গ্রামের পথে যেতে — ‘শঙ্খ বেচে শাঁখারি বসনে কর্যা বন্ধ’।[১০] প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এয়োস্ত্রীর শাঁখা পরিধান স্বামী ও সংসারের কল্যাণের জন্য হলেও সপ্তদশ-অষ্টাদশ শতাব্দীর নিম্নবিত্ত মানুষদের কাছে তা ছিল আভিজাত্যের প্রতীক। শিবের কথায় —

পতিব্রতা পড়িল প্রভুর পদতলে।

তখন তুলিয়া তারে ত্রিলোচন বলে।।

শঙ্খের সংবাদ বলি শুন শৈলসূতা।

এ কি অভাগার ঘরে অসম্ভব কথা।।

গৃহস্থ গরীব তার শতগেঁঠ্যা টেনা।

সোহাগী মাগীর কানে কাঁটা কড়ি সোনা।।

ভাত নাঞি ভবনে ভর্ত্তার ভাগ্য বাঁকা।
জন খাট্যা মুনসা মরে মাগী মাগে শাঁখা।।[১১]

আবার, ভীমের সঙ্গে বাগ্‌দিনী দুর্গার ঝগড়ায় তৎকালীন গ্রাম্য মানুষের কোন্দল প্রবণতা ও নারী-পুরুষের বাক্‌চাতুর্য বাস্তব ভাষায় উপস্থাপিত হয়েছে —

বাগ্‌দিনী বলে মোর ভাতার বটে যা।
শিব জানে সে আমি জানি তোর বাপের কি তা।।
ছার কপাল ছিরে বেস্বা ছার কপাল ছি।
ভীম বলে মর মাগী ভাতারনুড়ির ঝি।।
উঁকে নাঞি সুখে ধান্য ভাঙ্গে আর গাজে।
মহাকোপে ধায় বীর মারিবার সাজে।।
বাগ্‌দিনী বলে বেটা ছোঁৎ দেখি মোকে।
ঘাড় ভাঙ্গ্যা রক্ত খাব পুঁত্যা যাব পাঁকে।।[১২]

অষ্টাদশ শতকে সাধারন খেটে খাওয়া ঘরের মেয়েরা নিতান্ত গৃহকর্মের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকত না। তারাও সংসার প্রতিপালনে পুরুষদের সাহায্য করতে মাঠে-ঘাটে মাছ ইত্যাদি ধরতে যেত। শিবের জমিতে বাগদিনীর মাছ ধরার মধ্যে বাগদি ও মৎসজীবীদের এই জীবনযাত্রার একটা ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

উপসংহার

রামেশ্বর ভট্টাচার্যের 'শিবায়ন' অষ্টাদশ (১৭১১-১৭১২) শতকের প্রথমে রচিত হলেও এই কাব্যে অন্ত্য-মধ্যযুগের আর্থ-সামাজিক ইতিহাস প্রতিফলিত হয়েছে। এই কাব্যে তথাকথিত উচ্চবর্ণের কথা নেই, আছে নিম্নবিত্ত ও নিম্নবর্ণের মানুষদের জীবন-জীবিকার কথা। শিবের ঐশ্বর্য বা মাহাত্ম্য এই কাব্যে নেই, আছে লৌকিক ছবি। তাই, শিবায়ন কাব্যে শিবকে বাদ দিলে অষ্টাদশ শতাব্দীর সামাজিক ইতিহাস হয়ে যায় বিবর্ণ। পৌরাণিক আদর্শে মহাজ্ঞানী তত্ত্বজ্ঞ যে শিব দেবাদিদেব, শিবায়নের শিব তার থেকে পৃথক। তাঁর চলন-বলন, আচার-ব্যবহার যেমন অতিপ্রাকৃততে আচ্ছন্ন নয়, তেমনি ভূত-দানা-পিশাচাদি সহযোগে কিম্ভূতকিমাকারও নয়। তিনি আমাদের শোষণক্লিষ্ট, বঞ্চিত-অবহেলিত মানুষের প্রতিনিধি। একদিকে রাষ্ট্রীয় শোষণ, অত্যাচার, অন্যদিকে সামাজিক অবক্ষয়, অর্থনৈতিক দুরাবস্থা, সংসারে জীবন-জীবিকার অভাবের বাস্তব চিত্র অঙ্কনে মধ্যযুগের অন্যান্য বাঙালি কবির মতো রামেশ্বর ভট্টাচার্য চির-উপেক্ষিত শিবকেই অবলম্বন করেছেন। তাই, মধ্যযুগের দেবনির্ভর সাহিত্যে অন্য আর এক প্রভাবশালী দেবতা কৃষ্ণ রূপী বিষ্ণু হতে শিব সব দিক থেকেই পৃথক হয়ে গিয়েছেন।

নাট্যালোচনা : দ্বান্দ্বিক দৃষ্টিকোণ

(তিন দশকের নাট্যসমীক্ষা — দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়)

উত্তমকুমার বিশ্বাস*

> শোনা যায় শ্রীশচন্দ্র মজুমদার নাকি একবার বঙ্কিমচন্দ্রকে নাটক লেখার জন্য অনুরোধ করেছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র বলেছিলেন কার জন্য লিখব? তেমন শ্রোতা নেই।

এই সমস্যা চিরকালের। আধুনিক কালে স্বাধীন দেশেও নাটকে কেন উত্তরোত্তর দর্শক-এর ভাটা তৈরি হল মূলত সেই দিকে নজর রেখেই দিগিন্দ্রচন্দ্র বর্তমান প্রবন্ধের অবতারণা করেছেন। দ্বিতীয়ত, যে কারণে এই প্রবন্ধ রচিত হয়েছে তা হল— ''জনৈক গোষ্ঠীপতি 'দৈনিক বসুমতী' পত্রিকায় ধারাবাহিক কতগুলি প্রবন্ধে প্রায় গোটা বাংলা নাট্যসাহিত্যকেই বরবাদ করে বলেছেন, বাংলা ভাষায় প্রকৃত নাটকই রচিত হয়নি।'' এই জনৈক গোষ্ঠীপতি কে? তার উত্তরও প্রবন্ধে দেওয়া আছে — 'প্রগতিশীলতার ধ্বজা ধরে যে দলটির তিনি এখন নায়ক সেই নান্দীকার জন্মসূত্রে গণনাট্য আন্দোলনেরই সন্তান' এই 'নায়ক' তিনি কাকে বলেছেন? দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর 'শ্রেষ্ঠ নাট্যপ্রবন্ধ' গ্রন্থে 'গণনাট্য আন্দোলনের বিকৃত ব্যাখ্যা' বলে একটি প্রবন্ধ লেখেন। এই প্রবন্ধ লেখার উদ্দেশ্যই হল ১৯৭৬ সালে কালান্তর পত্রিকায় 'বাংলা নাটকের চড়াই উতরাই' নামক রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত কৃত একটি প্রবন্ধ। যে প্রবন্ধে রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তথা বাংলা নাটকের মুণ্ডপাত করেছেন। তিনি উল্লেখ করেছেন — '১৯৬১ খ্রিস্টাব্দ থেকে আমি নান্দীকারের সঙ্গে বাংলা নাটকের সঙ্গে যুক্ত। মোটামুটি নিয়মিত এবং দায়িত্ববান হয়ে কাজ শুরু করেছিলাম চৌষট্টিতে।'[১] দুটো প্রবন্ধেরই রচয়িতা রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত। ঘটনাটা এমন দাঁড়ালো যে প্রমথ চৌধুরী একদা 'আনন্দ বিদায়' নাটককে ঘিরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের বিরুদ্ধে 'সাহিত্যে চাবুক' প্রবন্ধ রচনা করেছিলেন। আর এই সময়ে দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্তের প্রবন্ধ ঘিরে যে ফিরতি প্রবন্ধ রচনা করলেন তাকে নাটকের চাবুক বললে মন্দ হয় না। তাছাড়া এই প্রবন্ধটির মধ্যেও যে গ্রুপ থিয়েটার কর্তাদের আক্রমণ করা হয়েছে তা নাটকের চাবুক বললে মন্দ হয় না। তাছাড়া এই প্রবন্ধটির মধ্যেও যে গ্রুপ থিয়েটার কর্তাদের আক্রমণ করা হয়েছে তা চাবুক চালানোরই সামিল।

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ঘোর কমিউনিস্ট। সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী। সুতরাং একটি বিশেষ তত্ত্বে বিশ্বাসী হয়ে কী কখনো অন্য তত্ত্বে বিশ্বাসী অথবা কোন্ তত্ত্বেই বিশ্বাসী নয় এমন কারোর কৃতকর্মের দায় মাথায় নেওয়া যায়? নিদেনপক্ষে যদি নিতেই হয় তবে তার শেষরক্ষা হবে

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

কীভাবে? এই সব ভাবতে ভাবতে ঘটনাচক্রে কেমন যেন অস্বস্তিতে পড়া গেল। যেন বেড়াহীন ঘরের বন্ধ দরজা! দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় কৃত 'তিন দশকের নাট্য সমীক্ষা' প্রবন্ধটি পড়তে গিয়ে হকচকিয়ে এমনই মনে হল। তবু তাগা শক্ত ছিল। একটি বিশ্বাসের বাতাবরণ ছিল আগে থেকেই। কারণ প্রাবন্ধিক দিগিন্দ্রচন্দ্র। পরে আশানুরূপ ফলই পাওয়া গেল। যখন দেখলাম প্রবন্ধের মধ্যে একই সাথে উৎপল দত্ত এবং গ্রুপ থিয়েটার-এর কর্তা ও কর্তাভজাদের সমালোচনা করা হচ্ছে। আবার সম্বিৎ ফিরে পেলাম। মনে হল বেড়া দেওয়া ঘরে দরজাটা খোলা আছে। সেখানে অনায়াসে যাতায়াত করা যায়। যেহেতু দিগিন্দ্রচন্দ্র বিশ্বাস করতেন সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনার মধ্য দিয়েই একদিন এই পৃথিবীর ক্রমমুক্তি হবে। ফলে এই বিশ্বাস নিয়েই তিনি স্রষ্টার আসনে আসীন। তাঁর রচিত কোনো সাহিত্য কখনো এর অন্যথা হয়নি। নাটক ও নাট্যমঞ্চেরক্ষেত্রেও তিনি এই বিশ্বাস থেকে মনে করতেন যে সার্বিক সাফল্য এই পথেই ঘটবে। লক্ষণীয় তাঁর দূরদৃষ্টিই সত্যি হয়েছে। জীবনের বাস্তবতা এবং শিল্পের বাস্তবতা কী তবে এক? পিরানদেলোর মতে, 'এই দুইটি বস্তুকে Actuality এবং Reality শব্দের দ্বারা পৃথক করে বোঝান যায়।' জীবনে যা ঘটে তা Actuality আর শিল্পে যে জীবন প্রকাশ পায় তা Reality। শিল্প Actual-কে Real-এ পরিণত করে। প্রত্যক্ষ জীবনকে, বস্তুকে কবি যখন তাঁর কল্পনার দ্বারা নতুন করে সৃষ্টি করেন তখনই তা আর্টে পরিণত হয়।[২] কিন্তু সেই আর্ট বিভক্ত হয়ে আমাদের সামনে উপস্থিত হয়। একটি 'শিল্পের জন্য শিল্প', অন্যটি 'শিল্পের সামাজিক দায়িত্ব'। শিল্পে সমাজতান্ত্রিক চিন্তা চেতনায় বিশ্বাসী লেখকগণ 'শিল্পের সামাজিক দায়িত্বে'ই বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন। পক্ষান্তরে তাঁরা 'শিল্পের জন্য শিল্প'-কে বাতিল করে দেননি।

দিগিন্দ্রচন্দ্র থিয়েটার পাগল মানুষ। থিয়েটারকে বিনোদনের শাখা হিসেবে দেখার পাশাপাশি লোক-শিক্ষার অঙ্গ হিসেবেও তিনি নাটককে বিবেচনা করে থাকেন। লোকশিক্ষা তো সিনেমার মাধ্যমেও সম্ভব। তাহলে তো সিনেমাকেও সাহিত্য হিসেবে বিবেচনা করতে হয়। সিনেমা তবুও সাহিত্য নয়, সে বিতর্ক অন্য প্রসঙ্গ। দিগিন্দ্রচন্দ্রের অন্বিষ্ট ছিল একদিন যে সখের থিয়েটারের মধ্য দিয়ে আমাদের দেশে বিনোদনের একটি মাধ্যম তৈরি হয়েছিল তা বনেদিদের কুক্ষিগত ছিল। চল্লিশোত্তর নাট্যান্দোলন সেই শাপ থেকে মুক্তি দিলেও পুনরায় সেই ধারার অবলুপ্তি ঘটল। দেখা গেল সেখানে সাধারন মানুষের পাশাপাশি সে সময়কার থিয়েটার পরিচালকরাও একাংশে দায়ী। গণনাট্যের ধারার বাইরে বেরিয়ে তাঁরা কোন্ ধারাকে বহন করলেন? প্রাবন্ধিক কিন্তু কখনোই এ কথা বলছেন না যে তিনি যে মতাদর্শ-এর কথা বলছেন সেই আদর্শকেই স্বীকার করতে হবে; পক্ষান্তরে তাঁরা সেই পথকে স্বীকার করবেন কী করবেন না সেটা একান্তই তাঁদের ব্যাপার। কিন্তু যে পথই অবলম্বন করুন না কেন তাতে যদি ভবিষ্যৎকালের মঞ্চগামী মানুষ বিমুখ হয়ে পড়ে তবে তাঁদেরকে তো প্রশ্নের মুখে পড়তেই হবে। অনিবার্য কারণেই অনিবার প্রাবন্ধিক প্রবন্ধটির মধ্যে সেই প্রশ্নটি তুলে ধরেছেন। সর্বোপরি ক্ষতি হলো সাধারণ মানুষ ও থিয়েটারের। যদি তাঁরা এই নতুন পথের সন্ধান দিয়ে আরো বেশি পরিমানে সাধারণ মানুষকে মঞ্চাভিমুখী করে তুলতে সক্ষম হতেন তবে দিগিন্দ্রচন্দ্রকে আর এই প্রবন্ধ লেখার জন্য দস্তুর মতো হাত

পাকাতে হতো না। বা তাঁরা যে গোষ্ঠী গঠন করেছেন তার যে অভিমুখ সেটা যদি সাধারণ মঞ্চাভিমুখী আম আদমীকে আরো বেশি উৎসাহী করে তুলত তবে এই প্রশ্নও উঠত না। জনগণের যে ঢল একদা সাধারণ রঙ্গালয়গুলোতে উপচে পড়ছিল হঠাৎ করেই অকারণে সেই প্রবাহ নষ্ট হয়ে গেল এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই। দিগিন্দ্রচন্দ্র সেই বিষয়টিই বারবার প্রমাণিত করতে চেয়েছেন যে তাহলে কী বলতে হবে যে তত্ত্বগতভাবে নাট্য পরিচালকগণ ভুল পথের পথিক হয়ে উঠেছিলেন বলেই তাঁদের নাট্যান্দোলনের আজ এই পরিস্থিতি। তিনি তাঁর প্রবন্ধের মধ্যে অজস্র প্রশ্ন তুলে খোলসা করেছেন। তাতেই প্রমাণ হয় থিয়েটারগুলো কেন রবীন্দ্রসদন আর আকাদেমি নির্ভর হয়ে পড়ল। ইস্তক সেই অবস্থার বদল ঘটেনি।

দিগিন্দ্রচন্দ্র 'তিন দশকের নাট্যসমীক্ষা' প্রবন্ধটি চল্লিশোত্তর বাংলা নাটক-এর গতি প্রকৃতির প্রকৃত পথ নির্ণয় করতে গিয়ে দেখলেন বিস্মৃতির পথে তার গতি। ইতিহাস-এর অজস্র 'শৈবাল দাম'- সেখানে জড়ো হয়েছে। প্রশ্নবাণে জর্জরিত এই প্রবন্ধটিতে লেখক চল্লিশ থেকে পঞ্চাশটির মতো প্রশ্ন তুলেছেন। প্রশ্নগুলি তিনি তুলে ধরেছেন উদ্ধৃত তিন দশকে যাঁরা নাটক রচনা ও মঞ্চস্থ করেছেন তাঁদের সম্পর্কে। এ দিক থেকে তিনি গ্রুপ থিয়েটার ওয়ালাদের একহাত নিয়েছেন। যে অচলায়তন ভেঙে বাংলা নাটকের একটি নতুন ধারার সূচনা হয়েছিল তা দীর্ঘস্থায়ী হওয়া উচিত ছিল। উল্টে অচিরেই তার গতিপথের পরিবর্তন সাধিত হ'ল এবং নিজেদের এমন ইগোর লড়াই শুরু হ'ল যে, যাঁরা এই গতিপথের সূচনা করলেন তাঁরাই নিজেদের মধ্যে মুখ দেখাদেখি বন্ধ করে দিলেন। এই প্রবন্ধও রচিত হয়েছে 'ইগো' থেকে; যদিও এর ভিত্তি একটি গঠনমূলক দৃষ্টিভঙ্গি। একদিকে পরাধীনতার আগল অন্যদিকে তাঁদের দূরদৃষ্টি সম্পন্ন সহ্য ক্ষমতার বিলোপ। দুয়ে মিলে ইতিহাস প্যারাসুট-এ চড়ে বসল। নিয়ন্ত্রণহীন ভাসমান অবস্থায় গন্তব্যস্থল অনির্দিষ্ট। সুতরাং বাংলা নাট্যমঞ্চেরও অবস্থা প্রাবন্ধিক কথিত 'সে জগতে তো চলছে উপন্যাসের নাট্যরূপ আর ক্যাবারে নাচের ধূম'।

গ্রুপ থিয়েটার ও বাংলা নাটক-এর গতিমুখ

দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বাংলা নাটক ও নাট্যমঞ্চে গ্রুপথিয়েটার-এর এলোমেলো অভিমুখহীন গতিকে বাংলা নাটক ও মঞ্চের উন্নতির পথে অন্তরায় বলে দায়ী করেছেন। কোনো রাগ-ঢাক করে নয়, সরাসরি তিনি অভিযোগ করেছেন যে — 'ষাট ও সত্তরের পরবর্তীকালে পশ্চিমবঙ্গের নাট্যজগতের দিকে তাকালে কি কোথাও তেমন ঐক্য ও সজীবতা নজরে পড়ে? মনে হয় ছাদটা ধসে গেছে।' গ্রুপথিয়েটারের ধস-এর কারণ একাধিক। তবে গ্রুপ বলতে তো আর সমুদয় বোঝায় না। গ্রুপ-এর সাধারণ মানে যা; ঘটনাও তাই ঘটেছে। এখানেই শিল্পগত মতপার্থক্যটা ঘটে গেছে। যদি বলি গণনাট্য-নবনাট্য-গ্রুপথিয়েটার এই ত্রিধারা শেষ পর্যন্ত শিল্প এবং মতাদর্শের ক্ষেত্রে ভিন্ন গন্তব্যে পাড়ি দিয়েছে, তাহলে আর অতি রঞ্জিত হয় না। কারণ ধীরে ধীরে তাঁরা ঐক্য থেকে অনৈক্যে পদার্পণ করেছে। গণনাট্যের আগে বাংলা নাট্যমঞ্চে আমরা গ্রুপ থিয়েটারের নামক শব্দবন্ধের সন্ধান পাই না। গণনাট্যে উত্তরকালেই এর সূত্রপাত এবং সেখানে থেকেই এই ধারার প্রবাহমানতা। কিন্তু অনেক আগে থেকেই 'গণনাট্য ও নবনাট্য' এই দুটি বিষয়ের মধ্যে

যথেষ্ট তালগোল পাকানো আছে। এই প্রবন্ধে তিনি নবনাট্য গোষ্ঠীর তুলোধোনা করলেও আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে তিনি নিজেকে সব সময়ই নবনাট্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বলেই দাবি করতেন। আবার তাঁর নিজেরও তো নাট্যচক্র (১৯৫০) নামক দল ছিল। এতদসত্ত্বেও থিয়েটার কর্তারা যে দোষে দুষ্ট হওয়ার জন্য এই প্রবন্ধের অবতারণা তিনি সেই দোষে দুষ্ট ছিলেন না। পরে সে আলোচনা আমরা করেছি। যাইহোক চল্লিশ-পূর্বকালে নাট্যকালে নাট্যপ্রযোজনা বা নাট্যসাহিত্যের যে গতানুগতিক তা থেকে ভিন্ন ধারায় নাটকের জন্মলাভের ফলেই বিতর্কের দানা বাঁধতে শুরু করে। যে অভিঘাতের মধ্য দিয়ে চল্লিশোত্তর কালেই গাথা নাটকে রচিত হয়েছিল তা ছিল যুগের কোলাজে আবৃত। রবীন্দ্রনাথ মনে করতেন— 'সময়ের সঙ্গে মিল না রাখিতে পারিলে বড়ো বড়ো মজবুত জিনিসও ভাঙিয়া পড়ে।' আবার অন্যত্র বলেছেন— 'সকল রকম প্রকাশের মধ্যে যুগের প্রকাশ, আত্মপ্রকাশ হওয়া চাই।' এখন প্রশ্ন চাই—সমকালীন যেসমস্ত নাটক রচিত বা মঞ্চস্থ হচ্ছিল তার কি কোন যুগ লক্ষণ ছিল না? উত্তর হল—'যা ছিল তা যুগের দাবির সঙ্গতিতে নিতান্তই নগণ্য। চল্লিশ-পূর্ব জাতীয় জীবনে ধুন্ধুমার কোলাহল-এ হতাশা, আর অস্তিত্বের লড়াইতে মানুষ যূথবদ্ধ হয়েছিল। পরবর্তীকালে সেই আখেরী উদ্দেশের নানারকম পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। গণনাট্য খোলাখুলি সেই আসর খুলে দিলেও নবনাট্যকারীরা আসলে কী দেখাতে চাইলেন সেটা স্পষ্ট নয়। প্রাবন্ধিক বিষয়টি স্পষ্ট করেছেন—'নবনাট্য আন্দোলন নামধারীরা সেই মূল চেতনাকে গৌণ করে বহিরঙ্গকে প্রাধান্য দিলেন।' এলেন গোষ্ঠী থিয়েটাররা। তাঁরা এসেছিলেন অনেক স্বপ্ন ও আশা নিয়ে কিন্তু মুশকিল হল সমান্তরাল ভাবে গোষ্ঠীপতিদের মধ্যেও ছিল স্ববিরোধীতা। ফলে আমরা জানি কেন ও কীভাবে একের পর এক গোষ্ঠী থিয়েটার-এর দল গঠিত হয়েছে এবং তাঁদের মর্জিমাফিক যখন যে নাটক ভালো লেগেছে বলে মনে হয়েছে তখন সেই নাটক মঞ্চস্থ করার জন্য মনোস্থির করেছেন। অথবা রুচির বদলের জন্য হয়তো সে কাজ তাঁরা করেছেন।

নাটক ও নাট্যমঞ্চে গতানুগতিকতা ভেঙে প্রথম মৌলিকতার নিদর্শন 'গণনাট্য'। এ কথা সর্বজন বিদিত যে চল্লিশোত্তর বাংলা নাট্যসাহিত্য ও নাট্যমঞ্চে গণনাট্য মাইল ফলক হয়ে আছে। বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' দিয়ে যে ঐতিহাসিক পদযাত্রা শুরু হয়েছিল তার জৌলুস কিন্তু অচিরেই ঝরে পড়ল। যাঁদের নেতৃত্বে মৌলিকতার অভিমুখে দেখিয়েছিল সেই তাঁরাই কিন্তু বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল অতি দ্রুত। আসলে ইনটেলেকচুয়ালরা হয়তো কোনো দিনই দীর্ঘস্থায়ীভাবে বেঁধে বেঁধে থাকতে পারেন না। কারোর তাবেদারি হয়তো এঁদের পছন্দ হয় না। কিন্তু মুশকিল হচ্ছে শুরু করলেন যাঁরা, তাঁরা শেষের দায়িত্বটা আর নিলেন না। অন্যদিকে তাঁরা নিজেরা যে দল প্রতিষ্ঠা করলেন সেখানেও তাঁদের ঐতিহাসিক ছোঁয়া দেখা গেল না। সুতরাং একদিন যে সামাজিক প্রেক্ষাপটকে সামনে রেখে তাঁদের আর্বিভাব হয়েছিল অনতিবিলম্বে সেই চিন্তার অবসান হয়ে গেল। নিশ্চয়ই আদর্শগত বা তত্ত্বগত কিছু গোলমাল হচ্ছিল। কিম্বা অন্যকোন মতাদর্শ তাঁদের সামনে ছিল। অথবা কোনো আদর্শই সামনে ছিল না। যা খুশি ভাবা যেতেই পারে। তবে বোধ হয় সে রকম কোনো অভীপ্সা থেকে কোনো দলই গঠিত হয়নি। যতটা মানসিক অভিঘাত তাঁদের

মধ্যে কাজ করেছে ততটা কী তত্ত্বগত অভিঘাত তাদেরকে ভিতর থেকে ঘাই মেরেছিল এ প্রশ্ন থেকেই যায়। তাহলে তাঁদের মঞ্চায়ন থেকে তার প্রমাণ পাওয়া যেত? সে রকম কিছু তো নেই। 'গণনাট্য'-এর পরিমণ্ডল থেকে বেরিয়ে শম্ভু মিত্র তাঁর দলের নাম রাখলেন 'বহুরূপী' (১৯৪৮)। যে দলটির এরূপ নাম তার যে বিশেষ কোন মতাদর্শ থাকবে না এটাই স্বাভাবিক। সুতরাং অনিবার্য কারণেই মতাদর্শ নিয়ে যেকোনো প্রশ্ন শুরুতেই বিনাশ করার মতো কাজ তো তিনি আগেই সেরে রেখেছেন। কিন্তু নিজের দলের পসার জমাবার জন্য প্রথমে বেছে নিলেন তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' নাটক। জনপ্রিয়তাও অর্জন করলেন। এর পরে এই ধরনের আর কোন নাটকই তিনি গ্রহণ করলেন না। বহুরূপীর নাম লোকের মুখে মুখে এসেছে 'রক্তকরবী' নাটক মঞ্চস্থ করার পর। এর পর রবীন্দ্রনাথের অন্যান্য নাটক যেমন— 'চার অধ্যায়', 'মুক্তধারা', 'বিসর্জন', 'ডাকঘর', 'রাজা' নাটকগুলি মঞ্চস্থ করলেও সেই প্রশংসা লাভ করতে পারেনি। রবীন্দ্রনাথের নাটক মূলত উচ্চমার্গীয়। সীমিত তার দর্শক। থিয়েটার হলে আসর জমানোর জন্য নয়। তাছাড়া 'যাঁদের নাটক নিয়ে একদা একটা আন্দোলন হলো, গোষ্ঠী থিয়েটারগুলোর কাছে তাঁরা একেবারে অপাংক্তেয় হয়ে গেলেন কেন? তাঁরা কি কোনো নতুন নাটক লেখেননি? যে বহুরূপী 'রাজা', 'দশচক্র' করে, সে কেন বিজন ভট্টাচার্যের 'চলো সাগরে', 'দেবী গর্জন', 'গর্ভবতী জননী'-র মতো নাটক দূরে সরিয়ে রাখে? এমনকি দিগিন্দ্রচন্দ্রের বেশ কিছু পূর্ণাঙ্গ নাটক 'জীবনস্রোত', 'কেউ দায়ী নয়', 'নয়শিবির', 'অমৃত সমান' নাটকগুলিও গোষ্ঠীথিয়েটারে জায়গা করে নিতে পারেনি। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন উঠতে পারে প্রবন্ধকারের নাটকগুলিও অভিনীত হয়নি বলেই তিনি এই জারিগান শুরু করেছেন। সে কথায় পরে আসছি। প্রবন্ধকার শম্ভু মিত্রের প্রতি যে প্রশ্ন তুলেছেন তাতে অনেকেরই মনে হতে পারে প্রাবন্ধিক সম্মাননীয় মিত্রের প্রতি হিংসায় কুৎসা রটাচ্ছেন। বিষয়টা এর থেকে একটু আলাদা। শম্ভু মিত্রের কাণ্ডকারখানা থেকে প্রাবন্ধিক একটা বিষয়ই খুঁজতে চেয়েছেন; তা হল গণনাট্য সাধারণ মানুষকে যেভাবে মঞ্চাভিমুখী করতে সক্ষম হয়েছিল তিনি (শম্ভু মিত্র) কী সেই ধারাকে বজায় রাখতে পেরেছেন বা তাকে ছাপিয়ে গিয়েছেন? যদি তা না হয়ে থাকে তবে তাঁকে কিন্তু কিছু প্রশ্নের জবাবের দায়ভার নিতেই হবে। এই দায়ভার নেওয়ার থেকেও বড়ো কথা হল কোনো গোষ্ঠীই কি সেই কাজ করেছে? অন্যান্য গোষ্ঠীর ক্ষেত্রেও আমরা দেখব একই হাল। 'রূপকার' (১৯৫৫) এর প্রথম নাম ছিল 'আনন্দম'। 'গণনাট্য' ছেড়ে যাঁরা 'বহুরূপী' গঠন করেছিলেন তাঁদের মধ্যে কয়েকজন আবার 'বহুরূপী' থেকে বেরিয়ে এসে গঠন করলেন 'রূপকার' গোষ্ঠী। তাঁদের প্রথম মঞ্চায়ন নিয়ে প্রাবন্ধিক বলেছেন 'বাংলার মাটি' প্রথম অভিনীত হয়। কিন্তু অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে— ''তুলসী লাহিড়ীর 'ছেঁড়াতার' দিয়ে এদের নাট্যাভিনয় শুরু ৩১ ডিসেম্বর, ১৯৫৫ থেকে।''[৩] এরা কিন্তু সেই একই পথের পথিক হলেন। অমৃতলাল বসুর 'ব্যাপিকা বিদায়' নাটক দিয়ে সেই সময়ের চাহিদা মেটানো সম্ভব হল না। পুনরায় তারা রবীন্দ্রনাথের নাটকের কাছে হাজির হন, ততদিনে অনেকটা পথ হাঁটা হয়ে গেছে। 'ব্যাপিকাবিদায়'-এর হুল্লোড়ে 'অচলায়তন' এবং 'কালের যাত্রা' বিস্মৃতির অতল তলে তলিয়ে গেছে। শেষ পর্যন্ত দল হিসেবে এরাও মৌলিকতা

দেখাতে পারলেন না। এরপর দিগিন্দ্রচন্দ্র নান্দীকার (১৯৬০) গোষ্ঠীর কথায় এসেছেন। এই নান্দীকার গোষ্ঠী এক সময় গণনাট্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। 'এরা ছিল মূলত উত্তর কলকাতা গণনাট্যর দমদম শাখা। প্রথমে তাঁরা মঞ্চস্থ করলেন সাঁওতাল বিদ্রোহ'। কিন্তু দিন গড়াতেই তারা বিদেশী নাটকের দিকে ঝুঁকে গেল। পিরানদেলোর ' Six Character in Search of an author' বাংলায় নাম পেল 'নাট্যকারের সন্ধানে ছটি চরিত্র'। এরপর এলো 'চতুর্থ হেনরি'র আদলে 'শের আফগান'। আর্ণল্ড ওয়েস্কার-এর ট্রিলজি-এর একটি 'সেদিন একা', অন্যত্র পাওয়া যাচ্ছে 'যখন একা', 'তিনপয়সার পালা', 'ভালোমানুষি'। চেখভের 'দ্যা চেরি অর্চার্ড'-এর বাংলারূপ 'মঞ্জরী আমের মঞ্জরী'। গান্ধর্ব (১৯৫৭) প্রথম নাটক 'সূর্যলগ্ন', পরে 'দলিল', 'অঙ্কুর', 'মোরগের ডাক', 'অমৃত অতীত' প্রভৃতি নাটক মঞ্চস্থ করে। পরবর্তীকালে এঁরাই নক্ষত্র নামে দল পরিচালনা করতে থাকেন। বহুদিন পরে নান্দীকার ভেঙে এল থিয়েটার ওয়ার্কশপ গ্রুপ (১৯৬৭) এঁরা বিদেশি নাটকের পাণিপ্রার্থী না হয়ে মৌলিক নাটকের অভিনয়ের দিকে অগ্রসর হলেন কিন্তু সে কাজ করতে গিয়ে এতবেশি পরিমাণে মিথ সর্বস্ব হয়ে পড়লেন যে কুসংস্কারকে প্রাধান্য দিয়ে দিলেন। প্রাবন্ধিক বলছেন — 'সর্পাঘাতে মৃতপ্রায় ব্যক্তিকে কোন ভেষজ প্রয়োগ না করে শুধু ঝাড়ফুঁকের দ্বারাই বাঁচিয়ে তোলা হয়েছে এটা কি আধুনিক চিকিৎসাবিজ্ঞান থেকে লোকের দৃষ্টি অন্ধ বিশ্বাসের দিকে নিয়ে যাওয়া নয়?' তবে কোন্ মতাদর্শের দ্বারা এরা নিয়ন্ত্রিত? এ ছাড়াও ৫০-এর দশকে অগুণতি থিয়েটার দলের পত্তন হয়েছিল। যেমন - চতুরঙ্গ, নক্ষত্র, অভিনেতৃ সংঘ, অভ্যুদয়। ৬০-এর দশকে এই সংখ্যা আরো বেশি পরিমাণে বৃদ্ধি পেয়েছে। নবনাট্য নামের মধ্যে সীমিত ছিল যাঁরা তাঁরা সৎনাট্য, ঠিক নাটক, অন্য নাটক নাম নিয়ে শেষ পর্যন্ত গ্রুপ থিয়েটার হিসেবেই নিজেদের পরিচয় প্রতিপন্ন করেছেন। তার মধ্যে কয়েকটি হল — রূপান্তরী (১৯৬০), চতুর্মুখ (১৯৬১), চলাচল (১৯৬৪), মাস থিয়েটার্স (১৯৬৬), থিয়েটার ওয়ার্কশপ (১৯৬৮), থিয়েটার কমিউন (১৯৭২), চেতনা (১৯৭৩), চার্বাক (১৯৭৬)। এঁরা কেউই চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের জাতীয় সমুদয় সমস্যা নিয়ে বাংলা নাটক যে মুখরিত হয়ে উঠেছিল তার ধারেকাছেও ভিড়ল না। সুতরাং প্রাবন্ধিক যথার্থরূপেই প্রশ্ন তুলেছেন যে — 'যে ব্যাপক জাতীয় ও সামাজিক সমস্যা এসেছিল চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের নাটকগুলিতে, ষাটের দশকের নামকরা থিয়েটারগুলির কাছে সেগুলি প্রায় মূল্যহীন হয়ে গেল।' আমরা একটু আগেই বলেছি যে প্রবন্ধকারের নাটকগুলিতে মঞ্চস্থ করা হচ্ছে না বলেই তিনি এই ধরনের জারিগান শুরু করেছেন। লক্ষ্য করলে দেখা যাবে যে শুধুমাত্র লেখকেরই নয় এই সময়ের কোনো নাট্যকারেরই প্রতিনিধিস্থানীয় নাটকেরই বিশেষ শো হয়নি। তার একটি লম্বা তালিকা দিগিন্দ্রচন্দ্র দিয়েছেন — লেখকের 'বাস্তুভিটা', 'তরঙ্গ', 'মোকাবিলা', 'মশাল', তুলসী লাহিড়ীর 'দুঃখীর ইমান', 'পথিক', 'ছেঁড়াতার', ঋত্বিক ঘটকের 'জ্বালা', 'দলিল', সলিল সেনের 'নতুন ইহুদি', 'মৌ চোর', বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্তি', 'বিশে জুন' (অনুদিত)। আসলে নাট্যকার এবং থিয়েটার উপস্থাপকদের মধ্যে শিল্পগত দ্বন্দ্বের জেরেই তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। অনেক সময় উপস্থাপকদের মধ্যে পসার জমানো এবং আর্থিক উন্নয়নের ব্যাপার থাকে, হয়তো সেই চিন্তা, শিল্প ও মতাদর্শের থেকে বেশি গুরুত্ব পেয়ে

গেছে। তা না হলে বিদেশি নাটক কিংবা বিমূর্ত নাটকগুলি এত বেশি জায়গা পেল কেন? বিদেশি নাটক যখনই আসছে তখন কী তিনি বাংলা নাটকের তালিকাটা একবারও দেখছেন না। নিশ্চয়ই দেখছেন কিন্তু দেখে মন ভরছে না। সাথে জন রুচির ব্যাপার আছে, সুতরাং সমুদ্র পাড়ি দিতে হবে। সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় তাই বলেছেন — 'অন্য ভাষা থেকে নাটক ধার করা কিছু দোষের নয়। কিন্তু নিজেদের ভাষায় মৌলিক নাটক রচিত হবে না কেন? গ্রুপ থিয়েটারগুলি প্রথম দিকে শুধুই বিদেশি নাটকের ভাবানুবাদ দিয়ে প্রযোজনা করতেন।'[৪]

নাট্যকার উৎপল দত্ত-এর একহাত : ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়ম লঙ্ঘন

কোনো অল্পবিস্তরের ব্যাপার স্যাপারই নেই। প্রথমেই বলেছি দিগিন্দ্রচন্দ্র পুরোদস্তুর কমিউনিজম-এ বিশ্বাসী। এবং তাঁর শিল্প-সাহিত্যের ধারাও সমাজতান্ত্রিক ও বৈজ্ঞানিক যুক্তি তর্কের বৌদ্ধিক দৃষ্টিকোণ থেকে নিয়ন্ত্রিত। কিন্তু ক্লাসিক সাহিত্যকে কখনই অস্বীকার করা সম্ভব নয়। বরং উল্টে তিনি বলতেন যে তিনি রামায়ণ, মহাভারত, পুরাণ পড়ে বড়ো হয়েছেন। নিজেকে সমালোচনার জায়গা দেননি। তাছাড়া ক্লাসিক সাহিত্যকে মার্কসবাদী গুরুত্বের সাথে বিচার করেছেন। ভুঁইফোঁড় কোন কিছুকেই মান্যতা দেওয়া যায় না। জয়েসের 'ইউলিসিস' এবং তলস্তয়ের 'ওয়ার অ্যান্ড পিস' –জীবনের যে মহাকাব্যপম আধিপত্য নিয়ে বিরাজমান তাকে কি কেউ উপেক্ষা করতে পারবে? সেই জন্য সাহিত্যে কেউ যদি কৃত্রিম চরিত্র ও কৃত্রিম আবেগ সৃষ্টি করতে যান তবে তাও যথার্থ শিল্প না হয়ে প্রচার-কলায় পরিণত হবে। 'মনের শুদ্ধতার দ্বারা বস্তুও শোধন হলেই শিল্পের শুদ্ধতা আসে। বস্তুর শুদ্ধ-অশুদ্ধ রূপ নেই–সে বস্তু মাত্র। মনের পরকলায় পড়ে সে নানা রঙ ধরে এবং তখনি তার শিল্পরূপ। মন বিকৃত থাকলে শিল্পেও বিকৃত রঙ ধরবে। বস্তুর অস্তিত্বে শিল্প নেই, আছে অভিব্যক্তিতে। এই অভিব্যক্তি সুসামঞ্জস্যপূর্ণ হওয়া চাই। একদিকে বেশি ঝুঁকলেই সামঞ্জস্য হারায়। কোনো আদর্শের প্রতি আনুগত্য থাকা নিন্দনীয় নয়। কিন্তু অন্ধ আনুগত্যের দ্বারা যদি সত্যকে বিকৃত বা হত্যা করা হয় তবে তা অমার্জনীয় অপরাধ।'[৫] অর্থাৎ কোনো আদর্শে বিশ্বাসী হয়ে কল্পনায় অবগাহন করলে তা সামাজিক ক্ষতির সূচনা করে। শিল্পীকে সামাজিক সত্তা স্বীকার করতেই হবে। একজন লেখককে স্বতই ভাবতে হয় তাঁর দায়িত্ববোধ সম্পর্কে। লেখকের 'দায়বদ্ধতা'র কতকগুলি বিষয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ। 'সততা', 'সাধনা' এবং 'মানবসমাজ'[৬] এগুলি ছাড়াও অতিরিক্ত কিছু সাহিত্যিক দায়িত্ব আছে। সুতরাং একজন সচেতন লেখককে সমস্ত দিক লক্ষ রেখে কলমকে নিয়ন্ত্রণের মধ্যে রাখতে হয়। দিগিন্দ্রচন্দ্র বলেছেন – 'সাহিত্য সম্পর্কে আরো একটা দিক ভাববার থাকে। সে দিকটা হচ্ছে সাহিত্যস্রষ্টার মানস যেখানে কাজ করে তাঁর ব্যক্তিগত জীবনদৃষ্টি ও জীবনবোধ, চিন্তা-ভাবনা-কল্পনা, আবেগ, অনুভূতি, প্রত্যয়, এমনকি অবচেতন মনও। সাহিত্য সৃষ্টির সময় এগুলো যুগপৎ কাজ করে যে নতুন মাত্রা সংযোজন করে তারই যৌথ ক্রিয়ায় সৃষ্টি হয় দেখা মানুষের শিল্পরূপ।' আমরা জানি যে, কার্য-কারণ সম্পর্ক রহিত কোনো কিছুই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না। দিগিন্দ্রচন্দ্র মনে করেন এতে শিল্পীর স্বাধীন চিন্তা ক্ষুণ্ণ হওয়ার পাশাপাশি সেই শিল্পী মহল সামাজিক দায়িত্বরহিত হন বলে মনে হয়। এই আদর্শ ও মনোভাব থেকেই তিনি উৎপল দত্তের মতো বড়ো মাপের স্রষ্টা ও সমালোচককে রেয়াদ করলেন না। উল্লেখ্য যুগপৎ একই মতবাদ-এ বিশ্বাসী হয়েও প্রাবন্ধিক এই

মহানুভবতা দেখিয়েছেন যে 'শিল্পকে রাজনীতি প্রচারের বাহন করলেই মাত্রাহীন প্রচার প্রবণতা এসে যায় আর তাতে শিল্পের ভারসাম্য নষ্ট হয়। রাজনৈতিক নাটকে বিরুদ্ধপক্ষের criticism বা সমালোচনা থাকবেই–কিন্তু criticism আর varification বা কুৎসাতে তফাৎ আছে। উৎপলবাবু সেই তফাৎটা আর রাখলেন না। ক্ষেত্রবিশেষে শক-থেরাপির প্রয়োজন থাকলেও তার প্রয়োগে রোগীর যদি মৃত্যু হয়, চিকিৎসকের তাতে হাতযশ বাড়ে না। শিল্পের ক্ষেত্রে তো একেবারেই নয়।' প্রাবন্ধিক আরো জানিয়েছেন— 'উৎপলবাবুর জানা না থাকার কথা নয় যে, পূর্ব জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির (স্যোসালিস্ট ইউনিট পার্টি) সঙ্গে ব্রেখট-এর এক সময় খানিকটা নীতিগত পার্থক্য হয়েছিল; কিন্তু তাঁর নাটকে তা আনেননি। ব্রেখট্ অনুরাগী হয়েও উৎপলবাবু কিন্তু শিল্পকর্মে সেই সংযম রক্ষা করতে পারেননি।' তিনি উৎপল দত্তের একহাত নিলেন। বাংলা নাটকে উৎপল দত্তের ভূমিকা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে স্পষ্টভাবেই তিনি উল্লেখ করেছেন। 'উৎপল বাবু যদি পার্টিগত রাজনীতিকে নাটকে অতটা টেনে না আনতেন তবে মিনার্ভা থেকে হয়তো তাঁকে বিদায় নিতে হতো না।' মিনার্ভা থেকে উৎপল দত্তের অপসারণ-এর ব্যাখ্যায় না গিয়েও একথা বলা যায় স্রষ্টাকে কোনো ভাবেই রাজনৈতিক পক্ষাবলম্বন করলে চলে না। আবার এ কথাও মানতে হবে যে বৃহত্তর স্বার্থে বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলকে সমর্থন করা যেতেই পারে। তার সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য দৃষ্টান্ত রবীন্দ্রনাথ। দিগিন্দ্রচন্দ্র আরো উল্লেখ করেছেন পৃথিবীর সমস্ত শ্রেষ্ঠ সাহিত্যের মধ্যে বেশিরভাগ মতেরই সমন্বয় ঘটেছে। অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যতের মেলবন্ধন রচনা করতে গিয়ে সাধারণীকৃত মনোভাব নিলে শেষ পর্যন্ত তার জবাব তাঁকেই দিতে হয়। অনিবার্য কারণেই দিগিন্দ্রচন্দ্রের যে প্রশ্ন উৎপল দত্তের কাছে, অপরপক্ষে সেই প্রশ্ন যুগ থেকে যুগান্তরের। একাংশের হাততালির সাথে সাথে অপরাংশের কুৎসাকেও সোনারতরীতে তুলতে হবে। উৎপল দত্ত ব্যবসায়িক ভিত্তিতেই মিনার্ভায় 'অঙ্গার', 'ফেরারী ফৌজ', 'কল্লোল', 'তিতাস একটি নদীর নাম' প্রভৃতি নাটক দিয়ে ব্যবসায়িক থিয়েটার জগতের টনক নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। কিন্তু সেই উৎপল দত্ত আজ আর নেই। 'অঙ্গার', 'কল্লোল' প্রভৃতি নাটকে তিনি জাতীয় জীবনের যেসব সমস্যা ও ইতিবাচক দিকগুলি দেখিয়েছিলেন, তাঁর এখনকার নাটকে আর সেগুলি তেমন আসছে না। চিন্তার দিক থেকে তিনি এখন একটা বক্রদৃষ্টিতে যেন জীবনে অবলম্বনের মতো positive কোথাও নেই—কেমন একটা অন্ধকার ও শূন্যতা। এই একপেশে দৃষ্টি কিন্তু শিল্পের সর্বজনীন আবেদনের পাশে অন্তরায়। তাঁর 'ব্যারিকেড', 'দুঃস্বপ্নের নগরী' ও 'লেনিন কোথায়' নাটকে শুধু বক্রোক্তির চাবুক মারার সপাৎ সপাৎ আওয়াজ, জীবন ও সমাজের সামগ্রিক বাস্তব সত্যের প্রতি চূড়ান্ত বিমুখতা, ইতিহাসের দ্বান্দ্বিক নিয়ম লঙ্ঘন। তবে তাঁর 'টিনের তলোয়ার' এ দোষ থেকে অনেকখানি মুক্ত। উৎপল দত্তকে তাই বলে বাংলা নাট্য সাহিত্য থেকে উপেক্ষা করা যাবে না। সর্বহারা মানবতাবাদকে তিনি তাঁর নাটকে প্রতিষ্ঠা করেছেন।

নৈরাশ্য নয়, জীবনবাদ

ঊনবিংশ শতকে ''পশ্চিম দেশের অগুস্ত কোঁত-এর (১৭৯৮-৫৭) 'ধ্রুববাদ', কার্ল মার্কস (১৮১৮-৮৩) এর 'দ্বন্দ্বমূলক বস্তুবাদ', চার্লস ডারউইন (১৮০৯-৮২)-এর 'বিবর্তনবাদ' সুদীর্ঘকালীন ভাববাদী দর্শনের ঐতিহ্যের উপর তিনটি প্রচণ্ড আঘাত।''[৭] 'প্রচণ্ড আঘাত' এই

কারণে, আমাদের যে প্রচলিত ধ্যান-ধারণা, তাকে একেবারে সমূলে উৎপাটিত করে দিয়েছিল এই তিনটি মতবাদ। পশ্চিমী দুনিয়া যে বাস্তবতার ছায়ায় আচ্ছন্ন হয়েছিল সেখানে আরো প্রচণ্ড আঘাত হানলো প্রথম মহাযুদ্ধের প্রবল আঘাত। হতভম্ব মানুষ মারণ সুদ্ধভীতি ও নৈরাশ্যের শিকার হলো। এই পটভূমিতে শিল্প-সাহিত্যের জগতে জন্ম নিল ডাডাবাদ, অধিবাস্তববাদ এবং আরো কিছু পরে অস্তিত্ববাদ (অবশ্য এর ঐতিহ্য সুপ্রাচীন) ও অ্যাবসার্ডবাদ। অধিবস্তুববাদের সূত্রপাত অনেক প্রাচীন হলেও অ্যাবসার্ডবাদ কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরবর্তীকালীন সৃষ্টি। বাংলা সাহিত্যে সুররিয়ালিজমের প্রকাশ ঘটেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধকালে, কিন্তু একই সঙ্গে অ্যাবসার্ডবাদের প্রকাশ ঘটেনি, বেশ কিছুদিন অতিবাহিত হওয়ার পরেই নাট্যকার বাদল সরকারের হাতে 'বাকি ইতিহাস', 'এবং ইন্দ্রজিৎ' প্রভৃতি অ্যাবসার্ড নাটক রচিত হয়। বাংলায় নৈরাশ্যবাদের ছাপ কিছুটা প্রবাহিত হয়েছিল জীবনানন্দের কবিতায় 'হে হৃদয়' নামক একটি কবিতায় লিখেছেন—

কেন যাও পৃথিবীর রৌদ্র কোলাহলে
কোথাও পাবে না কিছু
নিখিল বিষের ভোক্তা নীলকণ্ঠ আকাশের নীচে
কেন চলে যেতে চাও মিছে।

কবিতার এই বক্তব্য কোন ব্যক্তিকেই কি আশান্বিত করবে? এ ঘটনা তো চল্লিশোত্তর কালে নয়, তিরিশের দশকে মহামন্দার কাল। লক্ষণীয় নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র কিন্তু সাহিত্যের এই অধিবাস্তববাদ কিংবা অ্যাবসার্ডবাদকে গ্রহণ করেননি; তিনি বলেছেন— 'ঐকত্রিক জীবনবোধকে নস্যাৎ করে দিতে চেয়েছেন জাঁপল সার্ত্র তাঁর অস্তিবাদী দর্শন দিয়ে। 'থিয়েটার অব অ্যাবসার্ড' তত্ত্বে বিশ্বাসী ইউনেস্কোও সোস্যালিস্ট রিয়ালিজমকে চ্যালেঞ্জ করেছেন Immortal বা অনৈতিক ড্রামা লিখে। এ দুজন নাট্যকারই কিন্তু ক্ষয়িষ্ণু বুর্জোয়া চিন্তায় ফিরে যাননি।'[৮] 'চল্লিশের দশকে যুদ্ধের চাপ, মন্বন্তর, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, কালোবাজারি, দ্রব্যমূল্যবৃদ্ধি প্রভৃতি একের পর এক এসে যখন ঔপনিবেশিক শাসন শোষণে শতছিদ্র সমাজজীবন একেবারে ভেঙে পড়তে থাকে তখন তা থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্যে যেখানেই বাঁচার সংগ্রাম দেখা গেছে সেখানেই দৃষ্টি পড়েছে যুগ সচেতন মানবপ্রেমী দেশাত্মবোধে উদ্বুদ্ধ শিল্প-সাহিত্যিকদের। তাঁরা ছুটে গিয়েছেন সেই বিপন্ন মানুষের পাশে, শরিক হয়েছেন তাদের সুখ, দুঃখ ও সংগ্রামের, শুনিয়েছেন জীবনের আশার বাণী, তুলেও ধরেছেন অসহায় মানুষের চরম দুর্দশার মূল কারণ, চিনিয়ে দিয়েছেন জনশত্রু শ্রেণিকে; আর তাদের রক্ষক ও পৃষ্ঠপোষক ঔপনিবেশিক শাসকবর্গকে।'[৯] এর পিছনে কাজ করেছে সঠিক মতাদর্শ। বস্তুগত দিক থেকে সমাজে 'সোস্যালিস্ট রিয়ালিজম' এবং 'ক্রিটিক্যাল রিয়ালিজমের' মধ্যে চিরকালই একধরনের দ্বন্দ্ব বিদ্যমান, এবং সে তার মূল লক্ষ্য থেকে বিচ্যুতও নয়। ভবিষ্যতের জন্য যেখানে প্রগতিশীলতা আছে সেই দূরাগত সার্বভৌম লক্ষ্য সাধনই তার অন্তিম উদ্দেশ্য। দিগিন্দ্রচন্দ্র এই তাত্ত্বিক আলোচনা করতে গিয়ে আমাদের বুঝিয়ে দিয়েছেন যে—'একটি সমাজব্যবস্থাকে মেনে নিলেই তার মধ্যে সমালোচনার বস্তু কিছুই থাকবে না, মার্কসবাদ এমন কথা বলে না। বুর্জোয়া ক্রিটিক্যাল রিয়ালিস্টরা সমালোচনা করেই খালাস, সমাজের পরিবর্তন বা ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁদের কোনো স্পষ্ট ঘোষণা নেই। সেই কারণেই

তাঁদের অনেকে পুনরাবৃত্তির কথা বলেন, কেউ কেউ নিঃসঙ্গতা ও বিচ্ছিন্নতা রোগে ভোগেন; আবার কেউ কেউ অতীতের মধ্যে সমাধান খোঁজেন। সোস্যালিস্ট রিয়ালিস্টরা কেবল সামাজিক অসঙ্গতির সমালোচনা করেই ক্ষান্ত হন না, ইতিহাসের পথ ধরে সমাজ কোন্‌দিকে এগোচ্ছে তার প্রতিও অঙ্গুলি নির্দেশ করেন। শুধু ঘটনাপুঞ্জের ব্যাখ্যাই নয়, রূপান্তরের কথাও তাঁরা বলেন। এই কারণেই সোস্যালিস্ট রিয়েলিস্ট বা 'কমিটেড' লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে নৈরাশ্য, নিঃসঙ্গতা বা বিচ্ছিন্নতাবোধ আসে না—মানুষের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে তাঁরা আশান্বিত।'[১০] সুতরাং প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির বিরুদ্ধে আপোসহীন সংগ্রামে লিপ্ত হতে গেলে, সেক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় কাঠামো সমাজতান্ত্রিক না হলেও আজকের গণতান্ত্রিক চেতনায় সমাজতান্ত্রিক সৃজনশীলতার প্রেরণা যুক্ত হওয়া প্রয়োজন। 'সমাজতান্ত্রিক সৃজনশীলতায় কিন্তু হতাশার স্থান নেই; তাতে আছে জীবন প্রতিষ্ঠার অপ্রতিরোধ্য তাগিদ। নিঃসঙ্গতা বা বিচ্ছিন্নতাবোধের পরিবর্তে তাতে আছে ঐক্যবোধ ও যৌথ কর্মপ্রেরণা। এ অবস্থায় যদি আমরা ক্ষয়িষ্ণু জগতের বিষণ্ণতা, নিঃসঙ্গতা, পৌনঃপুনিকতা, অসম্ভাব্যতা, বিচ্ছিন্নতা প্রভৃতি চিন্তাগুলোকে নাটকে স্থান দিই তবে জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বাস্তব অবস্থাও প্রয়োজন থেকে দূরে সরে যাবে না কি?'[১১] সাহিত্যে প্রযুক্ত মতাদর্শ সম্পর্কে এটাই ছিল দিগিন্দ্রচন্দ্রের মতামত। স্বাধীনতা উত্তরকালে আমরা অনেকটাই তার বিপরীত দিকে ঝুঁকে পড়েছি।

ইতিমধ্যে ততদিনে আমরা স্বাধীন হয়ে গিয়েছি; জীবনে পিছনের ইতিহাসকে স্মরণ রাখার চাইতে তাকে বেশি করে জড়িয়ে ধরতে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম। তা না হলে যে জীবনবাদের ঢেউ তুলে শম্ভু মিত্র বহুরূপীর জয়যাত্রা শুরু করলেন, তিনিই আবার নৈরাশ্যবাদী 'বাকী ইতিহাস' নাটক মঞ্চস্থ করতে গেলেন কেন? সত্যিই এ কাজ মনের ভালো লাগার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছাড়া আর কোন কিছুর সঙ্গেই যুক্তি তর্কে মেলানো যায় না। প্রাবন্ধিকের এই প্রশ্ন তোলার যথেষ্ট যুক্তি রয়েছে, তবু এ কথাও তো মানতে হবে যে সেই সময়ে অ্যাবসার্ড নাটকের অভিনয় তো বেশ জনপ্রিয় হয়েছিল। এ ইতিহাস অস্বীকার করার তো উপায় নেই। গান্ধর্ব ভেঙে নতুন দল তৈরি হল নক্ষত্র। এই দলটিও সেই অর্থে কোনো নতুনত্ব দেখালো না। দিগিন্দ্রচন্দ্র উল্লেখ করেছেন — 'এমন কতগুলি আরোপিত ধ্যানধারণা এসে স্থান করে নিল এঁদের নাটকে যেগুলোর সঙ্গে সামাজিক সত্ত্বা বা অভিজ্ঞতার কোনো সম্পর্ক নেই।' অচিরেই নক্ষত্র গোষ্ঠীকে মালপত্র গোছাতে হল। অন্যদিকে বহুরূপীর দায়িত্ব পরবর্তীকালে তৃপ্তি মিত্রের হাতে আসে; তিনিও সেই বিমূর্ত নাটকের দিকেই ঝুঁকে বাদল সরকারের নাটক বেছে নিলেন। কোন্ নাটক নির্বাচিত হবে সেটা একান্তই থিয়েটার কর্তৃপক্ষের ব্যাপার। কিন্তু প্রাবন্ধিকের প্রশ্ন হল— 'চল্লিশের দশকের যে যুগ চেতনা বাংলা নাটকের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল, এ দেশের ইতিহাস কি সেই যুগটিকে অতিক্রম করে এমন কোনো বিস্ময়কর নতুন যুগে প্রবেশ করেছে যে যুগের দাবীতে গণনাট্য আন্দোলনের ঐতিহ্যকে অনুসরণ করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে?' এ কথা সত্যি দেশ স্বাধীন হলেও আমাদের মধ্যে নানারকম বিশৃঙ্খলা ছিল; দু'শো বছর পরাধীন থেকে স্বাধীন হলে এমনটাই হয়। আমাদের দেশ—দেশবাসীকে একেবারে নৈরাশ্যের দিকে ঠেলে দিয়েছিল এমনটা বোধ হয় কঠোর সমালোচকও বলতে পারবেন না। তাছাড়া স্বাধীনতা-উত্তরকাল নৈরাশ্যের কাল এমন মন্তব্য

কোথাও শুনিনি। তবু থিয়েটারগুলোতে এত নৈরাশ্যবাদী নাটক অভিনীত হওয়াতেই প্রাবন্ধিক প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন। নতুন নতুন গ্রুপথিয়েটারগুলোও তেমনি উঠেপড়ে লাগল।

১৯৫৪ সালে গণনাট্যের দক্ষিণ কলকাতার শাখা 'প্রান্তিক' নাম দিয়ে নাটক মঞ্চস্থ করতে থাকে। প্রথমে বীরু মুখোপাধ্যায়ের 'রাহুমুক্ত' নাটকটি মঞ্চস্থ করেন। কিন্তু পরেই নিবেদিতা দাস, বীরেশ মুখোপাধ্যায়, গোবিন্দ গাঙ্গুলি এঁরা তৈরি করেন। শৌভনিক (১৯৫৭) একে একে মঞ্চস্থ করতে থাকেন 'মা', 'গোরা' ও 'এবং ইন্দ্রজিৎ' লক্ষণীয় এঁরাও কিন্তু নিজেদেরকে একটি তত্ত্বমূলক অভিধায় ধারাবাহিক রাখতে পারল না। নাট্যকার Samual Backet-এর Amorphous Drama-র ধরনে বাংলা নাটকে বাদল সরকারের Absurd নাটক লেখার যে ধারা, জীবনবাদী চেতনায় তিনি তা নস্যাৎ করেছেন। 'স্যামুয়েল বেকেট'-এর Amorphous Drama বা অমূর্ত নাটকের খানিকটা প্রভাব তাতে আছে। কিন্তু বক্তব্যে তিনি জীবনের পৌনঃপুনিকতাবাদী—অর্থাৎ জীবন একই বৃত্তের মধ্যে চক্রাকারে ঘুরছে, কোনো পরিবর্তন নেই, একই অবস্থার পুনরাবৃত্তি। তিনি বলতে চান, জীবনের লক্ষ্য খোঁজা বিড়ম্বনা মাত্র—তাই লক্ষ্যহীন হয়েই জীবনের পথ পরিক্রমা। জীবনকে লক্ষ্যহীন করার অর্থ তাকে নিষ্ক্রিয় করে রাখা। অর্থাৎ দিগিন্দ্রচন্দ্র মনে করেন জীবনবাদী হতে গেলে দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদী চেতনার প্রতি আস্থাশীল হওয়া প্রয়োজন। তিনি এই চেতনায় বিশ্বাসী ছিলেন এবং গভীরভাবে এই তত্ত্ব তিনি অধ্যয়ন ও অনুধাবন করেছিলেন। জীবনে হার না মানা প্রগতিশীল চিন্তায় আস্থাশীল ছিলেন। তার প্রমাণ মেলে দিগিন্দ্রচন্দ্রের নিজের জীবনচর্যার ইতিহাসে— 'দুঃখকে জয় করেই তো মানুষ এগিয়েছে। দুঃখ জয়ের ইতিহাস তো মানব সভ্যতার ইতিবৃত্ত। প্রতিকূলতার কাছে মানুষ যদি আত্মসমর্পণ করত তবে মানবজাতি অবলুপ্ত হয়ে যেত কোন্ স্মরণাতীত কালেই।'[১২] তেমনি জীবনের এই উৎসাহ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছিল শেক্সপীয়রের নাটকে। 'শেক্সপীয়র ছিলেন আশাবাদী নাট্যকার। জীবনে তাঁর গভীর প্রত্যয় ছিল, তাই তিনি হতে পেরেছিলেন জীবনরসিক। ট্রাজেডিতে তিনি শুধু ঘটনার বিবরণ দিয়েই দায় সারেননি। তা করলে যুগ যুগ ধরে শেক্সপীয়রের নাটক মানুষকে উদ্বুদ্ধ করত না। মনবতার জন্যে তীব্র সংগ্রাম আমরা দেখতে পাই তাঁর মহান ট্রাজেডিগুলিতে।'[১৩] নৈরাশ্য নয়, মানবতার সংগ্রাম। দিগিন্দ্রচন্দ্র একস্থানে তাই উল্লেখ করেছেন—'সাহিত্যে নৈরাশ্যবাদ প্রচার না করে মানুষের মনে যদি আশার আলো জ্বেলে তুলতে হয় তবে জনতার এই সংগ্রামশীল সোনামুখটি উজ্জ্বল করে একে সর্বসাধারনের কাছে উপস্থিত করার বিশেষ দায়িত্ব আজকের দিনের শিল্পী ও সাহিত্যিকদের।'[১৪] তিনি সুস্পষ্টভাবেই নৈরাশ্য চিন্তা-ভাবনার বিরোধী এবং আজকের দিনের শিল্পী-সাহিত্যিকদের সেই দায়িত্ববোধের প্রতিই অন্তঃকরণে আস্থাশীল। দিগিন্দ্রচন্দ্র তাঁর নাট্যসাহিত্যে কখনো নৈরাশ্যকে প্রাধান্য দেননি। অপ্রয়োজনে কেউ দিক সেটাও পছন্দ করেননি। খুব ভালো করে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যায় নৈরাশ্য আমাদের জীবনে সমাধানসূত্র তো দেয়ই না বরং উল্টে আমাদেরকে আরো বেশি পরিমাণে নেতিবাচক করে তোলে। তাই '৪০ উত্তরকালের গ্রুপথিয়েটারওয়ালাদেরও নৈরাশ্যবাদী চিন্তার ফলিত প্রয়োগকে তিনি পছন্দ করেননি। অপরপক্ষে দেখা গেল তাঁদের মঞ্চপ্রয়োগে জনতার কথাও উবে গেল। প্রাসঙ্গিকভাবেই দিগিন্দ্রচন্দ্র সেই প্রশ্নটিও তুলে ধরেছেন।

জনতার থিয়েটার কোথায় গেল?

যখন গণনাট্য ও নবনাট্য কর্মীদের একমাত্র আশ্রয়স্থল হয়ে উঠল গ্রুপথিয়েটার—তাতে কী সাধারণ মানুষের ভিড় উপচে পড়ল? তা তো হল না। 'জনতার থিয়েটার বর্জন করে পোশাকি বাবুমার্কা থিয়েটার করে লাভ হল কার? প্রগতিশীল থিয়েটার বলে যা চালানো হল তা থেকে সাধারণ দর্শকরা রইল শতক যোজন দূরে।' এত দ্রুত জনতা বিমুখ হয়ে গেল কী করে? একদিন যে জনতার চৌকাঠ ডিঙানোর অধিকার ছিল না, সে ঢুকে পড়ল একেবারে অন্দরমহলে। এ ঘটনা অনেকেরই হয়তো ভালো লাগেনি, বনেদি বাঙালিবাবুদের তো লাগার কথা নয়। এক সময় শিশির ভাদুড়িও এই গণনাট্য নামক নাট্যধারা পছন্দ হয়নি। প্রাবন্ধিক একত্র উল্লেখ করেছেন — 'শিশিরকুমার মনে করতেন, 'নবান্ন' কম্যুনিস্ট পার্টির প্রচার সাহিত্য ছাড়া আর কিছু নয়। স্বকর্ণে তাঁর এমন উক্তি করতে শুনেছি'[১৫] জনতার আদালতে তখন রায় ঘোষণা হয়ে গিয়েছে বাঁধ ভাঙা উচ্ছ্বাসে এগিয়ে চলতে হবে। শহর, শহরতলিময় তখন গণনাট্যের শাখাগুলি কাঁপিয়ে বেড়াচ্ছে। যেখানে যাচ্ছে অনেক ভিড় হচ্ছে। হঠাৎ করেই এটা হয়নি? মানুষ কীভাবে অত্যাচারিত, তাঁদের মনে জমে থাকা পুঞ্জিভূত ক্ষোভ নাটকে কীভাবে প্রকাশিত হচ্ছে এ ঘটনা তাঁদেরকে আরো বেশি জীবনে উৎসাহী করে তুলেছিল। জীবন তাঁদের তৃষ্ণার্ত ছিল বহু কাল আগে থেকেই কিন্তু তাঁদেরকে জল দান করার মতো মঞ্চও গড়ে ওঠেনি। গণনাট্যের মঞ্চ তাঁদের সেই অপূরণীয় মনোবাসনাকে তুলে ধরেছিল। 'বাংলা সাহিত্যে বাস্তবতা ছিল, কিন্তু সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা বলতে যা বোঝায় তা ছিল না। জীবন তো পরাণকথা নয় সে তো বাস্তব। যেন নাটক দেখতে বসে প্রাত্যহিক জীবনের বিচিত্র অনুভূতি। কী সেই বাস্তবতা? সমাজতান্ত্রিক বাস্তবতা।'[১৬] চল্লিশোত্তর বাংলা সাহিত্যে তার আবির্ভাব ঘটল। যাদের নালিশ কেউ শোনে না, বাঙলা সাহিত্যে শরৎচন্দ্র এসেছিলেন তারই মুখপত্র হয়ে। তারপর এলো অন্য লেখকের দল। কল্লোল, কালি-কলম ও পরিচয় গোষ্ঠী। সাহিত্যে নতুন আবহাওয়া বইতে শুরু করল। বহুমুখী হল তাঁদের অভিযান—মনের গহনতল থেকে শুরু করে মিল কলিয়ারী পর্যন্ত। একধরনের সংস্কার ও মনের জড়তা থেকে তাঁরা তাদের মুক্ত করলেন। কারো কারো লেখায় নির্যাতিত নিপীড়িতদের জন্য যথেষ্ট সমবেদনা প্রকাশ করলেন। কিন্তু শুধু দরদ আর চোখের জলে সমস্যার নিরসন হয় না। তাই আর একদল লেখকের আবির্ভাব হল, যাঁরা আধিব্যাধির ছবি আঁকলেন না, বৈজ্ঞানিক দৃষ্টি দিয়ে সমাজ ও রাষ্ট্রকে দেখলেন। দুর্গতির কারণ যেমন তাঁরা দেখলেন, নিদানও তাঁরা বাতলালেন। তাঁরা রোমান্টিক ভাবুকতা ছেড়ে বাস্তবতার মুখোমুখি দাঁড়ালেন। তাদের লেখায় হাজির হল নতুন মানুষ। কৃষক, শ্রমিক, শোষিত জনসাধারণ। একটু পিছনে ফিরে যদি লক্ষ করা যায়, তবে দেখা যাবে ট্র্যাজেডিহীন অধ্যাত্মবাদের যে ভারতবর্ষীয় ঐতিহ্য এবং পাশ্চাত্যের ট্রাজেডির বাস্তবতার সংমিশ্রণে যে নবধারার সূত্রপাত হল তাতে যেন এক কুহকাবৃত ভারতবর্ষীয় সমাজের মুক্তি ঘটল। মুক্ত হয়েছে বাংলা সাহিত্য, বাংলা নাট্যসাহিত্য; দিগিন্দ্রচন্দ্র বলেছেন— 'একথা অস্বীকার করা যায় না যে — বর্তমান ভারতের সমাজজীবনে অধ্যাত্মনির্ভর জীবনদর্শন ও ঐতিহাসিক বস্তুবাদী জীবনদর্শনের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম অতি তীব্র। কর্মে যদিও বা না হয়, চিন্তায় এ সংঘাতকে কারো এড়িয়ে চলা আজ আর সম্ভব নয়; কারণ শ্রেণীসংগ্রাম উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে

ও তার প্রভাব সমাজ জীবনে ব্যাপকতর হচ্ছে।'[১৭] চল্লিশের ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন যখন দানা বেঁধে উঠেছে বাংলা নাট্য আন্দোলনেরও মূলমন্ত্র হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদ-বিরোধীতা। বাংলা নাটক তার প্রাচীন ঐতিহ্যকে লঙ্ঘন করে নতুন চেতনায় সজ্জিত হয়ে ওঠে; নাটক ব্যাখ্যার সংজ্ঞা বদলে যায় নতুন ব্যাখ্যার প্রয়োজন হয়, দিগিন্দ্রচন্দ্র মনে করেন—'সৃষ্টির অতিক্রমী শক্তি আছে বলেই তার ব্যাখ্যা পরিবর্তিত হতে বাধ্য। যুগ যুগ ধরে এমনই হয়ে আসছে। নন্দনতত্ত্ব বিবর্তনের ইতিহাস এ কথাই বলে।'[১৮] সুতরাং 'নন্দনতত্ত্ব বিবর্তন'-ই ছিল এই সময়কার মূল উপজীব্য। তাছাড়া চর্বিত চর্বণ বিষয়বস্তু মানুষের বিনোদনে নতুন আস্বাদ দিতে পারে না, ফলে সময়ের বিবর্তনের ধারাকেও লেখককে ইতিহাসের সাক্ষী হিসেবে উপস্থাপন করতে হয়। চল্লিশের দশকের বাংলা নাটক সেই ধারাকেই তুলে ধরেছে।

দিগিন্দ্রচন্দ্র তাই মন্তব্য করেন—'চল্লিশের দশকের বাংলা নাট্যজগতে যে নব তরঙ্গের সূত্রপাত হয় তার মূলে ছিল কোনো প্রেরণা। তার মূলে যে ছিল Proletarian Humanism বা সর্বহারার মানবতাবোধ, এ কথা অস্বীকার করলে সত্যের অপলাপ করা হবে।'[১৯] কালে কালে মানুষ দেখতে পেল 'নবনাট্য তরঙ্গের প্রধান প্রাণকেন্দ্ররূপে গড়ে ওঠে ভারতীয় গণনাট্য সংঘ। বলতে দ্বিধা নেই, গণনাট্য সংঘের নাট্যবোধই ছিল তখন জাগ্রত চেতনার মুখ্যস্রোত।... যে সব শিল্পী-সাহিত্যিক Proletarian Humanism-এ বিশ্বাস করেন তাঁদের চেতনার মধ্যে সমাজতান্ত্রিক বোধ স্বাভাবিকভাবেই থাকবে। সমাজতান্ত্রিক বোধ থেকেই রাষ্ট্র, সমাজ ও ব্যক্তির পারস্পরিক সম্পর্ক নবমূল্যায়নের দ্বারা স্পৃহা জাগে। ভারতীয় গণনাট্য সংঘের মধ্যে সেই স্পৃহা যে তীব্রভাবে জেগেছিল এটি ঐতিহাসিক সত্য।'[২০] বর্তমান প্রবন্ধেও প্রাবন্ধিক সেই কথা উল্লেখ করেছেন— 'নবনাট্য আন্দোলনের সূত্র ধরে দেখা দিল দ্বিধা, লক্ষ্য সম্পর্কে সংশয়, আর পথ নিয়ে এত বিভ্রান্তি? গণনাট্য আন্দোলনের শিল্পকর্মে মতভেদ ছিল, কিন্তু মূল চেতনায় ঐক্য থাকায় লক্ষ্য সম্বন্ধে মতান্তর ছিল না। তাই শিল্পকর্মে মতভেদ, যা থাকাই স্বাভাবিক, একসঙ্গে চলার পথে তাই অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায়নি। তর্ক-বিতর্ক হতো, তুমুল ঝড়ও উঠত, কিন্তু ভিতটা শক্ত থাকায় সৌধ বিধ্বস্ত হত না। এক কথায় স্বাতন্ত্র্য থাকলেও ঐক্যের অভাব ছিল না।' অর্থাৎ দিগিন্দ্রচন্দ্র মনে করেন নাটকের ঐতিহাসিক সত্য এবং নতুন মূল্যবোধকে গণনাট্য সংঘ তুলে ধরেছিল। এমনকি পাশাপাশি অন্য যে সমস্ত ক্ষেত্রে নাটকের নতুন ধারা এসেছে তাদের মধ্যেও একই ধারা কাজ করেছিল। কারণ যাকে আমরা বলি বিশ্বচেতনা বা বিশ্বভ্রাতৃত্ববোধ—তার প্রাথমিক স্তর হল সর্বহারা মানবতাবোধ। তাদের প্রতি মমত্ববোধ থেকেই তো আমরা সর্বসম হতে পারবো। কাউকে পিছনে ফেলে কি সর্বসম হওয়া যায়? রবীন্দ্রনাথ তাই বলেছেন—'পশ্চাতে রেখেছ যারে/ সে তোমারে পশ্চাতে টানিছে।' গণনাট্যের নাটকে পশ্চাতের ব্যাপার আর থাকলো না। যারা শুধুমাত্র সাহিত্যের অঙ্গনে স্থান করে নিত ব্রাত্যজন হিসেবে, তারা হয়ে উঠল নায়ক! প্রতিনিধি চরিত্র, কেন্দ্রীয়ভাব বহনকারী চরিত্র। ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবোধ থেকে এল গণচেতনা। শ্রেণিশোষণ মুক্ত সমাজ। যুগ যুগ ধরে যে বঞ্চনার উৎপীড়নে পিছিয়ে পড়া মানুষ শোষণে শাসনে নাজেহাল শেষে ইতিহাসের মমত্ববোধ তাদের উপর বর্ষিত হল। তখন শিল্প সাহিত্যে 'এসেছিল এক বৈপ্লবিক দ্যোতনা।'[২১] শিল্পচেতনায় স্থান করে নিল আদর্শ এবং উদ্দেশ্য। এই

আদর্শ এবং উদ্দেশ্য সাধিত হয় সর্বহারা মানবতাবোধে, যা ছিল উত্তর '৪০ কালের শিল্পচেতনার মূল আশ্রয়। সেই শিল্প সাধনার নামে গণনাট্য পরবর্তীকালে নবনাট্য এবং গ্রুপথিয়েটার গোষ্ঠীরা বিচ্যুত হয়ে পড়ে আপন খেয়ালে চলতে শুরু করল। বিষয়টা এমন দাঁড়ালো—অনতিপূর্বকালে যে ধুন্ধুমার কাণ্ড ঘটে গিয়েছে তার সাথে তাঁদের কোনো যোগই থাকল না। নাট্যমঞ্চগুলো গোষ্ঠী নির্ভর হয়ে উঠল। প্রাবন্ধিক বলেছেন— 'যেসব নাট্যকার কোনো গোষ্ঠীভুক্ত হতে পারছে না বা বিশেষ কোনো গোষ্ঠীর চাহিদা মাফিক নাটক লিখতে চাইছেন না, তাঁদের নাটক অভিনয় করার দল নেই। তার অর্থ স্বাধীন চিন্তায় কেউ নাটক লিখলেও তার মঞ্চায়নের পথ প্রায় রুদ্ধ। হয় কোনো গোষ্ঠীর ফরমাশে লিখতে হবে, নয়তো ব্যবসায়িক মঞ্চমালিকদের চাহিদাপূরণের জন্য কলম ধরতে হবে।' এ দিগিন্দ্রচন্দ্রের আক্ষেপ। কিছু করার নেই। আমাদের মতো তৃতীয় বিশ্বের দেশ যদি স্বাধীনতা প্রাপ্তির সাথে সাথে জনতাকে বিশ্রুত করে—তবে সেই লক্ষ্যের অভিমুখ কি আমাদের উপলব্ধি করতে অসুবিধা হয় না।

সব সাহিত্যিক নিজেকে এইভাবে বিকিয়ে দিতে যাবেন না। দিগিন্দ্রচন্দ্র আশাহত হয়ে এ কথা বললেও সময়ের পরিবর্তন তাঁকে মানতেই হবে। যুগের পরিপ্রেক্ষিতে যেমন বাংলা নাটকে নতুন মাত্রা (new dimention) সংযোজিত হয়েছে; সমস্ত যুগেই স্রষ্টারাই তেমনি তাঁদের বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে বিরাজমান। যে কোনো শিল্পীই তাঁর চিন্তা-চেতনা, আদর্শ নিয়ে শিল্পের সাধনা করে থাকেন, থাকবেন। সেটাই তাঁর শিল্পরাজ্য; তার বাইরে তিনি বিচরণ করতে চান না। অন্যথায় তাঁর মর্জি। কিংবা তাঁর নিজের চেতনা সাম্রাজ্য। মাপনী চোঙ-এ তা পরিমাপ করা যায় না। সময়ের সাথে, ব্যক্তির সাথে মেলাতে গেলে সেখানে ফারাক হবে। সুতরাং পরিবর্তনটা অনিবার্য, মতাদর্শ নয়। যুগ থেকে যুগান্তরে এমনটাই হয়ে আসছে; কারোর ইচ্ছেতেই সেটা রক্ষিত হয়নি। তাহলে 'তিন দশকের নাট্যসমীক্ষা' প্রক্ষিপ্ত হত। লেখককে এই প্রবন্ধ লিখতে হত না।

তথ্যসূত্র

১। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *গণনাট্য আন্দোলনের বিকৃত ব্যাখ্যা*, শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ, মার্চ ১৯৮৬, পৃ. ৪৭

২। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাট্যচিন্তা*, শিল্পজিজ্ঞাসা, ইম্প্রেসন সিণ্ডিকেট, নির্মল সাহিত্য, ৭ শ্যামচরণ দে স্ট্রীট, কলকাতা, পৃ. ৫৪

৩। দর্শন চৌধুরী, *গণনাট্য আন্দোলন*, অনুষ্টুপ, ২ নবীন কুণ্ডু লেন, কল-৯, পরিমার্জিত ও পরিবর্ধিত তৃতীয় সংস্করণ, ২০০৯

৪। ব্রাত্য বসু, *নাটক সমগ্র*, এই নাট্য সমগ্রের প্রেক্ষাপট অংশ রচনা করেছেন প্রখ্যাত সাহিত্যিক সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়। উক্ত মন্তব্য সেখানেই তিনি করেছেন।

৫। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *শিল্পে একাকিত্ববাদ ও সমষ্টিবাদ*, শারদীয়া কাঁচা লেখা, ১৩৮৫

৬। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, সাহিত্যের বাস্তবতা ও শব্দবিচার, শারদীয় কোরক সাহিত্য পত্রিকা, ১৯৮৫, পৃ. ৩৯

৭। বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, সাহিত্য বিবেক, *দে'জ পাবলিশিং*, পৃ. ৫৩
৮। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ণ (সূত্র-২)
৯। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *গণনাট্য আন্দোলন ও তার উত্তরাধিকার*, শারদীয় কালান্তর, ১৩৮৮
১০। দীনবন্ধু পুরস্কার ও নাটক-যাত্রার পুরস্কার প্রদান অনুষ্ঠানে নাট্যকার, কালান্তর, ৪ এপ্রিল, ১৯৮৬, পৃ. ৬৫
১১। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *চলিষ্ণু জগতে ক্ষয়িষ্ণু নাট্যচিন্তা*, সংহতি, প্রথম বর্ষ, প্রথম সংকলন, ১৩৭৮, পৃ. ৮
১২। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *জীবন রসিক শেক্সপীয়র*, ইস্পাত, সাহিত্য সংখ্যা, ১৯৬০
১৩। তদেব
১৪। 'মশাল' নাটকের নিবেদন অংশ।
১৫। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *নাটকের জাত বিচার*, শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ, প্রথম প্রকাশ, মার্চ, ১৯৮৬, পৃ. ২১
১৬। অমল গুহ, *শতবর্ষের আলোকে নাট্যকার দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়*, গণনাট্য : সেপ্টেম্বর-অক্টোবর, ২০০৭, পৃ. ৪০
১৭। *প্রাগুক্ত*, পৃ. ১৭০ (সূত্র-২)
১৮। দিগিন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, *সর্বহারার মানবতা*, শ্রেষ্ঠ নাট্য প্রবন্ধ, নবার্ক, ডি সি ৯/৪ শাস্ত্রীবাগান, দেশবন্ধুনগর, কলকাতা-৫৯, পৃ. ৫৯
১৯। প্রাগুক্ত, পৃ. ট (সূত্র-২)
২০। প্রাগুক্ত, পৃ. ঠ (সূত্র-২)
২১। প্রাগুক্ত, পৃ. ড (সূত্র-২)

* Foot note ছাড়াও কিছু কিছু question-এর উদ্ধৃতিগুলি রয়েছে; সেগুলো সংশ্লিষ্ট প্রবন্ধ থেকে নেওয়া।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসে নারী

তাপস রায়*

বাংলা কথাসাহিত্যে স্বল্প পরিচিত শিল্পী জগদীশ গুপ্ত (১৮৮৬-১৯৫৭)। অথচ কল্লোল ভাবধারার ও সমকালের বলিষ্ঠ সাহিত্যিক। কল্লোলগোষ্ঠী যে আদর্শকে সামনেরেখে সাহিত্য সাধনায় নিয়োজিত হয় জগদীশ গুপ্ত সেই ভাবধারার একনিষ্ঠ সাধক। তিনি সাহিত্যে নরনারীর চরিত্র অঙ্কন করেছেন বস্তু নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে। তিনি সামাজিক সংস্কারকে প্রাধান্য দেননি। মানুষকে যেন সেই ভাবেই দেখানোর চেষ্টা করেছেন। মানুষ যে আর পাঁচটি প্রাণী, তাদের জীবনে চাহিদার অন্তরালে অন্যান্য প্রাণীদের মতোই কিছু আদিমতা আছে সেই দিকটিকেও দেখিয়েছেন। সামাজিক সভ্যতার প্রলেপ দিয়ে নরনারীকে অন্যভাবে দেখা হয়। বলা চলে অন্যভাবে দেখতে চাই। জগদীশ গুপ্ত ঐ দুর্বল চোখ দিয়ে নরনারীকে দেখেননি। ফলে চেনাজানা মানুষগুলিকে তার সাহিত্যে অচেনা মনে হয়। যেহেতু চরিত্রে প্রলেপ দেননি, একেবারে এক্স-রে প্লেটের মতো তাদের তুলে এনেছেন। তাই আমাদের রুচিবোধের কাছে তাদের জায়গা দিতে কুণ্ঠা জাগে। ফ্রয়েডীয় মনোবিকলন ভাবনার সঙ্গে তাঁর সৃষ্ট চরিত্রের মেল বন্ধন ঘটিয়েছেন। কিন্তু তাঁর সৃষ্ট উপন্যাসে নারীদের মধ্যে ফ্রয়েডীয় মনোভাবনা থাকলেও ছোটোগল্পের মতো নয়। বরং লেখক সেই দিকটিকে দেখিয়েছেন—যেখানে নারীরা মানুষ; তাদের বিচার-বিবেচনা, প্রতিবাদী সত্ত্বা, সম্মানবোধ আছে। সব মিলিয়ে জগদীশ-উপন্যাসে নারী রক্ত-মাংসের গতিশীল প্রাণী হয়ে উঠেছে। তিনি যেন প্রচলিত ধ্যান-ধারণা থেকে নারীকে মুক্ত করে মানব জীবন স্রোতে আনতে চেয়েছেন। সৎ-অসৎ—এই প্রশ্ন এক্ষেত্রে বিচার্য নয়, যতটা বিচার্য অধিকারের। যতটা বিচার্য জীবন জিজ্ঞাসার।

পুরুষতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় বহু যুগ থেকেই সমাজ পুরুষের ইচ্ছাকেই প্রাধান্য দিয়ে আসছে। ভালো-মন্দ নির্ভর করে পুরুষের অভিরুচির কাছে। এমনকি আদিম জৈবিক প্রবৃত্তির চরিত্র সমাজের কাছে জড়ালো ধাক্কা দিল। ফলে প্রচলিত নীতিবোধ ভাঙতে শুরু করল। সমস্ত বিষয়ে নারীরও যে অধিকার আছে তা বলতে চাইলেন। প্রত্যেকেই মননে গঠনে বাঙালি নারী চরিত্র। তা সত্ত্বেও কেউ ভেতো বাঙালি নয়। পরিস্থিতির স্বীকার হলেও ভাগ্যের দোষ দিয়ে কেউ বসে থাকেনি। বরং দুর্ভাগ্যকে সঙ্গে নিয়েই নিজেদের মেলে ধরতে চেয়েছেন। বাঙালি মেয়ের মতোই প্রেম-ভালোবাসা, স্বামী-পুত্র, আত্মীয়-স্বজন নিয়ে সুখেই থাকতে চায়। কিন্তু পরিস্থিতি তাদের সেই বাসনাকে ছিন্নভিন্ন করে দিয়ে অন্যরকম জীবনের মধ্যে অনুপ্রবেশ করতে বাধ্য করেছে। কেউ পরিবর্তিত জীবনে থাকতে চায়নি। খারাপ জায়গা থেকে বেরিয়ে আসতে চাইছে, তা সত্ত্বেও সমাজ তাদেরকে বারবার মনে করিয়ে দিচ্ছে যে তারা খারাপ। ফলে অসুস্থ জীবনই অনেক ক্ষেত্রে তাদের সঙ্গী হয়ে যাচ্ছে। জগদীশ গুপ্ত তাঁর উপন্যাসে এই দিকগুলি দেখানোর

* অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, ইন্দাস মহাবিদ্যালয়।

পাশাপাশি তাদের বেরিয়ে আসার লড়াইকেও তুলে ধরেছেন। সেকালে নারীদের মধ্যে এই জাতীয় ভাব দেখানো লেখকের সাহসিকতার পরিচয়।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসের সংখ্যা ষোল। এই ষোলটি উপন্যাসের মধ্যে বেশ কয়েকটির নাট্যরূপ দিয়েছেন অথবা ছোটোগল্প আকারে কেমন হয় তার পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। তাঁর উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ নারীরা হল—

লঘুগুরু - টুকি, উত্তম; অসাধু সিধার্থ - অজয়া; মহিষী - জ্যোতি; তাতল সৈকত - শরত; নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ - প্রফুল্ল।

'লঘুগুরু' উপন্যাসের দুই গুরুত্বপূর্ণ নারী হল উত্তম ও টুকি। তথাকথিত সুস্থ সমাজব্যবস্থার নিরিখে উত্তম অসৎ চরিত্র। সে প্রাক্তন বারাঙ্গনা। শুধু এই পরিচিতি দিয়ে উত্তমকে বিচার করলে তার প্রতি অবিচার হবে। পূর্বে গণিকা থাকলেও বর্তমানে সে বিশ্বম্ভরের স্ত্রী। স্ত্রী আর গণিকার মধ্যে মূলগত যে বহু পার্থক্য উত্তম চরিত্রের মধ্য দিয়ে তা স্পষ্ট লক্ষ করা যায়। উত্তম নারী। তার মধ্যেও আছে নারীর স্বাভাবিক প্রবৃত্তি। দ্বিতীয় অধ্যায়ে উত্তমের মধ্যে তা দেখা যায়। উত্তম তার বিগত কৃতকর্ম ভুলে নতুনভাবে জীবন গড়তে চায়। সেই জন্যে সে বেছে নিয়েছে সতীনের মেয়ে টুকিকে। নানা দিক দিয়ে টুকিকে আদর্শ নারীরূপে প্রতিষ্ঠা করতে চায়। সৎযুক্তি দিয়ে সকল বিষয়ে পারদর্শী করতে চায়। এই পথে মূল বাধা প্রতিবেশীরা। তারা নানাভাবে উত্তমের চরিত্র নিয়ে টুকির নিকট রহস্যজনক মন্তব্য করতে থাকে। ফলে টুকি কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিভ্রান্ত হতে থাকে। কিন্তু উত্তমের ভালোবাসার কাছে টুকির মনের সব সন্দেহ দূর হয়ে যায়। এখানেই উত্তম চরিত্রের গুরুত্ব। এমনকি সৎ-মা উত্তম, এই বিষয়টি টুকিকে বুঝতেই দেয় না। সংসারের রান্না-বান্না স্বামীকে কীভাবে শ্রদ্ধা-আদর-যত্ন করবে সব ব্যাপারে উপযুক্ত করে তুলে বিশ্বম্ভরকে মেয়ের জন্যে ভালো পাত্রের অনুসন্ধান করতে বলে। বলা চলে উত্তম ভালো মায়ের দায়িত্ব পালন করতে থাকে। কোনো ঘটনায় মনে হয়নি টুকির প্রতি খারাপ ব্যবহার করছে। পরিস্থিতি উত্তমকে ঐ পথে চালিত করেছিল ঠিকই কিন্তু উত্তমের রক্তে আছে নারীর স্বাভাবিক বাৎসল্যরস আর সংসারী ভাব এবং সুরক্ষিত জীবন নিয়েই সে বাঁচতে চায়।

টুকি এই উপন্যাসে গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র। সে পরিস্থিতির স্বীকার। মা মরা মেয়ে উত্তমের উপস্থিতিতে মা না থাকার যন্ত্রণা বুঝতে পারেনি। মায়ের উপযুক্ত তালিমে সর্ব বিষয়ে পারদর্শী নারীরূপেই গড়ে ওঠে। ভাগ্যের বিড়ম্বনা ঘটতে থাকে তার জন্য পাত্র সন্ধান করতে গিয়ে। টুকি বড়ো হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই বিয়ের জন্য পাত্র খুঁজতে থাকে। মায়ের পুরানো জীবনের কথা জানার পর, পছন্দ হওয়া সত্ত্বেও বিয়ে ভেঙে যায়। টুকির রূপ ও বাবার টাকা থাকা সত্ত্বেও কোথাও বিয়ে ঠিক করতে পারেনি তার বাবা। শেষ পর্যন্ত দেখতে সুসভ্য পরিতোষের সঙ্গে বিয়ে হয় টুকির। ভাগ্যের পরিহাসে লম্পটই কপালে জোটে। পরিতোষের বাড়িতে আছে এক রক্ষিতা। কিছু দিনের মধ্যেই টুকি তা বুঝতে পারে। তারা টাকা উপায়ের জন্য সবকিছু করতে পারে। লোক ঠকানো ও দেহ বিক্রি সব কিছুতেই তারা অভ্যস্ত। তাদের অভিপ্রায় টুকিকেও দেহব্যবসাতে নামানো। আর প্রচুর টাকা উপার্জন করা। টুকি সব বুঝতে পারে। পরিতোষের ঘরে থাকা মেয়েটিই

অনুচক্রিকা। সংসার করার স্বপ্ন ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যায়। এদের সঙ্গে প্রতিবাদ করে যখন কোনো ফল হবে না বুঝতে পারে তখন টুকি অন্যভাবেই প্রতিবাদী হয়ে ওঠে। দেহ যখন বিক্রিই করতে হবে তখন তৃতীয় জন কেন? আমি দেহ বিক্রি করে নিজেই টাকা উপার্জন করবো। টুকির ভাষায় ''এ কাজ যদি করতে হয়, তবে আমি আপনাকে দেব দেহ, আপনি দেবেন টাকা। মাঝখানে ওরা কে?'' উপন্যাসটির বিশেষত্ব এইখানেই। টুকির এই প্রতিবাদে নিজের চারিত্রিক উন্নতি ঘটেনি ঠিকই, কিছু ধাপ্পাবাজ মানুষের অসৎ উপার্জনের পথকে বন্ধ করতে পেরেছে। এছাড়া তার আর অন্য কোনো উপায়ও ছিল না। কেননা সে জানে মাও সৎপথে বাঁচতে চেয়েছিল কিন্তু সমাজ সেই পথকে রুদ্ধ করে দিয়েছে। তার ক্ষেত্রেও তা ঘটবে তাই এই ধরনের প্রতিবাদ ছাড়া উপায় নেই। আসলে এই সমাজে পুরুষরা চিরকাল নারীকে নিজেদের অধিকারে রাখতে চায়। টুকি সেই অভিপ্রায়কে অনেকটাই ধাক্কা দিল। জগদীশ গুপ্ত একদিকে নারীর সংগ্রাম অন্যদিকে মানুষ যে পরিস্থিতির স্বীকার হয় তাই বলতে চাইলেন এই উপন্যাসে।

'অসাধু সিদ্ধার্থ' উপন্যাসের অজয়া সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়ে। চাল-চলন রুচিবোধের মধ্যে ধ্রুপদী ভাব লক্ষ করা যায়। একজন নারীর প্রেম-প্রীতি-স্নেহ-সম্মানের মধ্যে দিয়ে পরিবারের সঙ্গে আবদ্ধ থাকতে চায়। অজয়াও সেই প্রকৃতির নারী। পারিবারিক ভালোবাসার মধ্যেই সে বড়ো হয়। বাড়ির প্রত্যেক সদস্যই তাকে ভালোবাসায় ভরিয়ে রাখে। ভাগ্যের পরিহাসে সিদ্ধার্থ ওরফে নটবরের প্রেমে আবদ্ধ হয়। সিদ্ধার্থের যে পরিচয় ও ব্যক্তিত্ব দেখে অজয়া তার নিকট হৃদয়ের ভালোবাসার যে অর্ঘ্য অর্পণ করেছে তা ভুল নয়। বহু গুণের অধিকারী এই জাতীয় পুরুষকে যেকোনো নারীই জীবন সঙ্গী রূপে পেতে চায়। অজয়াও তাই চেয়েছিল। এই চাওয়া ভুল নয়, খুবই স্বাভাবিক। তাই সিদ্ধার্থের প্রেমের আহ্বানে অজয়া সাড়া দেয়। রাগ-অনুরাগের মধ্যে দিয়েই তাদের প্রেম পরিণতির দিকে এগিয়ে যায়। অজয়ার দাদা রজত বোনের এই প্রেমের জন্যে কোনো আপত্তি নেই কিন্তু, একটা ভয় আছে সিদ্ধার্থকে নিয়ে। মানুষটা প্রকৃতই ভালো তো? কারণ নটবরের চাল-চলনে বেশ কিছু অসঙ্গতি দেখা যায়। তবু বোনের ভালোবাসার গভীরতা দেখে অনেক সময় সন্দেহের ক্ষেত্র থেকে সরে আসতে হয়।

অজয়া ভালবাসাকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায়। ভালোবাসার মধ্যে কোনো ছলনাকে সে প্রশ্রয় দেয় না। ভালোবাসা যে জীবনের গুরুত্বপূর্ণ উপলব্ধি। সেযুগে একজন নারী প্রেমের মধ্যে দিয়ে পরিণয় সূত্রে আবদ্ধ হবে এবং পরিবারেরও আপত্তি নেই এই ঘটনা বিরল, সেই কারণে যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ। কিন্তু বিয়ের প্রাক্ মুহূর্তে বাড়ির লোকেরা জানতে পারে এই সিদ্ধার্থ আসল সিদ্ধার্থ নয়। সে আসলে 'নটবর'। ঠক, অসৎ ব্যক্তি। সিদ্ধার্থের নাম ও গুণগুলি আত্মসাৎ করে সে অজয়ার হৃদয়ে এসেছে। অজয়া সব কিছু জানার পর কোনো খারাপ বাক্য ব্যবহার না করে চোখের জল ফেলতে ফেলতে বাড়ির ভিতরে চলে যায়। আর পাঁচজন নারীর মতো ভাগ্যের দোষ সে দেয়নি। সে বলেনি যাকে ভালোবেসেছি খারাপ হলেও তাকেই বিয়ে করবো। হৃদয় যন্ত্রণায় ভেঙে পড়লেও ঠক প্রেমিকের জন্য তার হৃদয়ে আর কোনো জায়গা নেই। এ ও এক তীব্র প্রতিবাদ। নারীর হৃদয় শুধু কোমল নয় অন্যায়কেও সে ঘৃণা করতে পারে, অজয়া তারই

জ্বলন্ত প্রমাণ। ভালোবাসাকে সে কলুষিত করতে চায় না। তাই খুব সহজেই নটবরকে চলে যাওয়ার পথ তৈরি করে দেয়। সততাই জীবনের শেষ কথা, কোনো কিছুর বিনিময়ে তাকে বিসর্জন দেওয়া যায় না। জগদীশ গুপ্ত অজয়ার মধ্য দিয়ে তা দেখালেন। অজয়া নাম সত্যিই সার্থক। সে ভালোবাসাকে জৈবিক তাড়নার জায়গায় নিয়ে যায়নি। ভালোবাসা যে স্বর্গীয় অনুভব তাকে পেতে গেলে পবিত্র মন থাকতে হয়, না হলে হারাতে হয়। তারপর হাজার চেষ্টা করলেও ফিরে পাওয়া যায় না, অজয়া তাই বুঝিয়ে দিল। প্রেম হল সততা, বিশ্বাস ও নিষ্ঠার ত্রয়ী সমন্বয়—অজয়া তাই বলতে চাইল।

'মহিষী' উপন্যাসের অন্যতম নারী চরিত্র 'জ্যোতি'। প্রকৃত অর্থেই মহিষী। রূপ তার নেই। গুণে সে অতুলনীয়। সে ভালোবাসতে জানে আবার পরিস্থিতির মোকাবিলাও করতে পারে। ভালোবাসার মানুষের জন্য সে নিজের জীবনকে উৎসর্গ করতে পারে। উপন্যাসটির মূল চরিত্রগুলি হল— রজতকিশোর, রত্নময়ী, অশোক ও জ্যোতি। রজতকিশোরের টাকার লোভ প্রচুর। তিন ছেলে অশোকের বিয়ে দিয়ে প্রচুর অর্থ উপার্জন করতে চায়। তার জন্য পাত্রী খারাপ হলেও ক্ষতি নেই। প্রয়োজন শুধু পাত্রীর বাবার প্রচুর টাকা থাকতে হবে। অন্য দিকে ছেলের পছন্দ সুন্দর পাত্রী। পিতার কূট-কৌশলে অশোকের শেষ পর্যন্ত বিয়ে হয় কালো মেয়ে জ্যোতির সঙ্গে। অশোক-জ্যোতির দাম্পত্য সম্পর্কের chemistry ভালোমতোই জমেছিল। কালো বউ হওয়ার জন্য তার কোনো ক্ষোভ ছিল না। কিন্তু বন্ধু মারফৎ বাবার চক্রান্তের কথা জানার পর জ্যোতির প্রতি ভালোবাসা চলে যায়। অশোকের কাছে সব পরিষ্কার হয়ে যায় যে, বাবা টাকার লোভে কালো মেয়ের সঙ্গে বিয়ে দিয়েছে। এবং জ্যোতি সম্পর্কে যে সব গুণের কথা বলেছে তা আসলে টাকা লাভের ছলনা ছিল। সবকিছু জানার সঙ্গে সঙ্গেই অশোক নানা অছিলায় জ্যোতিকে অসম্মান ও পর্যদুস্ত করতে থাকে। শেষ পর্যন্ত জ্যোতিকে বাবার বাড়ি চলে যেতে হয়।

জ্যোতি ছিল ব্যক্তিত্বময়ী এক নারী। সে জানত তার রূপের কথা। তার অসুন্দরের জন্য তার কোনো হাত ছিল না। কিন্তু মানুষের গুণকে প্রচণ্ড পরিশ্রম করে কিছুটা বাড়ানো যায়। জ্যোতি নিজের হাতের ক্ষমতাকে বাড়ানোর জন্য পরিশ্রম করতে থাকলো। শেষ পর্যন্ত নিজেকে মহিষী করে তুললো। জ্যোতি মনে মনে ঠিক করে ফেললো হাজার কষ্ট হলেও নিজের স্বামীর মনের সন্তুষ্টির জন্য আবার সুন্দরী পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে দেবে। অবশেষে তাই হলো। অশোকের সুন্দরী পাত্রীর সঙ্গে বিয়ে ঠিক হলো। পুরো মানসিক যন্ত্রণাকে চেপে রেখে অশোক ও নন্দরানীর সংসারকে পত্তন করে দিয়ে জ্যোতি রাজকীয়ভাবে বিদায় নিল। নারী জাগরণের এক অধ্যায় রচনা করলেন জগদীশ গুপ্ত। নারী শুধু কাঁদতেই জানে না সে যে সমাজকেও বদলে দিতে পারে জ্যোতি তার বাস্তব উদাহরণ। একদিকে পিতাপুত্রের মানসিক সংঘাত অন্যদিকে জ্যোতির আত্মত্যাগ উপন্যাসটিকে নাটকীয় গতি দিয়েছে। মানুষ সবই পারে। যেমন হাসাতে পারে, কাঁদাতে পারে আবার মহান ত্যাগও করতে পারে। আসলে সবার মূলে আছে সমসাময়িক পরিস্থিতি।

'নিদ্রিত কুম্ভকর্ণ' উপন্যাসের গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র শশধর ও তার স্ত্রী প্রফুল্ল। শশধরকে কেন্দ্র করে উপন্যাসটি আবর্তিত হলেও প্রফুল্লই পাঠক মনকে জয় করেছে। বলবান বীররূপে শশধরের এলাকায় বেশ সুখ্যাতি আছে। সবার বিশ্বাস শশধর যেকোনো বিপদ থেকে তার সাহস ও ক্ষমতা দিয়ে সকলকে উদ্ধার করবে। একদিন রাত্রে তার পাড়াতে এক বিপদ ঘটে। পাশের বাড়ির

নকুলের বাড়িতে প্রচণ্ড চিৎকার ও লাঠির ঠোকাঠুকির আওয়াজ শোনা যেতে থাকে। নকুলের বিধবা মেয়ে বিপদে পড়েছে। তাকে জোর করে কয়েকজন দুশ্চরিত্র লোক তুলে নিয়ে চলে যাচ্ছে একথা শুনতে পেয়েও শশধর নীরব থাকে। নকুলের ভয়ংকর বিপদের জন্য শশধরকে সবাই দোষারোপ করতে থাকে। কারণ শশধর সাহসী ও ক্ষমতাধারী রূপে গ্রামে পরিচিত ছিল তা সকলেই জানে। এই বিপদের দিনে শশধরের বেরিয়ে না আসাটা স্বার্থপর ও কাপুরুষতারই লক্ষণ বলে এখন সকলেই মনে করে। এই ধারণা তার স্ত্রী প্রফুল্লেরও হয়। লেখক প্রফুল্লের মধ্য দিয়ে সমাজ গঠনের নতুন দিক দেখালেন। মেয়েদের সম্মান কেমন হওয়া উচিত যেমন দেখালেন তেমনি নারীর গর্ব কিসে তাও তুলে ধরলেন। প্রফুল্ল রাগে-ধিক্কারে-ঘৃণায় তার স্বামীকে বলে—তুমি কাপুরুষ। জীবনের হাজারো ঝুঁকি থাকলেও নকুলের বিধবা বোনকে রক্ষা করার জন্য তোমার ঝাঁপানো উচিত ছিল। তুমি মারা গেলেও ছেলে মেয়েরা গর্ব করতো তোমার বীরত্বের জন্য। এক অসহায় মেয়ের আত্মমর্যাদা রক্ষা করতে গিয়ে বাবা শহীদ হয়েছে এই ভেবে। এই ভাবনাতেই প্রফুল্ল হয়ে উঠেছে মহিষী।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'জীবিত ও মৃত' গল্পে 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই'। জগদীশ গুপ্তের 'তাতল সৈকত' উপন্যাসে শরতও মরে প্রমাণ করে সে কলঙ্কিত নয়। লেখক এই উপন্যাসেরও মানুষ যে পরিস্থিতির শিকার হয় আবার দেখালেন। মানুষ নিজেও জানে না সময় তাকে কোন পথে নিয়ে যায়। মানুষ পরচর্চা ভালোবাসে। অন্যেরা খারাপ নিজের ভালো এটা মানুষের জৈবিক সত্তা। এই উপন্যাসে সেই দিকটিও লেখক অত্যন্ত মনোগ্রাহী করে তুলে ধরেছেন। আর এই সত্ত্বার জন্য কত মানুষ যে বিপর্যস্ত ও বিধ্বস্ত হয় তার নিদর্শন ভুরি ভুরি। অথচ মানুষ একটু সচেতন হলেই নিরপেক্ষ বিচার করতে পারে। কুৎসা, বাজে রটনা কীভাবে জীবনকে গতিহীন করে দেয় এই উপন্যাস পড়লে তা অনুভব করা যায়। তিনটি অধ্যায়ে ও কুড়িটি পরিচ্ছেদে বিন্যস্ত করে লেখক উপন্যাসটির বিষয়-বিন্যাস করেছেন। শরত, বিদুর ও তাদের পুত্র শান্তকে নিয়ে তাদের সুখের সংসার। এক সময়ের বনেদি পরিবার। বিদূরের পিতার মৃত্যুর পর তাদের পারিবারিক অবস্থার অবনতি ঘটে। বিদুর হাজারো চেষ্টা করেও পূর্বের অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেনি। তার আশা পুত্র শান্ত তা ফিরিয়ে আনতে পারবে। এই নিয়ে তার অনেক আশা-স্বপ্ন। ভাগ্যের পরিহাসে হঠাৎ বিদূরের মৃত্যু হয়। শরত দিশেহারা হয়ে ওঠে। শান্ত অনেকটা অভিভাবকশূন্য হয়ে পড়ে। শরত অল্পবয়সী সুন্দরী বিধবা রমণী। ফলে বহু দুষ্ট লোকের নজর পড়ে। শরত শত প্রলোভন থাকা সত্ত্বেও সেই ফাঁদে পা দেয়নি। কিন্তু মনোহর দত্ত বলে এক মহাজন একদিন শরতের বাড়িতে কুপ্রস্তাব নিয়ে আসে। শরত তাকে লোহার রড দিয়ে মেরে তাড়িয়ে দেয়। এই ঘটনা একদিন শরতের জীবনে কাল হয়ে আসে। রটে যায় শরতের নিশ্চয় দোষ ছিল। বাংলায় একটি প্রচলিত প্রবাদ আছে যা রটে তা কিছুটা বটে। এক্ষেত্রে এই প্রবাদের কোনো সত্যতা নেই। তা সত্ত্বেও শরতকে মিথ্যা রটনা জড়িয়ে ধরে। স্বামীহারা শরত হাজার দুঃখের মধ্যেও পুত্র শান্তকে নিয়ে সুখেই ছিল। তাদের জীবনে হঠাৎ আসে রণজিৎ অরফে জিতু। সে মাতৃহারা। শরত তাকে পুত্রের মতোই ভালোবাসতে থাকে। জিতু ধীরে ধীরে তাদের সংসারে

দায়িত্বশীল সদস্য হয়ে ওঠে। জিতু একদিন স্থির করে পালিত মা ও ভাই শান্তকে নিয়ে গ্রামের বাড়ি যাবে। কিছুদিন সেখানেই থাকবে। এবং গ্রামের বাড়িতে তারা আসে। গ্রামীণ জীবন চিত্রে পরচর্চা এক ভয়ংকর বদ অভ্যাস। রণজিৎ তার বাড়িতে একটি অল্প বয়সী মেয়েকে নিয়ে এসেছে এ নিয়ে গ্রামে ছেলে-মেয়ে, যুবক-যুবতী, বুড়ো-বুড়ি প্রত্যেকের কৌতূহলের শেষ নেই। তারা নানাভাবে খুঁজতে থাকে মেয়েটির খারাপ দিক। যেকোনো উপায়ে তারা প্রতিষ্ঠা করবেই মেয়েটি অসৎ। সেকালে গ্রামে কেউ অসামাজিক কাজ করলে সেই পরিবারকে এক ঘরে করে দেওয়া হতো। এই শাস্তির বিধানকে সামনে রেখে গ্রামের মোড়লরা জানতে আসে শরতের সামগ্রিক পরিচয়। জিতু মোড়লদের আগমনের কারণ পালিত মাকে সরাসরি না বললেও আবভাবে বুঝিয়ে দিতে থাকে। সেই সঙ্গে আচারে-ইঙ্গিতে শরতের প্রকৃত চরিত্র কেমন জানতে চায়। লোকজনের প্রতি মুহূর্তের রটনা জিতুর মনেও সন্দেহ ঢুকিয়ে দেয়। সব বুঝতে পেরে শরত চুপ হয়ে যায়। পুত্রদের কাছে তার সততা আছে কিনা এই প্রশ্নের সত্যতার উত্তর দিতে হবে। বলা চলে সে কলঙ্কিনী কিনা তার জবাব দিতে হবে। এই প্রশ্ন বা কথা শরতের ব্যক্তিত্বে আঘাত হানে। যা রটেছে সেখান থেকে বের হওয়ার কোনো রাস্তা নেই। পুত্রের এই প্রশ্ন তাকে সারা জীবন তাড়া করবে। আত্মগ্লাঘায় জীবন ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠবে। তার চেয়ে জীবন শেষ করে দেওয়াই শ্রেয়। তাই শরত আত্মহত্যা করে প্রামাণ দিল সে কলঙ্কিনী নয়। লেখক বারে বারে বলতে চেয়েছেন নারীর মান-মর্যাদার দিকটি। শরতের মধ্যেও সেই দিকটি দেখালেন।

জগদীশ গুপ্তের উপন্যাসগুলি কাহিনির চেয়ে চরিত্র প্রধান। বহু নারী চরিত্র তার উপন্যাসে উঠে এসেছে। নারীরা কতটা পরিস্থিতির দাস তাই তুলে ধরলেন। সমাজকে সুসভ্য করতে গেলে নারীর অধিকারকে প্রাধান্য দিতে হবে। শুধু নারীকে পুরুষের অধিকারে রাখলেই সমাজ শুদ্ধ হবে না। নারীকে তার মতামত প্রকাশের স্বাধীনতা দিতে হবে। নারীকেও বুঝতে হবে নিজেদের অধিকার সম্পর্কে। নচেৎ নারীরা প্রকৃত মর্যাদা পাবে না। বিভিন্ন নারী চরিত্রগুলির মধ্য দিয়ে জগদীশ গুপ্ত যেন এই কথাগুলিই বলতে চাইলেন।

উল্লেখযোগ্য সহায়ক গ্রন্থ

১। জগদীশ গুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, প্রথম খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড কলককাতা, ১লা বৈশাখ, ১৩৮৫।
২। জগদীশ গুপ্ত, জগদীশ গুপ্ত রচনাবলী, দ্বিতীয় খণ্ড, গ্রন্থালয় প্রাইভেট লিমিটেড, কলককাতা, ১লা বৈশাখ, ১৩৬৫।
৩। জগদীশ গুপ্ত, হীরেন চট্টোপাধ্যায়, সাহিত্য একাডেমি, কলকাতা, ২০০৯।
৪। জগদীশ গুপ্ত, জীবন ও সাহিত্য, ড. সমরেশ মজুমদার (সম্পা.), পুস্তক বিপণী, কলকাতা, জুলাই, ১৯৯৩।
৫। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, জীবিত ও মৃত, গল্পগুচ্ছ, রামকৃষ্ণ পুস্তকালয়, কলকাতা, ২০০৬।

সেকালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজের কন্যাপণ প্রথা ও পরিণতি

রমণীমোহন বর্মা*

সেকালের পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে কঠোরভাবে কন্যাপণ ছিল। কন্যাপক্ষের দাবি অনুসারে টাকা না দিতে পেরে অর্থাভাবী বিবাহযোগ্য ছেলেরা বিয়েথা সম্পন্ন করতে পারত না। গরিব বাবা-মায়ের ছেলের বিয়ে দেওয়ার ইচ্ছে পূরণের লক্ষ্যে ভাবী পুত্রবধূর নামে বাস্তুভিটের একটা অংশ ও কিছু নগদ অর্থ দিয়ে তবেই বিয়ের পর্ব সম্পন্ন করা সম্ভব হত। সমাজের প্রথা হিসেবে বিয়ে করাটা ছিল অনেকটা বাধ্যতামূলক। বাস্তুভিটে যার নেই, বাবা-মা নেই সেখানে গরিবের ভগবান ছিলেন গ্রামের ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই। এই ধনাঢ্য ব্যক্তিরাই চাকর-বাকর দাসেদের বিয়ে দিয়েই ক্ষান্ত থাকেননি, নিজ ভূমি দিয়ে তাদের পুনর্বাসনের ব্যবস্থাও করতেন। এতদ্ভিন্ন যাদের কোনো গতি ছিল না তাদের কেউ কেউ প্রৌঢ়ত্বে উপস্থিত হত। বিয়ে না করে থাকা এমন প্রৌঢ়দের বলা হত 'ঢ্যানা'। প্রৌঢ় বা ততোধিক বয়সে যারা বিয়েথা সম্পন্ন করতো এক্ষেত্রে দেখা যেত স্ত্রীর পরিপূর্ণ যৌবনে স্বামী যারপরনাই বার্ধক্যে উপস্থিত হত এবং অনেকেই মৃত্যুবরণও করত। স্ত্রীর পরিণতিতে যৌবনাত্তীর্ণা হল বিধবা। সমাজের দারিদ্র্যপীড়িত অংশে সে সময় কন্যাপণ ও বাল্যবিবাহ প্রথা অটুট থাকায় নারীর পতিহীনতার সংখ্যা দ্রুত বেড়ে যায়। এই কন্যাপণ ও বাল্যবিবাহ প্রথা বহুকাল পূর্বের। অনুমান করা হয়েছে ভাস্কর বর্মার রাজত্বের পূর্বকাল থেকে এই নিয়মের গতিশীলতার বৃদ্ধি ঘটে। এই সময় দ্রাবিড় জনসমাজ সেকালে উত্তরবঙ্গের জনপদগুলিতে অবস্থান করছিল। এই সমাজের কন্যাপণ প্রথার প্রভাব পড়ে রাজবংশী সমাজেও। যাইহোক, আমরা প্রায় সহস্রাধিক বছর অতিক্রান্ত হওয়ার পরও কন্যাপণ ধূলিস্যাৎ করা গেলেও বাল্যবিবাহকে রোধ করা যায়নি। একজন যৌবনাত্তীর্ণা অথচ তাকে পতিহীনতায় ভুগতে হয়। তবে এই বিধবা যদি সৌন্দর্য্যের অধিকারিণী হয় তো কথাই নেই, তাই আধুনিক লোকসংগীত ভাওয়াইয়া গানের একটি দৃষ্টান্ত তুলে ধরা যেতে পারে :

> বুড়াটা মাসে মাসে ব্রত পালে / হরির নামে মালা যপে, / সেই বুড়াটা বিধবা নিবার চায়, /
> বড় বেটা উঠিয়া কয়/ ওকনা কথা হবার নয়/ ওই বিধবা মোরে নেওয়া খায়।

সংস্কৃতিবান সমাজে বিধবাকে বিয়ে করাটা নিন্দনীয় ছিল। যদিও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ১৮৫৬ সালে বিধবাবিবাহ আইন চালু করার ক্ষেত্রে বিরাট অবদান রেখে যান। যাহোক, এমন বিধবাকে বিবাহ বহির্ভূত অবস্থায় ঘরে তুললে এবং বিধবাটি স্বয়ং স্বেচ্ছায় ব্যক্তির ঘরে প্রবেশ করলে

---

* লোকসংস্কৃতি গবেষক, সম্পাদক, কালবৈশাখী পত্রিকা।

তখন বিধবাকে বলবে 'ডাউয়ানী' আর পুরুষটাকে বলবে 'ডাউসা'। যদি ঐ বিধবা ব্রাহ্মণের মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে স্বামী গ্রহণ করে তখন তাকে বলে 'সাঙ্গানী' আর পুরুষটাকে বলে 'সাঙ্গানা'। স্বামী থাকতে যে নারী ভিন্ন পুরুষের হাত ধরে গমন করে তখন তাকে বলা হয় 'ঢ্যামনী' আর পুরুষটাকে বলে 'ঢ্যামনা'। ৬০-৭০ বছর বয়সী পুরুষের সঙ্গে ১২-১৩ বছরের নাবালিকার বিয়েথা হলে তখনকার দিনে বিপথগামীতা অধিক পরিমাণে ঘটত। পরিণতিস্বরূপ দেশে দেখা দিত ঢ্যামনী প্রথার বিস্তৃতি।

সেকালের বাল্যবিবাহ ও কন্যাপণের পরিণতিস্বরূপ দেখা যায়—একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি চাইলে গরিব ঘরের যেকোন নাবালিকাকে বিয়ে করতে পারতেন। ভাগ্যান্বেষিণীরা বর্ষীয়ান ধনাঢ্যের সঙ্গে দাম্পত্য জীবন লাভ করলেও অধিকাংশ ক্ষেত্রে এরা হতো বিধবা। এই অংশের নারীদের বহুবিবাহ ঘটেছিল। এক্ষেত্রে সমাজপতিরা এসব নারীদের 'সাতভাতারী' বলে নিন্দনীয় ডেজিকনেশনে দিতেন। অনেকটা মহাভারত বর্ণিত মাধবীর কাহিনির মতো। সংক্ষেপে এই কাহিনিটা বলা যেতে পারে। বিশ্বামিত্রের শিষ্য মহর্ষি গালব গুরুদক্ষিণার জন্য সনির্বন্ধ অনুরোধ জানালে ক্রুদ্ধ হয়ে কর্ণে বহির্ভাগ শ্যামবর্ণ বিশিষ্ট আটশত শ্বেতঅশ্ব গুরুদক্ষিণা চেয়ে বসলেন। মহর্ষি গালব নিরুপায় হয়ে বিষয়টির বর্ণনা দিয়ে চন্দ্রবংশীয় রাজা যযাতির দ্বারস্থ হলেন। কিন্তু রাজা যযাতি মহর্ষি গালবকে অক্ষমতা জানিয়ে বিনয়ের সঙ্গে বললেন— মহর্ষি আমার কোনো ঘোড়া নাই, আছে শুধু একমাত্র কন্যা মাধবী। আপনি আমার কন্যাকে নিয়ে যান। এই কন্যার বিনিময়ে অন্য রাজার নিকট অশ্ব সংগ্রহ করুন। মহর্ষি গালব মাধবীকে নিয়ে প্রথমে রাজা হর্যশ্বর নিকট গেলেন। এই রাজার দুইশত অশ্বের বেশি ছিল না। এই দুইশত অশ্বের বিনিময়ে একটি মাত্র পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার সুযোগ পেলেন। এভাবেই কাশীরাজ দিবোদাস, তৃতীয় ক্ষেত্রে ভোজনগরপতি উশীনরের নিকট গেলে পরপর তিনজনই একটি মাত্র পুত্র সন্তান জন্ম দেওয়ার সুযোগ নিয়ে দুইশত করে এক একজন অশ্ব দান করলেন। অশ্বের সংখ্যা দাঁড়ালো মোট ছয়শত। গালব শত চেষ্টা করেও আর দুইশত অশ্ব সংগ্রহ করতে পারলেন না। তিনি বেদনাহত হয়ে সঙ্গে মাধবীকে নিয়ে হাজির হলেন বিশ্বামিত্রের সমীপে এবং বললেন, ওহে গুরুদেব গুরুদক্ষিণার মাত্র তিন-চতুর্থাংশ অশ্ব সংগ্রহ করতে পেরেছি, আপনি অবশিষ্ট দুইশত অশ্বের জন্য মাধবীর প্রতিগ্রহ করে এর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান উৎপাদন করুন। বিশ্বামিত্র এমত প্রস্তাবে সম্মত হয়ে আনন্দে আটখানা হয়ে গেলেন এবং বললেন, ওরে ভক্তপ্রাণ শিষ্য, একাজ সর্বাগ্রে করলে তো উক্ত তিন পুত্রের পিতা আমি হতে পারতাম! তুমি কি ভুলটাই না করেছো! যাহোক তিনি মাধবীর গর্ভে একটি পুত্র সন্তান উৎপাদন করে মাধবীকে গালবের হাতে ফেরত দিলেন। গালব মাধবীকে নিয়ে যযাতির নিকট তার কন্যা ফেরত দেওয়ার উদ্দেশে গমন করলেন। এই কাহিনি থেকে বোঝা যায় প্রাচীন ভারতে দ্বারগ্রহণ ও পুত্র উৎপাদনের সুব্যবস্থা ছিল না। মনুসংহিতায় দ্বাদশ প্রকার পুত্রের উল্লেখ আছে যথাক্রমে — ঔরস, ক্ষেত্রজ, দত্তক, কৃত্রিম, গূঢ়োৎপন্ন, অপবিদ্ধ, কানীন, সহোঢ়, ক্রীত, স্বয়ংদত্ত ও শৌদ্র।

পৌণ্ড্রক্ষত্রিয় সমাজে মনুসংহিতায় উল্লিখিত দ্বাদশ পুত্রের অনেকগুলি হদিশ পাওয়া যায়। এখানে তার কয়েকটি উল্লেখ করা গেল— (১) কাইনের মাইয়ার ছাওয়া—কানীন, অপভ্রংশে কাইন, (২) ধোকর ব্যাটা—কৃত্রিম, বিবাহ বহির্ভূত প্রথায় স্ত্রীর পূর্ববিবাহের স্বামীর ঔরসজাত সন্তান, (৩) পোষনাই—ক্রীত, বেওয়ারিশ মায়ের সন্তান প্রতিপালন করবার দায়িত্বগ্রহণকারী দম্পতি পিতা-মাতা হিসাবে পরিচিত, (৪) কিনাছাওয়া—ক্রয়, অপভ্রংশ 'কিনা' অর্থে 'কেনা' ছাওয়া। অর্থাভাবী বাবা-মায়ের কাছে থেকে অর্থের বিনিময়ে সংগ্রহীত সন্তান, (৫) দত্তক—একজনের পুত্র আরেকজনকে দান করে। এই দত্তকপুত্রের প্রাপ্তিতে কোন অর্থব্যয়ের নিয়ম নেই। অনেক সময় পুত্রহীন বাবা-মায়েরা আত্মীয়-স্বজনের সন্তানাদি দত্তক গ্রহণ করে থাকে। (৬) ঔরস—নিজের ধর্মপত্নীর গর্ভে উৎপাদিত সন্তান। স্বামীকে আড়ালে রেখে অভিসারে গিয়ে প্রেমিকের সঙ্গে রতিক্রিয়ায় উৎপাদিত সন্তান। পুরুষ সন্তান উৎপাদনে অক্ষম থাকলে পুত্রাকাঙ্ক্ষীনী মা বিকল্প ব্যবস্থা গ্রহণ করে সন্তান লাভ করে থাকে। বিষয়টি গোপনীয়ভাবে সম্পন্ন হলেও সামাজিকগণের পর্যবেক্ষণে তা ধরা পড়ে। সেকালের সন্তান উৎপাদনে বৈচিত্র্য দেখা যায় তেমন বৈচিত্র্য দেখা যায় বিবাহেও। লোকসংস্কৃতির আঙিনায় এসবের বিলুপ্তি না ঘটলেও ঘটেছে তার বিবর্তন।

কানীন অপভ্রংশে কাইন, বিবাহের সমার্থক শব্দ। শাস্ত্র বহির্ভূত অবস্থায় কোনো পুরুষ কোনো বিধবা ও স্বামী পরিত্যক্তাকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করলে, এই নারীর গর্ভে সন্তান উৎপাদিত হলে তাকে বলা হয়—কাইনের মাইয়ার ছাওয়া। যেমন সূর্যের অনুগ্রহে জাত কুন্তীর কানীন পুত্র কর্ণ। মাইয়া অর্থ স্ত্রী ও ছাওয়া অর্থ পুত্র। কাইনের মাইয়াকে কেন্দ্র করে লোকসংগীত রচিত হয়েছে—

কাইনের মাইয়ার আদর ভারী/ সদায় যায় মোর বাপের বাড়ী/ হাত ধরিয়া কতই বোঝাইম তোরে...

বিয়ের স্ত্রী প্রয়াত হলে ব্যক্তি কাইন করে কিন্তু কাইনের স্ত্রীর আর কাজে মন বসে না। সে সদা সর্বদা বাপের বাড়ির যাওয়ার উদ্দেশে ব্যস্ত হয়ে পড়ে। স্ত্রীর এই বর্হিমুখীনতা পুরুষটির সংসারে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়। এক্ষেত্রে হাত ধরে অনুরোধ জানালেও সে নাছোড়বান্দা। এমতাবস্থায় স্বামীর যে করুণ অবস্থা এই লোকগানে তা ফুটে উঠেছে।

সেকালের উত্তরবঙ্গের ভাস্করবর্মার রাজত্বের পূর্বকাল থেকে দ্রাবিড়গোষ্ঠী অবস্থান লক্ষিত হয়। কোচবিহার তথা উত্তরবঙ্গের ওরাঁও দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীর অবস্থান বিদ্যমান। মধ্যযুগে দ্রাবিড় ব্রাহ্মণ সমাজে সামন্তরাজ প্রদত্ত ভূমিভোগের অধিকারী হত। দৃষ্টান্তে বলা যেতে পারে, দহ শব্দটি দ্রাবিড়ীয় ভাষাগোষ্ঠীর শব্দ। দহ মানে নিচু জলাভূমি। যেমন - দিনহাটা মহকুমার কয়েকটি জনপদ কোয়ালীদহ, গীতালদহ, হকদহ, আদাবাড়ি প্রভৃতি। কাওয়ালীরা একশ্রেণির ব্রাহ্মণ। অনেকটা গায়কের ভূমিকা নিয়ে গৃহস্থের ঘরে ঘরে গোয়ালঘরের দরজায় বসে শ্লোক আওড়াবে আর সঙ্গে বাজাবে ঘন্টি। অতঃপর দক্ষিণা মাগন করবে। এই কাওয়ালীর (গীদাল বা গায়ক) অপভ্রংশে কোয়ালী। জনৈক কোয়ালীর অধিকৃত দহ দৃষ্ট হওয়ায় বর্তমান জনপদটির নাম

হয়েছে কাওয়ালীর দহ থেকে কোয়ালীদহ, এভাবেই পরিচিতি লাভ করেছে গীতালদহ, হকদহ আদাবাড়ী। আমরা এতদিনে সহস্রাধিক বছর অতিক্রম করেছি। আজ উপার্জনক্ষম যুবকদের পিছনে পিছনে ছুটছে বিবাহযোগ্যরা। যে পুরুষটি পণ দিয়ে একটি নারীকে স্ত্রী হিসেবে প্রাপ্তিলাভ করেছিল আজ সে নারী আর তার অভিভাবকগণ বাস্তুভিটে বিক্রি করে দিয়ে বরপণ রক্ষা করছে, হয়েছে সর্বস্বান্ত। এই বরপণ প্রথার গতি চলমান সময়ের সঙ্গে সে আজ উর্দ্ধগতিতে ভ্রাম্যমান।

তথ্যসূত্র

১। রমণীমোহন বর্মা, শব্দতত্ত্বে কোচবিহারের গ্রামনাম (যন্ত্রস্থ)।

২। ড. দীনেশচন্দ্র সরকার, সংস্কৃতির ইতিহাসের প্রসঙ্গ, ৩০, ৩১, ৩২, পৃ. ১৪।

৩। সুকুমার সেন, ভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ১৩৬

৪। রমণীমোহন বর্মা, উত্তরের লোকসংস্কৃতিতে রাজবংশী লোকভাষার ইতিবৃত্ত, পৃ. ৮৩

কৃতজ্ঞতা স্বীকার:

ড. আনন্দগোপাল ঘোষ, ড. দীপক কুমার রায়, বেলারাণী বর্মা, পর্বানন্দ দাস

বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কার

সোমা দত্ত*

পরম করুণাময়, অনন্যসাধারণ পণ্ডিত, শিক্ষাসংস্কারক ও সমাজসংস্কারক বিদ্যাসাগর গোঁড়া ব্রাহ্মণ সন্তান হয়েও সামাজিক কুপ্রথা ও কুসংস্কারের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালিয়ে ছিলেন। তাঁর সমগ্র জীবনসাধনা আভাসিত হয়েছে তাঁর রচনাগুলিতে।

বিদ্যাসাগরের সমাজসংস্কারমূলক রচনাগুলির মধ্যে 'বিধবাবিবাহ চলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব' (১ম ও ২য় খণ্ড-১৮৫৫) এবং 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার' (১ম-১৮৭১, ২য়-১৮৭৩) যুক্তিপ্রধান রচনা এবং প্রচার ব্যাপারটি স্বভাবতই তার মূলে ছিল। আর সেই কারণেই বিদ্যাসাগর রঙ্গ এবং কঠিন ব্যঙ্গবিদ্রূপের অস্ত্র গ্রহণ করে 'অতি অল্প হইল', 'আবার অতি অল্প হইল', 'ব্রজবিলাস', 'রত্নপরীক্ষা' প্রভৃতি বেনামী রচনাগুলি লিখেছিলেন। এসব রচনা যে বিদ্যাসাগরেরই তা কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, হরপ্রসাদ শাস্ত্রী প্রমুখ সমকালীনেরা জানতেন।

বিদ্যাসাগর উনিশ শতকের মানুষ। উনিশ শতকের বাঙালি সমাজ-সংস্কারকদের অন্যতম লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—অবহেলিত, বঞ্চিত নারী জাতির প্রতি মমত্ববোধ ও নারীজাতির কল্যাণের প্রতি বিশেষ আগ্রহ। তাই বিদ্যাসাগরের সামাজিক সংস্কারের মূলে ছিল নারীত্বের অবমাননার বিরুদ্ধে, তাদের বন্ধন মুক্তির আকাঙ্ক্ষা। এই আকাঙ্ক্ষারই প্রকাশ দেখা যায়—বিধবাবিবাহ প্রবর্তন, বাল্যবিবাহ ও বহুবিবাহ প্রথার নিবারণে এবং স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের প্রচেষ্টায়। সমাজসচেতন মানুষ বিদ্যাসাগর সামাজিক কুরীতির বিরুদ্ধে বিতর্ক ও আলোচনা এবং লেখনী ও কর্মের মাধ্যমে প্রবল জন-জাগরণের সৃষ্টি করেন। বহুবিবাহ ও বাল্যবৈধব্য— দুই সামাজিক কুপ্রথার প্রভাবে সেকালের বাঙালি সমাজে সংকট ও অবনতি প্রবল আকার ধারণ করেছিল। বিদ্যাসাগর তাই সমাজ-সংস্কারের আবশ্যকতা বোধ করেন এবং সেই সূত্রেই সংস্কারকর্মে আত্মনিয়োগ করেন।

বাঙালি হিন্দুসমাজে প্রচলিত প্রথা বাল্যবিবাহ ও কৌলীন্য প্রথা বন্ধ করার, বিধবা বিবাহ ও স্ত্রীশিক্ষা আরম্ভ করার জন্য তিনি দাবি জানান। বিভিন্ন বিদ্বৎসভায় ও নানা পত্রপত্রিকায় এ সকল বিষয়ে আলোচনা হতে থাকে। বিদ্যাসাগর এইরকম কিছু পত্রপত্রিকা ও বিদ্বৎসভার সঙ্গে ছাত্রজীবন থেকেই যুক্ত ছিলেন। যেমন 'সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা', 'তত্ত্ববোধিনী সভা', 'সর্বশুভকরী সভা' বা 'বেথুন সোসাইটি'। সাধারণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা ডিরোজিও শিষ্যদের আগ্রহে ১৮৩৮-এ স্থাপিত হয়। বিদ্যাসাগর ছিলেন এর অন্যতম সভ্য। এই সভায় যাতায়াত কালেই তিনি ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর তরুণদের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলেন। ইয়ং বেঙ্গল গোষ্ঠীর বিশেষ বিরোধিতা

* অধ্যাপিকা, বাংলা বিভাগ, মহিলা মহাবিদ্যালয়, কাশী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়।

ছিল সামাজিক কুসংস্কারের প্রতি— 'জ্ঞানান্বেষণ', 'বেঙ্গল স্পেকটেটর' প্রভৃতি তাঁদের পত্রপত্রিকায় সংস্কার আন্দোলনকে তাঁরা জিইয়ে রাখেন। 'তত্ত্ববোধিনী সভা' (১৮৩১) ও 'তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা' (১৮৪১) ইয়ংবেঙ্গলের উগ্রতাকে বর্জন করে সাধারণভাবে এই বিশ-ত্রিশ বৎসরের সংস্কারের আবহাওয়াকে আরও সবল করে তোলে। বিদ্যাসাগর, অক্ষয়কুমার দত্ত প্রমুখ ছিলেন এ সভার সক্রিয় সদস্য। ১৮৪২-এর এপ্রিল মাসে নব্যবঙ্গের মুখপত্র 'বেঙ্গল স্পেক্‌টেটর'-এ বিধবার পুর্নবিবাহ সম্পর্কিত এবং অক্ষয়কুমার দত্ত সম্পাদিত 'বিদ্যাদর্শনে' বহুবিবাহের বিরুদ্ধে নানাপ্রবন্ধ প্রকাশিত হয়।

সভাসমিতিগুলিতে সামাজিক কুপ্রথা সম্পর্কিত আলোচনা ও সাময়িক পত্রিকাগুলিতে সামাজিক সমস্যামূলক আলোচনা হতে থাকে। ১৮০৫ সালে 'সর্বশুভকরী সভা'র মুখপত্র 'সর্বশুভকরী' পত্রিকা প্রকাশিত হয়। সম্পাদক মতিলাল চট্টোপাধ্যায় পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় জানান, কৌলিন্য ব্যবস্থা, বাল্যবিবাহ প্রভৃতি অতি বিষম প্রচলিত নিয়ম দূর করে সমাজের মঙ্গল করাই পত্রিকার মূল উদ্দেশ্য। এই উদ্দেশ্যের দ্বারা প্রেরিত হয়ে বিদ্যাসাগর পত্রিকার প্রথম সংখ্যায় 'বাল্যবিবাহের দোষ' (১৮৫০) নামে একটি প্রবন্ধ প্রকাশ করেন। এটি তাঁর সমাজ সংস্কারমূলক প্রথম রচনা। এর ঐতিহাসিক মূল্য অনস্বীকার্য। যদিও বিদ্যাসাগর ও অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মধ্যে অনেকেই বাল্যবিবাহের শিকার হয়েছিলেন। তবে তাঁরা অনুভব করেছিলেন যে এ প্রথা সমর্থনযোগ্য নয়। বিদ্যাসাগর মনে করতেন, বাল্যবিবাহ 'অতিশয় নির্দয় ও নৃশংসের কর্ম'। তিনি নিজের মেয়েরও বাল্যকালে বিবাহ দেননি। এছাড়াও ঈশ্বর গুপ্ত, কাশীপ্রসাদ ঘোষ প্রমুখ রক্ষণশীল ব্যক্তিরাও সেসময় বাল্যবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিলেন। 'সংবাদ প্রভাকর', 'বিবিধার্থ সংগ্রহ' প্রভৃতি পত্রিকায় তাঁরা এবিষয়ে আলোচনা অব্যাহত রেখেছিলেন।

সাধারণ মেয়েদের পক্ষে ব্রহ্মচর্য জীবন অতিবাহিত করা যে সম্ভব নয়, তা সেকালে অনেকেই অনুভব করেছিলেন। তাই সতীদাহ প্রথা নিবারিত হওয়ার পর থেকেই বাঙালি সমাজে বিধবাবিবাহ সম্পর্কিত আলোচনা গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। ১৮৭৩ সালে কোলকাতার কয়েকজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরা বিধবাবিবাহ প্রবর্তনে আগ্রহী হন। 'সম্বাদ ভাস্কর' পত্রিকার সম্পাদক গৌরীশঙ্কর বিশ্বাস বিধবাবিবাহ যে প্রচলিত হবেই, সে বিষয়ে দৃঢ় বিশ্বাস প্রকাশ করেছিলেন। তিনি প্রাচীন হিন্দুদের নিকট বিধবাবিবাহ প্রচলনের জন্য আহ্বান জানান। সেকালের সাধারণ মানুষের কাছে বিধবাবিবাহ ছিল নিতান্তই অশাস্ত্রীয় ব্যাপার। গৌরীশঙ্করের আহ্বানে সর্বপ্রথম সাড়া দিলেন ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। অবশেষে তাঁর অক্লান্ত প্রচেষ্টায় ১৮৫৩ সালে হিন্দুশাস্ত্র সম্মত বিধবাবিবাহকে স্বীকার করে নেওয়া হয়। দেশবাসীর লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ঝুঁকি মাথায় নিয়ে কিছু বাঙালি যুবকও বিধবাবিবাহে এগিয়ে আসে।

১৮৫৫ সালে প্রকাশিত 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'-এর সাহায্যে বিদ্যাসাগর বিধবাবিবাহকে শাস্ত্রসম্মত রূপে প্রমাণিত করেন। তাঁর বক্তব্য ঠিক নয় দেখিয়ে কিছু পুস্তিকা প্রকাশিত হয়। যার উত্তরস্বরূপ বিদ্যাসাগর লেখেন, 'বিধবাবিবাহ প্রচলিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক দ্বিতীয় সম্বাদ'। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে, সমাজ ও রাষ্ট্রের

সমর্থন ব্যতীত বিধবাবিবাহ প্রচলিত করা সম্ভব নয়। তাই তিনি 'বিধবাবিবাহ আইন' পাস করার জন্য ৯৮৭ জনের সাক্ষরসহ ভারত সরকারের নিকট আবেদন পাঠান। ১৯৫৬ সালে আইনটি পাস হয়। তবে বাঙালি সমাজে এ আইন তেমনভাবে গৃহীত হয়নি। যদিও বিদ্যাসাগরের আবেদনটি ছিল একান্তভাবে মানবিক।

সতীদাহ প্রথা, বিধবাবিবাহ প্রভৃতি সমস্যার পাশে তখনকার বাংলার সমাজ জীবনে আর একটি সমস্যা দেখা দিয়েছিল — বহুবিবাহ প্রথা। উনিশ শতকের আরম্ভ থেকেই বাঙালি সমাজ বহুবিবাহের কুফল সম্পর্কে সচেতন ছিল তা বোঝা যায়, তিরিশের দশকে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সে বিষয়ে লেখালেখি ও বাদানুবাদ থেকে। বিদ্যাসাগর আইনের সাহায্যে বহুবিবাহ প্রথা বন্ধ করার জন্য ভারত সরকারের নিকট ১৮৫৫ সালে আবেদন পত্র পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু ১৮৫৭ সালে সিপাহী বিদ্রোহের ফলে ভারত সরকারের 'বহুবিবাহ নিবারণ বিষয়ে আর মনোযোগ দিবার অবকাশ রহিল না' (বিদ্যাসাগর)। এরপর ১৮৬৬ সালে বিদ্যাসাগরের আগ্রহ ও উৎসাহে বহুবিবাহবিরোধী আইনের জন্য সরকারের কাছে পুনর্বার আবেদন পাঠানো হয়। কারণ, বিদ্যাসাগর জানতেন 'আইনের সাহায্য ছাড়া বহুবিবাহ বন্ধ করা যাবে না'। তাই বহু প্রতিকূলতা সত্ত্বেও তিনি সংস্কার প্রয়াস ত্যাগ করেননি। এমন সময় 'সনাতন ধর্মরক্ষিনী সভা' এ বিষয়ে আগ্রহ দেখালে বিদ্যাসাগর তাঁদের অভিনন্দন জানান। এই সময়ই প্রকাশিত হয় তাঁর 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক প্রস্তাব'। এই গ্রন্থটির দ্বারা তিনি প্রমাণ করেন যে বহুবিবাহ নিতান্ত অশাস্ত্রীয় ও অমানবিক। তাঁর পূর্বে এক্ষেত্রে এত ব্যাপক প্রচেষ্টা আর কেউ করেননি। এই বইটি বাঙালি সমাজে আলোড়ন সৃষ্টি করে ও এর প্রতিবাদে বইও লেখা হয়। সেই প্রতিবাদের উত্তরে বিদ্যাসাগর লেখেন, 'বহুবিবাহ রহিত হওয়া উচিত কিনা এতদ্বিষয়ক বিচার — দ্বিতীয় পুস্তক'। এই গ্রন্থে তারানাথ তর্কবাচস্পতি বিশেষভাবে তাঁর আক্রমণের শিকার হয়েছেন। যিনি প্রথম দিকে বহুবিবাহ নিবারণের সমর্থনে আবেদন পত্রে স্বাক্ষর করে পরে মত বদলান।

একথা সত্য যে বিদ্যাসাগর শত প্রচেষ্টা করেও আইনের সাহায্যে বহুবিবাহপ্রথা দূর করতে পারেননি। তবে এই ব্যাপারে তিনি যে জনচেতনা জাগিয়ে তোলার চেষ্টা করেছেন তা স্বীকার করতেই হয়। তেমনই স্বীকার করতে হয় স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের গোড়ায় তাঁর অবদান। স্ত্রীশিক্ষার ক্ষেত্রে ইয়ংবেঙ্গল ও রামমোহনপন্থীদের মতে কোনো পার্থক্য ছিল না। স্ত্রীশিক্ষা প্রসারে সংস্কৃত কলেজের ছাত্র ও শিক্ষকদের ভূমিকাও উল্লেখযোগ্য। ১৮৪৯-এ বেথুন সাহেবের প্রচেষ্টায় ঘরের মেয়েদের জন্য বালিকা বিদ্যালয় খোলা হয়। এই বালিকা বিদ্যালয়কে এগিয়ে নিয়ে যেতে বিদ্যাসাগর সর্বশক্তি নিয়ে এগিয়ে গেছেন। বেথুনের পাশে বিদ্যাসাগরের সঙ্গে ছিলেন মদনমোহন। অন্যদিকে ছিলেন ইয়ংবেঙ্গল দলের রামগোপাল ও দক্ষিণারঞ্জন। বেথুনের মৃত্যুর পরও বিদ্যাসাগর এই বিদ্যালয়ের দায়িত্ব নিষ্ঠাপূর্বক পালন করেছেন।

বিদ্যাসাগর গ্রামবাংলায়ও স্ত্রীশিক্ষা বিস্তারের চেষ্টা করেন। তাঁরই উদ্যোগ ও প্রচেষ্টার ফলে বাংলার বিভিন্ন গ্রামাঞ্চলেও বেশ কয়েকটি বালিকা বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। তিনি প্রায় ছয় মাসের মধ্যে ৩৫টির মতো বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু বিদ্যালয়গুলি প্রতিষ্ঠার ব্যাপারে কোনো

প্রকার লিখিত সরকারি নির্দেশ না থাকায়, শিক্ষা বিভাগের নির্দেশক আর্থিক সাহায্যের ক্ষেত্রে বিরোধীতা করেন। পরে বিদ্যাসাগরকে আর্থিক দায়ভার থেকে মুক্ত করলেও সরকার বিদ্যালয়গুলির জন্য স্থায়ী সাহায্য দিতে স্বীকৃত হননি। এত বাধা সত্তেও স্ত্রীশিক্ষা সম্পর্কে বিদ্যাসাগরের উৎসাহ বিন্দুমাত্র নিস্তেজ হয়নি।

ভারতবর্ষের শিক্ষাব্যবস্থায়, সমাজজীবনে বিদ্যাসাগরের অকৃপণ অবদানের কথা সকলেই স্বীকার করে থাকেন। তাঁর মত হৃদয়বান মানুষ দুর্লভ। তাঁর প্রতিটি কর্মপ্রচেষ্টার মূলেই ছিল তাঁর বিশাল হৃদয়ের প্রেরণা। সেই সঙ্গে ছিল অগাধ পাণ্ডিত্য। তাঁর প্রস্তাবিত সমাজ-সংস্কারগুলি যে শাস্ত্রসম্মত, তা তিনি শাস্ত্রের উদ্ধৃতি দিয়েই প্রমাণ করেছেন। শুধু তাই নয়, প্রতিষ্ঠিত পণ্ডিত ও সমাজনেতাদের অনুমোদনসহ সরকারের নিকট আবেদন পাঠিয়েছেন এবং শাসকবর্গকে সংস্কারে সমর্থন করিয়ে আইনও পাস করিয়েছেন। এখানেই শেষ নয়। বিদ্যাসাগর নতুন বিধিগুলিকে হিন্দু সমাজের দ্বারা সাধারণভাবে গ্রাহ্য করে তোলার প্রচেষ্টাও করেছেন। বিদ্যাসাগর নিজেই জানিয়েছেন বিধবাবিবাহ প্রবর্তন তাঁর জীবনের সর্বপ্রধান কর্ম। বিধবাবিবাহ সাধারণভাবে হিন্দুসমাজে প্রচলিত করার বাস্তব প্রচেষ্টা তিনি করেছিলেন সর্বস্ব পণ করে। মানবতার জীবন্ত বিগ্রহ রূপে তিনি আজও পূজনীয়।

কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। বিমান বসু (সম্পা.), প্রসঙ্গ : বিদ্যাসাগর (১৯৯১)।
২। গোপাল হালদার (সম্পা.), বিদ্যাসাগর রচনা সংগ্রহ, দ্বিতীয় খণ্ড (১৯৭২)।
৩। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, চারিত্রপূজা।
৪। দেবকুমার বসু (সম্পা.), বিদ্যাসাগর রচনাবলী।
৫। বিনয় ঘোষ, বিদ্যাসাগর ও বাঙালী সমাজ।

প্রসঙ্গ শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের একটি কবিতা : এক অসুখে যখন দুজন অন্ধ

আকাশ বিশ্বাস*

চাঁইবাসায় বন্ধু সমীর রায়চৌধুরীর বাসায় বেড়াতে গিয়ে নিজের সম্পর্কে শক্তির মনে হয়েছিল 'হেমন্তের অরণ্যের আমি পোস্টম্যান'। এই শিরোনামেই লেখা হয়েছিল একটি কবিতা। পরে একটি কাব্যগ্রন্থ।

'এক অসুখে দুজন অন্ধ' কবিতাটিও অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল সেই বইতে। নামকরণেই বোঝা যাচ্ছে দুজন মানুষের কথা বলেছেন কবি। একইরকম অসুখে অন্ধ হয়ে গেছে, এমন দুজন মানুষের কথা। কিন্তু কী কথা? কী অসুখ তাদের? কারা তারা? —এই যে অসংখ্য প্রশ্ন, লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ল বৃষ্টির ছাঁটের মতো, তার মীমাংসা হবে কী করে? মীমাংসার মহত্ব দাবি করা সমালোচকের জন্য, বস্তুত কি খুব বেশি কোনো স্পেস ছেড়ে রেকেছেন কবি? উত্তরটা সম্ভবত না-ই।

কিন্তু এই সত্য মেনে নিয়েও রণে ভঙ্গ দেওয়ার বিলাসিতা যেহেতু আমাদের জন্য নয়, তাই শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের কবিতার ব্যাখ্যায় বসে, এটা মনে রাখা জরুরি হয়ে পড়ে যে, শক্তির কবিতার বিষয় (পঞ্চাশের আরও পাঁচজনের মতোই) শক্তি নিজেই। কিন্তু যেহেতু পুরোনো রোমান্টিকদের একরৈখিক ধরন নয় তাঁর, যেহেতু তাঁর কবিতায় মিলেমিশে যায় বাস্তব আর পরাবাস্তব, যেহেতু স্যুররিয়াল ধূপছায়া, কথনরীতি সূক্ষ্ম চমকপ্রদ জাফরি, সচেতন নির্লিপ্তি, নির্মাণ দক্ষতার অনায়াস কারুকার্য থাকে সেখানে, প্রবল প্যাশনের পাশাপাশি থাকে প্রচণ্ড অভিমান; —তাঁর কবিতা পড়ে সবটা বুঝে ফেলবে দাবি অথবা বুঝিয়ে বলতে পারার অভিমান নিতান্তই বাতুলের অহমিকা।

সমুদ্রের তুই-তোকারি সম্বোধন করে স্বেচ্ছাচারী শক্তির নিজস্ব বাক্‌চালে শুরু হয়ে যাচ্ছে কবিতাটি:

> আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ
> দীর্ঘ দাঁতের আঘাত ও ঢেউ নীল দিগন্ত সমান করে
> বালিতে আধ-কোমরবন্ধ
> এই আনন্দময় কবরে
> আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।[১]

---

* অধ্যাপক, শ্রীগোপাল ব্যানার্জী কলেজ।

নীল শরীর, লোনা জলের সমুদ্র; তার মৎসগন্ধী আমিষতার নিঃশ্বাস নিয়ে তৈরি একটা আবহ। আমিষাশী এই পরিবেশে উপস্থিতি, হয় তো কিছুটা হতভম্ব কবির অস্বস্তি মালুম পড়ছে তাঁর শব্দ সাজানোয়। বালিতে আধকোমর বুজে থাকা এই 'আনন্দময় কবর'টা যে বিশেষ কাঙ্ক্ষিত মনে হচ্ছে না তাও যেন বুঝিয়ে দিচ্ছেন সুতীব্র বৈপরীত্যে, মেধাবী ব্যাজস্তুতিতে।

সজ্ঞান, সশরীরী, সমুদ্র সকাশে এই দিক্‌শূন্যতার যাপনের মধ্যেও কবির বোধ কিন্তু দিব্যি সজাগ, যে:

হাত দুখানি জড়ায় গলা, সাঁড়াশী সেই সোনার অধিক
উজ্জ্বলতায় প্রখর কিন্তু উষ্ণ এবং রোমাঞ্চকর[২]

এবং এরপরেও তবুও জেগে আছে 'কিন্তু' নামক একটি অনড় প্রশ্নচিহ্নের মিনার। তারা নড়ছে না 'বহুদিন বেদনায় বহুদিন অন্ধকারে' থাকা 'হেমন্তের অরণ্যে আমি পোস্টম্যান' বলে নিজেকে দাবি করেন যে মানুষটা; তাঁর মন থেকেও! তরঙ্গ থেমে গিয়ে ফের জেগে ওঠার মতো বারবার ফিরে ফিরে আসে প্রশ্নের ঢেউ—এই আলিঙ্গন, এই ''আলিঙ্গনের মধ্যে আমার হৃদয় কি পায় পুচ্ছে শিকড়—/আঁকড়ে ধরে মাটির মতন চিবুক থেকে নখ অবধি?''[৩]

বেশ বোঝা যাচ্ছে, হতশ্বাস, বন্ধমোহ, আলুথালু বেঁচে থাকা চিরদিনের শক্তি, ভুগছেন এক অদ্ভুত দোটানায়। আলিঙ্গনের উন্মুক্ত বাহুকে সাঁড়াশির মতো লাগছে তাঁর। অথচ সবকিছু লণ্ডভণ্ড করে ফেলে, ছেড়ে চলে আসতেও আদিম লতাগুল্মময় কোনো চত্বরে পা জড়িয়ে যাচ্ছে তাঁর! অথচ সমুদ্র সন্নিকটের এই সমবেত কালতিপাতের অসুস্থতাকেও দু'পায়ে মাড়িয়ে উপেক্ষা করতে পারছেন না!

ভিতর থেকে ছিঁড়ে-খুঁড়ে যাওয়ার যন্ত্রণা, আর্তনাদ এই কবিতার সর্বাঙ্গে। চার মাত্রার, ছেলে ভুলোনো ছড়ায় ঘুমপাড়ানি দুলুনিতে ঢেউয়ে-ঢেউয়ে যেন এগিয়ে আসে একে একে পঙ্‌ক্তিগুলি। ছড়ার ছন্দের দোলনে সম্ভবত নিজেকেও, অস্বস্তির দীর্ঘ দাঁতের আঘাত ভুলে একটুক্ষণ ঘুম পাড়িয়ে রাখতে চান কবি! স্তোকবাক্যের মতো নিজেকে নিজেই শুনিয়ে শুনিয়ে হয়তো বলতে চান:

সঙ্গে আছেই
রুপোর গুঁড়ো, উড়ন্ত নুন, হল্লা হাওয়ার মধ্যে, কাছে
সঙ্গে আছে
  হয়নি পাগল
এই বাতাসে পাল্লা-আগল
  বন্ধ করে
  সঙ্গে আছে...
এক অসুখে দুজন অন্ধ![৪]

তবুও তিনি দিব্যি টের পান:

আজ বাতাসের সঙ্গে ওঠে সমুদ্র, তোর আমিষ গন্ধ।[৫]

পাঠক লক্ষ করুন; শেষ পঙ্‌ক্তির শেষে একটা স্থির যতি চিহ্ন। সমুদ্রের সর্বাঙ্গ থেকে উঠে আসা আমিষ গন্ধ নিয়ে কবির অস্বস্তি থাকতে পারে, কিন্তু অস্থির দ্বিধা নেই কোনো। আমিষ গন্ধের কুয়াশা ঘেরাটোপে তাঁর বন্দিত্ব নিয়েও সংশয় নেই। কিন্তু সংশয়; হয়তো বা প্রকৃত প্রস্তাবে রক্ষণশীলতা নামক লক্ষ্মণরেখার পিছুটান আশঙ্কা আছে, এক অসুখে অন্ধ হয়ে যাওয়া দুজন সম্পর্কে! তাঁদের ভবিষ্যৎ পরিণতি, আগামী যাপন বিষয়ে। সেইজন্যেই সম্ভবত 'এক অসুখে দুজন অন্ধ', অভিশাপের মতো এ'বাক্য উচ্চারণ করে, একটি বিস্ময়সূচক চিহ্ন জুড়ে দেন তিনি। কারণ এই কবিতা তো একান্তভাবে, শিরোনাম থেকে সমাপ্তি পর্যন্ত—সেই দু'জনের কবিতা; যারা অন্ধ হয়ে গেছে এক অসুখে। হয়তো কবিতা লেখার এই মুহূর্তেও তারা বন্দি—একটি ঘরের ঘেরাটোপে! এক শয্যার চতুষ্কোণে! তারা আক্রান্ত হবার খবর রাখে সম্ভবত! নইলে তো এই অন্ধত্বের অনুতাপ আসে না। নইলে তো অসুখ স্বীকারের গোপনতাহীন কন্‌ফেশন্ আসে না। তবু শেষ পঙক্তিতে এসে পাঠক বুঝে যায়, শত আর্তনাদ, অস্ফুট অনুকম্পা, প্রার্থনার শেষেও 'অন্ধ' দুজন পরিত্রাণহীন। রিপুর নিশিডাকে, ভগ্ন তরীর মতো তারাও কখন যেন আটকে গিয়েছে—অতিবেল সমুদ্রের নিষ্করুণ বেলাভূমিতে! তাদের আধকোমর খেয়ে নিয়েছে বুভুক্ষু চোরাবালিতে। কটু আমিষগন্ধে দম আটকে আসছে তাদের। কিন্তু তারা জানে না, তাদের জানা নেই—নিষ্ক্রমণের কোনো হদিশ। তাদের অতীত আছে নিঃসন্দেহে, অসুখ আক্রান্ত হলেও একটা যেমন-তেমন বর্তমান, কিন্তু ভবিষ্যৎ বলে নেই কোথাও কিছু। এই সম্পর্কের খিলভূমিতে তৈরি হয়নি, তৈরি হয় না ভবিষ্যতের দিকে পা বাড়ানোর কোনো সোপান। কোনো সেতু। এই কবিতার কিছু ইঙ্গিত, কিছু শব্দে সমকামিতার কথা বলা হয়েছে আদতে— এমনটা ভাবার সুযোগ হয়তো আছে! এই যে 'অন্ধ' এই সম্পর্কের দড়িতে বাঁধা থাকা দু'জন, যেমন করে বন্ধ্যা বালিয়াড়িতে আটকে থাকে তারা, যেমন করে আধকোমর এক অবস্থানেই সীমাবদ্ধ থেকে যায় —তাদের সব আদান-প্রদান; তাতে করে লেখকের সমসাময়িক জীবনপ্রবাহের আড়াল-আবডালের সঙ্গে সম্পর্ক মেলাতে বসলে সে সম্ভাবনা হয়তো উড়িয়ে দেওয়াও যায় না। কিন্তু তত কথা যে হলফ্ করে বলব, সে সুযোগ শক্তি আমাদের দিলেন কোথায়? তিনি তো সেই দু'জন সম্পর্কে কেবল জানালেন, বন্ধ্যা বালিতে ডুবে যেতে-যেতে তারা কেবল বুঝতে পারে, অন্ধ হয়ে যাচ্ছে, আর সমুদ্র সুতীব্র আমিষ গন্ধ নিয়ে ক্রমশ যেন গিলতে আসছে তাদের।

আসলে শক্তির কবিতায় ঘরবাড়ি, তার দরজা-জানালার পর্দা মাঝে-মাঝে উড়ে পাঠককে সামান্য ইঙ্গিত দেয় মাত্র। স্পষ্ট করে কিছুই বলে না প্রায়শই। পাঠকের চোখ বেঁধে তিনি যেন ছেড়ে দেন এক মস্ত কানামাছি খেলার আসরে। পড়তে পড়তে কবিতাটা গ্রাস করে, অধিকার করে নেয়। তার না-বলা বাণীর সংকেতগুলি নানা রঙের নক্ষত্র হয়ে জেগে থাকে পাঠকের

মস্তিষ্ক জঠরে। আধো আলো, আধো অন্ধকারে ব্যক্তিপাঠক, তার ব্যক্তিগত উপলব্ধির মরমী ক্যানভাসে, তাদের চিহ্নিত করে নেবে, তার নিজের মতো করে, শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের এই কবিতার মতো একটি open text বস্তুত তাই-ই তো চায়।

তথ্যসূত্র:

১। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, *এক অসুখে দুজন অন্ধ*, জানুয়ারি ১৯৯৯ : শক্তি চট্টোপাধ্যায়ের শ্রেষ্ঠ কবিতা, দে'জ পাবলিশিং (অষ্টম সংস্করণ), প্রথম প্রকাশ : মার্চ ১৯৭৩, কলকাতা, পৃ. ৬০-৬১

২। তদেব।

৩। তদেব।

৪। তদেব।

৫। তদেব।

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে মেদিনীপুর

সুবল কুমার মাইতি*

এক কথায় লোকসংস্কৃতি কী তা বোঝানো সম্ভব নয়। তবে এটুকু বলা যেতে পারে যে, ব্যক্তি, পরিবার, সমাজ, গোষ্ঠী, অঞ্চল, তারপর জেলা এই নিয়ে একটা জনজীবন এবং সেই সব জীবনের দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সমস্ত খুঁটিনাটি দিক নিয়েই এক একটা সংস্কৃতি গড়ে ওঠে, যখন সেটি গ্রাম্যসংস্কৃতি হয়ে ওঠে, তখন তাকে লোকসংস্কৃতি বলে। শহুরে গ্রাম্য সংস্কৃতি থেকে কিছুটা ভিন্ন চরিত্রের।

জাতপাত শ্রেণি ভেদে গ্রাম্যসংস্কৃতির প্রকৃতি ভিন্ন ভিন্ন। ভারতীয় সংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে বাংলার সংস্কৃতির মিল-অমিল যেমন আছে, তেমনি বাংলার লোকসংস্কৃতিতে মেদিনীপুর জেলার সংস্কৃতির যেমন মিল আছে, তেমনি বহুক্ষেত্রে অমিল দেখা যায়। লালমাটি, পলিমাটি, বালিয়াড়ী, নদীনালা, সমুদ্র, ঝাউবন, শালবন, হিন্দু-মুসলমান, তপসিলি-আদিবাসী সম্প্রদায়, উচ্চবর্ণ-নিম্নবর্ণ নানা ভেদাভেদ মেদিনীপুরের সমাজব্যবস্থায় বৈচিত্রের নানা সুর।

মেদিনীপুরের আঞ্চলিক সংস্কৃতিকে আমরা বস্তুগত লোকসংস্কৃতি ও আত্মগত লোকসংস্কৃতি হিসেবে আলোচনা করতে পারি।

বস্তুগত লোকসংস্কৃতি :

এর মধ্যে পড়বে — বাসস্থান, খাওয়া-পরা, হাতের কাজ, শিক্ষা, চাষাবাদ, নানারকমের বৃত্তি প্রভৃতির কথা।

মাটির একতলা, দোতলা, তিনতলা বাড়ি, খড়ের ছাউনি, বাঁশের কাঠামো, দোচালা, চারচালা, আটচালা বা বারোচালা ঘর এককালে আকর্ষণীয় থাকলেও বর্তমানে তা কমে যাচ্ছে। পুরাতন মাটির ঘর ভেঙ্গে গেলে ইটের দেওয়াল, বাঁশ বা কাঠের কাঠামো, টিন, এস্‌বেশস্টর কিংবা টালির ছাউনি দেওয়া ঘর তৈরি হচ্ছে। ইদুঁরের দৌরাত্ম্যে মাটির মেজে পাকা করতে হচ্ছে। কিন্তু তাহলেও নানা রকমের মাটির বাড়ি মেদিনীপুরে কম নেই। বাড়ির দেওয়াল খড়ের কুচিও মাটির লেপ দিয়ে প্লাস্টার করে রঙ দেওয়ার রেওয়াজ আছে। খুব সুন্দর দেখায়। সাঁওতালদের ঘরগুলো সাধারণত চার চালার, ঘরের বাইরের দেওয়ালে সুন্দর মাটির লেপ, নিজেদের তৈরি করা নানা রকমের রঙের বাহার, জীবজন্তুর ছবি সাধারণত অন্যত্র খুব কম দেখা যায়।

মাটির ঘরের চৌকাঠে কাঠের ওপর খোদাই করা কারুকার্য পুরাতন কাঠ-শিল্পীদের আভিজাত্যকে চিনিয়ে দেয়। খড়ের ঘরের চালার মাথায় খড়ের ঝুঁটি নানা আকারের করা হতো, এখন খুবই কম দেখা যায়। ঘরের আসবাবপত্র-খাট, পালঙ্ক, চেয়ার, বেঞ্চি, আলমারি, আলনা, হেলান দেওয়া বেঞ্চি, জলচৌকি প্রভৃতি কাঠ দিয়ে তৈরি। বাঁশের তৈরি সুদৃশ্য দরজাও কপাট,

---

* অধ্যাপক, আয়ুর্বেদ চিকিৎসক, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

বাঁশের বাটাম দিয়ে ঘেরা রঙিন ও নকশাদার বারান্দা মনোমুগ্ধকর। খড় দিয়ে ঘর-ছাউনির জন্য বাবুই ঘাসের দড়ি আজও সমাদৃত। এই দড়ি দিয়ে পাপোষ, মোড়া, খাটিয়া প্রভৃতি তৈরি হয়। মাটির ঘরের দেওয়ালে বিভিন্ন পূজাপার্বণে পিঠুলির (চালকাটা জলে গুলে) আলপনা আজও দেখা যায়। অনেকে পাকার দেওয়ালে দিয়ে থাকেন। অন্য সময়েও মেয়েরা সৌন্দর্যবর্ধনের জন্য আলপনা আঁকেন।

মেদিনীপুরের মেয়েদের যেন জন্মগত অধিকার নকশাবাড়ি বা গয়না বড়ি তৈরি করা। এছাড়া নানা রকমের বড়ি তৈরিতে তাঁরা সিদ্ধহস্ত। চালকুমড়োর শাঁস ও বিউলি ডাল বাটা দিয়ে সুস্বাদু বড়ি তৈরি হয়। এছাড়া বিউলির ডালের খোসা, চালকুমড়োর বীচি, সামান্য বিউলির ডাল বাটা, সামান্য পরিমাণে লবণ ও লঙ্কার গুঁড়ো দিয়ে এক ধরনের চ্যাপ্টা বাড়ি তৈরি হয়, দেখতে হালকা কালো রঙের হলেও ভেজে খেতে খুবই ভাল লাগে। মেদিনীপুরে একে বীচিবাড়ি বলে। মেদিনীপুরের কোনো কোনো অঞ্চলে নুন-লঙ্কাপোড়া-পেঁয়াজের সাথে বীচি বড়ি তেল দিয়ে ভেজে পান্তাভাত খাওয়ার অভ্যেস। শুটকি মাছের ভাজা দিয়েও অনেকে পান্তাভাত খেয়ে থাকেন। এছাড়া অনেক কিছু দিয়ে পান্তাভাত খাওয়া যায়। তবে এই পান্তাভাতের জলটিকে বলা হয় ''আমানি''। একটু নুন মিশিয়ে খেলে বিশিষ্ট পানীয় হয়ে ওঠে, যা শরীরের পক্ষে খুবই উপকারী, যাতে আয়রণ, ক্যালসিয়াম, ফসফরাস, সোডিয়াম প্রভৃতি ভালভাবেই বিদ্যমান। কোন কোন অঞ্চলে ভাতের ফ্যান ফেলে না, কোথাও কোথাও গরম গরম ফ্যান অথবা ফেনাভাত খেয়ে থাকেন। কোন কোন অঞ্চলের মেয়েরা চালধোওয়া জল মাঝে মাঝে খেয়ে থাকেন, এটিও শরীরের নানা কাজে লাগে।

দড়ির দোলনা মেদিনীপুরের আর এক নিজস্ব সংস্কৃতি। বাচ্চা থেকে বুড়ো সকলেরই প্রিয়। ঘরের ভেতর দোলনায় শুয়ে ঘুমোনো মেদিনীপুরের প্রায় সর বাচ্চারই ভাগ্যে জোটে। দুটো গাছের ডালে বা গাছে বেঁধে সুন্দর দোল খাওয়া যায়। নানা ধরনের দড়ি দিয়ে রঙ-বেরঙের দোলনা ছেলে-মেয়ে উভয়েই তৈরি করে থাকেন।

নানা ধরনের মাদুর, নকশাদার মাদুর সবং ও রামনগর অঞ্চলের আবাল বৃদ্ধবণিতা তৈরি করতে ওস্তাদ। খেজুর পাতার চাটাই পেতে নিড়োনো উঠোনে শীতের কচি রোদ্দুরে বসে বেতের তৈরি ছোট্ট বাটিতে খেতের ছোটো ছোটো ছাল সমেত আলুভাজা দিয়ে মুড়ি খাওয়া, দূরে খেজুর গাছে ঝুলে থাকা রসের হাঁড়ি, পুকুরে হাঁসেদের প্যাক প্যাক শব্দ, নতুন চালের ভাতের গন্ধ, ঠাকুমার মৃদু বকুনি, গ্রাম্যজীবনের সেই ছবিটা আজ যেন ম্লান হতে হতেও পুরোপুরি হয়ে যায়নি। তালপাতার পাখা, বাঁশি, ছোটো ছোটো চারকোণা ঝুড়ি, ঝুমকো বাঁশি পৌষ-পার্বণের মেলা থেকে চৈত্র শেষের চড়ক মেলা পান্তি পাওয়া যেত। এখনো কম-বেশি পাওয়া যায়। তালপাতার কথা উঠলেই তালগাছের কথা মনে পড়ে। আগেকার দিনে মাটির ঘরে, কড়িকাঠ হিসেবে তালকাঠই ব্যবহার হতো। যার জন্য প্রচুর তালগাছ লাগানো হতো, বসন্ত-গ্রীষ্মে তালগাছে বাসা বাঁধার জন্য বাবুইয়ের আনাগোনা, ঝুলে থাকা বাবুই বাসা মেদিনীপুরের সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেন পরিপূরকের ভূমিকায়। তালগাছ কমে যাচ্ছে, বিষ বিষময় মাঠঘাট, আবহাওয়ার

তড়িৎ-তরঙ্গ, বাবুই-এর বংশ বিলুপ্তির পথে কিনা, তা পক্ষীবিশরদগণের গবেষণার একটি জ্বলন্ত বিষয়। তালপাতার পাখা ৩-৪ রকমের হয়, তারমধ্যে একটি ফোল্ডিং। রং-বেরং তো আছেই। তালপাতার লম্বা বর্ষাতি, মাথায় দিলে কোমর পর্যন্ত ঢেকে যায়। আমাদের ছোটোবেলায় ৫০-৬০ বছর আগে দেখেছি — বর্ষায় ধানজমিতে রোয়া-বাছার কাজে যেই যাক্ না কেন, সকলের সঙ্গে থাকতো বর্ষাতি, চলতি ভাষায় পাখিয়া। তালপাতা বা খেজুর পাতা দিয়ে তৈরি ঘর-সংসারের নানা জিনিষ পাওয়া যায়। ঘাস দিয়ে তৈরি ছোটো ছোটো ঝুড়ি, চুপড়ি, ব্যাগ, মোড়া প্রভৃতি পাশকুঁড়া অঞ্চলে বেদেনীরা তৈরি করেন।

বাঁশের তৈরি জুড়ি, চুপড়ি, কুলা, চালুনি, মাছধরার ও রাখার সরঞ্জাম (বাঁকী, চওড়া, ঘুনি, পোলো, খেলিক খারই প্রভৃতি) তৈরি হয়ে থাকে।

বড়ি তৈরির মতো নানা প্রকারের আচার তৈরিকে মেদিনীপুরের মেয়েরা সিদ্ধহস্ত। ৫০-৬০ রকমের বেশি আচার মেদিনীপুরে পাওয়া যায়। তবে আমের মোরব্বা বা তেল আচার জল-খাবারে বা ভাতে উপাদেয় খাদ্য।

রামনগর-মেচেদা অঞ্চলে তৈরি হয় বিশেষ পান। রামনগরের পানের গতিবিধি উত্তরপ্রদেশ, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি রাজ্যে। ফুলচাষে পাশকুড়া-মেচেদা-কোলাঘাট অদ্বিতীয়া। ফুলের গয়না শহর কলকাতার ফুলশয্যার কনে সাজানোর জন্য লাগবে, ভয় নেই, আছে মেদিনীপুর। পদ্ম ফুল — দুর্গাপূজায় লাগবে, সেই মেদিনীপুর।

মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চল শালগাছে ভর্তি। শালপাতার থালা, বাটি, প্লেট — সবই পাওয়া যায়। মেদিনীপুরের পূর্বাঞ্চলে পদ্মপাতায় খাওয়ার একটা চল ছিল, বিশেষত পূজাপার্বণে। কলাপাতায় খাওয়া ছিল অধিক। আজকাল সবই কমে গেছে, এমন-কি শালপাতাও, এসেছে বাজারের কাগজের কিংবা প্লাস্টিকের থালা-বাটি-গ্লাস-প্লেট-চায়ের কাপ — যা শরীরের পক্ষে খুবই ক্ষতিকর।

মাটির তৈরি নানাবিধ জিনিসপত্র ঘর-গেরস্থলীর জন্য, কিংবা আচার-অনুষ্ঠান-পূজা-পার্বণের জন্য তৈরি হতো, আজও হয়। তবে মাটির তৈরি হাঁড়িতে ভাতরান্না কিংবা তেলুনিতে তরকারি রান্না আজকাল আর হয় না। তাই ওগুলো প্রায় পাওয়া যায় না। পোড়ামাটির ঠাকুর দেবতা কিছু কিছু পাওয়া যায়। আগেকার দিনে পীরের থানে, শীতলার থানে কিংবা অন্য কোনো দেবতার থানে পোড়া মাটির ঘোড়া মানত করের রেখে আসার চল ছিল। আজও কম-বেশি দেখা যায়। আমার ছোটোবেলায় দেখেছি- বাচ্চারা বিছানায় পেচ্ছাব করলে মা-ঠাকুমারা পীরের কাছে মানত করতো— বিছানায় আর পেচ্ছাব না করলে পীরের থানে ঘোড়া ছেড়ে আসবে। অনেক সিংহবাহিনীর থানেও ঘোড়া ছাড়তে দেখেছি। আজও কমবেশি ঠাকুর-দেবতার, পশু-পক্ষীর আদলে তৈরি হয় পোড়া মাটির মূর্তি। তমলুক অঞ্চলে পোড়ামটির হরিমন্দির, মেদিনীপুর শহরাঞ্চলে দেওয়ালি পুতুল কম-বেশি পাওয়া যায়। নরম পাথর খোদাই করে থালা, গেলাস, বাটি, প্রদীপ ও নানাধরনের ঘরোয়া জিনিসপত্র তৈরি হয় মেদিনীপুরের পশ্চিমাঞ্চলে। নরঘাট থেকে তমলুকের অংশবিশেষে কাঁসা-পিতল-তামার নানাবিধ দ্রব্য তৈরি হয়ে থাকে। রূপোর গয়নার নানাবিধ

জটিল ও কারিগরি মেদিনীপুরের দক্ষিণাঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। শিং-এর তৈরি চিরুনি ও অন্যান্য দ্রব্যাদি, ঠাকুর-দেবতার মূর্তি তৈরিতে মেদিনীপুর পিছিয়ে নেই।

নকশীকাঁথা শিল্প, ঝিনুক শিল্প মেদিনীপুরে বিখ্যাত। ধানের ছড়া দিয়ে বিনুনীর মতো সাজিয়ে অগ্রহায়ণ-পৌষে লক্ষ্মীর পুজো হয়। ঘর-সাজানোর জন্য মেয়েরা নানারকম ছড়া কাপড়ে ছুঁচ-সুতো দিয়ে তুলে আয়নায় বাঁধিয়ে দেওয়ালে ঝুলিয়ে রাখতো। আজও কোথাও কোথাও দেখা যায়। দু'একটি এই রকম — 'ভাই হেন বন্দু নেই, যদি না করে হিংসা / ধান হেন ধন নেই, যদি না হয় ভূষা / মাতা নাই গৃহে যার, সংসার অরণ্য তার / তাই ডাকি বার বার, আমি মার মা আমার।'

কখনো বধূর বিনাশ : 'দূরে দূরে থেকে কেন, তৈরি কর ব্যথার সাগর / তোমারি লাগিয়া শুধু মোর, কাঁদে যে অন্তর।'

মেদিনীপুরের নানা অঞ্চলে তুলো ও রেশম সুতোর কাপড় তৈরির কেন্দ্র আছে। ঠাকুর দেবতার যুদ্ধ বিগ্রহের লম্বালম্বি গোটানো পাট তৈরি হতো। পটুয়া পট দেখাতে দেখাতে দূর করে গান গাইতো। পোড়ামাটির জীবজন্তু, পতুল প্রভৃতির গায়ে নানা রঙের গালা ঘসে ঘসে উজ্জ্বল করে তোলা হতো। এগরা থানার পাঁচরোল গ্রামের গালা পুতুল এককালে উল্লেখযোগ্য কাজ হিসেবে পরিগণিত হতো। বিভিন্ন রকমের বাজি তৈরিকেও মেদিনীপুরে কম যায় না। শোনার কাজ যে এত নিখুঁত ও সৌন্দর্যমণ্ডিত হতে পারে, তা না দেখলে বিশ্বাস করা মুশকিল।

নকশাদার খেতে বসার আসন, বালিশের ওপরের তোয়ালে, টেবিল ক্লথ আগেকার দিনের মেয়েদের সূচিশিল্প। পশ্চিম মেদিনীপুরের বেতের ধামা, কোঁচা, ছোটো ছোটো বাটি প্রসিদ্ধ।

মেদিনীপুরের দাঁতনে এবং কমবেশি অন্যত্র লোহার তৈরি ঘরোয়া জিনিসপত্র ও চাষের সরঞ্জাম আজও তৈরি হয়। খেজুর পাতার নরম ঝাড়ু ও নারকেল পীচের (পাতার কাঠি) দিয়ে তৈরি ঝাড়ু প্রসিদ্ধ। সাঁওতাল মেয়েদের শাড়ি পরার আদব-কায়দাই আলাদা অভিজাত্য। মাঝ ধরার বিভিন্ন প্রকারের জাল তৈরি হয়।

গ্রামে-গঞ্জে আরও কতকিছু যে লুকিয়ে আছে, যা মেদিনীপুরের একান্তই নিজস্ব, তার চুলচেরা বিচার-বিশ্লেষণ করা খুবই দুরূহ কাজ।

আত্মগত লোকসংস্কৃতি :

এর মধ্যে লোকসংগীত, লোকনাট্য, লোকনৃত্য, ছড়া-ধাঁধা, লোক ঔষধ, পূজা-পার্বণ, আচার-অনুষ্ঠান, দেব-দেবীর কথা, খেলা-ধূলা, উৎসবও মেলা প্রভৃতি মুখ্য ভূমিকায়। লোক বিশ্বাস ও লৌকিক সংস্কারে মোড়া সমাজ ব্যবস্থায় কত যে বিচিত্র পথের আনাগোনা, তার শেষ নাই।

পয়লা বৈশাখের সাত-সকালে বাগানের মাঝে মাঝে খড়কুটো জ্বালিয়ে ধোঁয়া দেওয়ার রেওয়াজ মেদিনীপুরের অঞ্চল বিশেষ। ঐ দিন নববর্ষের হালখাতার পূজা। গড়বেতার আউশবাঁধি গ্রামে চৈত্রী পূর্ণিমা থেকে ৩ দিন সাঁওতাল সম্প্রদায়ের শালুই পূজা উপলক্ষ্যে ২০০ বছরের প্রাচীন একটি মেলা বসে। বৈশাখের শুক্ল-চতুর্দশীতে পূর্বদাড়রা গ্রামে সামন্তবাবুদের বাড়িতে

শ্রীশ্রী বৃন্দাবনচন্দ্র প্রভুর অষ্টপ্রহরব্যাপী নামসংকীর্তন মহোৎসব। মহিষাদল থানার জগৎপুর গ্রামে ২০০ বছরের পুরাতন বিশেষ-কালীপূজা অনুষ্ঠিত হয়। মরিশদা থানার করলদা নিমকবাড় গ্রামে ধরণীধর গিরির বাড়িতে ৩ দিন ব্যাপী ১৫০ বছরের প্রাচীন গণেশ-শীতলা-চণ্ডী পূজা হয়। ঝাড়গ্রামের কীশমৎ ভরতপুর গ্রামে নগেন্দ্রনাথ মাইতি প্রতিষ্ঠিত মহামায়ার বাৎসরিক পূজা ও নাম সংকীর্তন হয়ে থাকে।

বুদ্ধ পূর্ণিমা বা বৈশালী পূর্ণিমায় দাড়বা গ্রামে ও দাসপুর থানার চেতুয়া বাসুদেবপুর গ্রামে শ্রীশ্রীমহাপ্রভুর মহোৎসব ও রথযাত্রা। জ্যৈষ্ঠমাসে সাবিত্রী-সত্যবান ও ধর্মরাজ পূজা। কৃষ্ণচতুর্দশীতে দাসপুর থানার বাসুদেবপুর গ্রামে ও পাঁশকুড়ার বেগুনবাড়ি গ্রামে শ্মশানকালী পূজা, বলিদান ও বিরাট মেলা হয়ে থাকে। দাসপুরে কনিষ্ক মহারাজের অমরাবতী আশ্রমে শ্রীশ্রী ফলহারিণীকালিকা মাতার বৈষ্ণবী মতে পূজাপাঠ ও দরিদ্রনারায়ণ সেবা হয়ে থাকে। শুক্লষষ্ঠীতে সন্তানের মঙ্গলকামনায় ষষ্ঠীমাতার পূজা। আচারবশত জামাইষষ্ঠী পালন। শুক্লদশমীতে দশহরা, এদিন মনসা ও গঙ্গাপূজা হয়ে থাকে। মেয়েরা ব্রত পালন করেন। আষাঢ়ে রথযাত্রা। বাড়ি কৃষ্ণনগরে, মহিষাদলে রথযাত্রা উপলক্ষ্যে উৎসব ও মেলা। পটাশপুর টেঁপরপাড়ার রথ প্রসিদ্ধ। পাকা কাঁঠাল ও নানা রকমের ফুল, ফল ও বাহারীগাছের চারা আমদানি ও বিক্রির জন্য রথযাত্রা আরও আকর্ষণীয়। রথযাত্রার পরে আষাঢ় পূর্ণিমায় মহিষাদলে 'রাণীর রথ' বেরোয়। তারপর ঝুলন পূর্ণিমা বা রাণী পূর্ণিমা, সারা বাংলার সাথে মেদিনীপুরেও অনুষ্ঠন হয়। ভাদ্রে জন্মাষ্টমী। আচারবশত গরুর পূজা হয় গোয়ালে। গণেশ চতুর্থীতে সন্ধ্যেবেলায় ছেলেরা লোকের বাড়ির ফলমূল চুরি করে। মেদিনীপুরের অঞ্চল বিশেষে একে চোরচৌঠী বলে। দুর্গাপূজা, কোজাগরী লক্ষ্মীপূজা, শ্যামাপূজা প্রভৃতি সমগ্র বাংলার সাথে মেদিনীপুরবাসীরাও উৎসবে বেশ কিছুদিন মেতে থাকেন। শ্যামাপূজার দিন খড়গপুর, শহরে দেবী হিড়িমেশ্বরীর পূজা ও উৎসব এবং বগড়ী কৃষ্ণনগরে অন্নকূট উৎসব ও মেলা মেদিনীপুরের নিজস্ব ঘরানা। জাতিকে যমদ্বিতীয়ায় ধর্মরাজ পূজা বা যমের পূজা। ঐদিন আচারবশত বাংলার ঘরে ঘরে ভাইফোঁটা — ভ্রাতৃললাটে তিলকদার—ভায়ের জঙ্গলে দিলাম ফোঁটা, যমের দুয়ারে পড়ুক কাঁটা। তারপর জগদ্ধাত্রী পূজা, রাসযাত্রা। মেদিনীপুরের কৃষ্ণনগরে, ময়নাতে লাউসেন রাজার গড়ে, পটাশপুরের পচেটগড়ের রাজপরিবারের রাসোৎসব ও মেলা সুপ্রসিদ্ধ। পৌষ সংক্রান্তির মেলা মেদিনীপুরের সর্বত্র চড়িয়ে ছিটিয়ে হয়ে থাকে। তন্মধ্যে কাঁথি থানার কানাইদিঘী গ্রামে রসুলপুর নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ৭ দিনব্যাপী মধুমেলা, এগরা থানার সাহাদরা গ্রামে ৪ দিন ব্যাপী মেলা, ভূপতিনগর থানার খাঞ্জাদাপুর গ্রামের নাগার মেলা (লাগার যাত) ৭ দিন ব্যাপী হয়ে আসছে দীর্ঘদিন ধরে।

মকর সংক্রান্তির আর একটা বড়ো উৎসব হয়ে থাকে কেলেঘাই নদীর ভেতরের চরে, তাকে বলা হয় তুলসিচারার মেলা বা তুলসিচারার মতো। মাঘ মাসে গড়বেতা থানার সারেঙ্গাঁগড় গ্রামে সাঁওতাল সম্প্রদায়ের বঙ্গঠাকুরের পূজা উপলক্ষ্যে সপ্তাহব্যাপী খারগারজাত খেলা বসে, এটি ২০০ বছরের অধিক পুরাতন মেলা। মাঘমাসের কৃষ্ণপক্ষের চতুর্দশগত রাণীশাহি গ্রামে মিশ্র পরিবারের ২০০ বছরের পুরাতন পূজা শ্রীশ্রী রটন্তীকালিকামাতার পূজা ও উৎসব। এই

জেলার এল্লাবনী গ্রামে ৩ দিন ব্যাপী ফুলমণি দেবীর পূজা উপলক্ষ্যে বনদেবী মেলা অনুষ্ঠিত হয়। এরপর শুক্ল পঞ্চমীতে সরস্বতী পূজা। আর শুক্ল একাদশীতে (ভৈমী একাদশীতে) ভীমপূজা মেদিনীপুরেই কেবল হয়ে থাকে। বিশাল বাঁশ-খড়-মাটির ভর্তি। সাধারণত রাস্তার ধারে পূজা হয়। মূর্তি এতবড়ো হয় যে, তার দু'পায়ের ফাঁক দিয়ে ছোটো ছোটো গাড়ি, রিক্সা অবলীলাক্রমে চলে যায়। এ নিয়ে যেখানে-সেখানে মেলা বসে। ভূপতিনগর থানার উদবাদাল গ্রামের ভীমপূজা দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। ৭ দিন উৎসব, মেলা ও নানাপ্রকারের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। শিবচতুর্দশীর মেলা বাংলার যত্রতত্র, মেদিনীপুরেও কমবেশি তাই। তারপর দোলযাত্রা, অশোকধর্মী, বাসন্তীপূজা, রামনবমী, চৈত্র সংক্রান্তির চড়ক পূজা ও মেলা। বাংলার ঘরে ঘরে উৎসব আর উৎসব। এই সংক্রান্তিকে অঞ্চল বিশেষে ছাতু সংক্রান্তি বলে। মুড়ি থেকে তৈরি ছাতু চিনি বা গুড় দিয়ে জলে মেখে খাওয়ার চল এককালে খুব থাকলেও বর্তমানে তার আধিক্যটা নেই। দক্ষিণ ২৪ পরগনার কোথাও কোথাও এর ব্যবহার দেখা যায়। মেদিনীপুর বিশেষ পূজা বড়াম মা'র পূজা, রহস্যময় দেবতা সাতবোন। সনকামার পূজা। দীপাবলির আকাশ প্রদীপ, লক্ষ্মীপূজা বা টুসুপূজা এবং নানাধরনের দেশাচার বা লোকাচার নিয়ন্তির বারব্রত মেদিনীপুরের লোকেদের নিত্যকর্মের মতো। লোকসঙ্গীত বা পল্লীগীতি গেয়ে মাঠের আল ধরে হেঁটে যাওয়া মানুষ আজকাল কম দেখা যায়। লোকগীতি শুনতে হয় শহুরে মানুষের গলায়। লোকসাহিত্য হারিয়ে যাওয়ার পথে। আমাদের ছোটোবেলায় কাঁথি মহকুমার বিভিন্ন বাজারে বিক্রি হতো ভাবুক দাসের ছড়ার বই, দাম ছিল এক আনা (৬ পয়সা)। ইটাবেড়িয়া বাজারে গান গেয়ে বই বিক্রি করতে তাঁকে দেখেছি। এই সাহিত্যের বিষয় নির্বাচন ছিল বিচিত্র পথগামী। সমাজের জ্বলন্ত সমস্যা বা ঘটনা এই সব ছড়ার বইতে স্থান পেত। দীর্ঘদিন এমন বইয়ের কোন সংবাদ আর পাই না।

লোকনৃত্যের কিছু কিছু দেখা যায়, যেমন ছো নাচ, ঝুমুর নাচ প্রভৃতি। সাঁওতাল সম্প্রদায়ের মধ্যে পাইক নাচ, পাতা নাচ, ঝুমুর নাচ, চাঙ্গু নাচ প্রসিদ্ধ। এদের বাহা পরব ও অন্যান্য নাচ আছে।

মুসলমানদের চিরাচরিত ধর্মানুষ্ঠানের বাইরে বিশেষ কোনো অনুষ্ঠান পরিলক্ষিত হয় না। মুসলমান ফকিররা গাজীপীরের গান শুনিয়ে ভিক্ষে করতেন, এমন দেখা যায় না। নানাবিধ পাঁচালির গান, পালাগান যেমন-ললিতা পালা, ষষ্ঠীমঙ্গল, চিড়িয়া-চিড়িয়ানী, কলঙ্কভঞ্জন, মানভঞ্জন, মাথুর প্রভৃতি পালাগান ধর্মীয় স্থানে বা লোকের বাড়িতে আগেকার দিনে প্রায় হতো। আজকাল ষষ্ঠী মঙ্গল পালাগান হতে দেখা যায়।

রাস্তার ধারে বট ও অশ্বথের চারা লাগিয়ে পূজা, বৃষ্টি না হলে ব্যাঙের বিয়ে গর্ভবতী ধানক্ষেতে ''সাধ'' দেওয়া প্রভৃতি নানা অনুষ্ঠানের পীঠস্থান এই মেদিনীপুর।

গ্রামে-গ্রামে, পাড়ায়-পাড়ায় মার্বেল খেলা, লাটিম খেলা, গদি খেলা, সীতাহরণ খেলা, কবাডি (হা-ডু-ডু) খেলা হতো, এখন স্মৃতিতে বিদ্যমান। ভরদুপুরে কিংবা বিকেলে লোডো, সাপলুডো, বাঘবন্দী খেলা না থাকারই মতো। সান্ধ্যদাবা এখন গাছতলায় তাসের আড্ডা। লোকসংস্কৃতির পরিবর্তন চলছে, শহুরে হাওয়ায় উড়তে উড়তে যেটুকু আছে, সেটাই হয়ত অকৃত্রিম।

লোকসংস্কৃতির প্রেক্ষাপটে সমাজহিতৈষীগণের চিন্তাভাবনার মধ্যে পরিবেশ ভাবনার আলেখ্য আমরা দেখতে পাই। লোকাচার ও পূজাপার্বণের মাধ্যমে এমন সব গাছপালা ও দ্রব্যাদির ব্যবহার হয়ে থাকে, যা ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্রের অন্তর্গত ঔষধিদ্রব্য। ধান, দূর্বা, তুলসি, হলুদ, তিল, যব, বট পাকুড়, অশ্বথ, আম, যজ্ঞডুমুর, নিম, বেল, কলা, নানাবিধ ফুল ও ফল প্রভৃতি অগ্রগণ্য। এসবের ঔষধিগুণ প্রচুর।

এইসঙ্গে গ্রাম্যজীবনে ছিল ঝাড়ফুঁক, ওঝার দৌরাত্ম্য, তাকতুক, মুদা দেওয়া, চালপড়া, জল মন্তানো আরো কত কী। জ্যোতিষীদের নানাবিধ কর্মকাণ্ড। আজও যে এসব সমূলে চলে গিয়েছে তা নয়, ফলে সাধারণ মানুষ ভুক্তভোগী। এগুলো একদা লোক-সংস্কৃতি হিসেবে প্রতিফলিত হতো। এক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হতো শ্বেতবেড়েলার মূল, বামুনহাটীর মূল, অনন্তমূল, দারুহরিদ্রা, লজ্জাবতী মূল, অশ্বগন্ধা, রুদ্রাক্ষ, ক্ষীরিনি, সর্পগন্ধা, কুঁচ প্রভৃতি নানাবিধ দ্রব্য। এগুলির ঔষধিগুণও প্রমাণিত সত্য।

সংস্কৃতিকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে অপসংস্কৃতির হাত থেকে তাকে উদ্ধার করার দায়িত্বও আমাদের। বর্তমান জীবন যাত্রায় হারিয়ে যেতে বসেছে পুতুল নাচের ইতিহাস। অল্প বয়সে বিভিন্ন পালায় কত পুতুল নাচ দেখেছি। আজকাল বড়ো একটা দেখা যায় না। সেই সম্প্রদায়ের সামান্য কিছু মানুষজনের দেখা মেলে নরঘাট অঞ্চলে। সরকারি বদান্যতায় মাঝে মাসে অনুষ্ঠান হয়। তাতে কি কোনো শিক্ষা বা শিল্পী বাঁচবে?

বাংলার লোকসংস্কৃতিতে মেদিনীপুরের ভূমিকা নিয়ে একটা আবছা আবছা ধারণা তৈরির চেষ্টা করা হয়েছে এই প্রবন্ধে। বিশাল সংস্কৃতির সমুদ্র থেকে কয়েক ফোঁটা জল তুলে আনার মতোই মনে হয়েছে। আমরাই তো ধারক ও বাহক, এখন আমাদের ভূমিকা কী হবে, তা ভবিষ্যৎই বলবে।

প্রান্তীয় সুন্দরবনের নামকরণ রহস্য : সন্ধানের ইতিবৃত্ত

রণজিৎ কুমার বাউলিয়া*

সুন্দরবন অঞ্চলটি ভৌগলিক জীব বৈচিত্রে ভরপুর নদী-নালা-খাড়ি বিস্তৃত, বিস্তীর্ণ জলা-জঙ্গল, শ্বাপদ-সঙ্কুল আবৃত পৃথিবী খ্যাত একটি ব-দ্বীপ অঞ্চল। দুই ২৪ পরগনাসহ বাংলাদেশের কিছু অংশ সুন্দরবনকে পরিবেষ্টিত করে রেখেছে। মানুষ ও প্রাণীর বেঁচে থাকার অস্তিত্ব সংগ্রামের ইতিবৃত্ত অন্বেষণের ক্ষেত্রে সুন্দরবনের নামকরণ রহস্য থেকেই যায়। সময়ের হাত ধরে সুন্দরবনের ভূমিপুত্র হিসেবে এ কাজে হাত দেওয়ার আগ্রহ জন্ম নেয়। সেই থেকেই এই নাম পরিকল্পনার বিষয়টি আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ একটি বিষয় হয়ে ওঠে। সেই সূত্রে সুন্দরবন নামকরণের ইতিবৃত্তকে সকলের দৃষ্টি গোচরে আনাই মূল উদ্দেশ্য।

'নামকে যারা মানমাত্র মনে করে আমি তাঁদের দলে নই'—নামকরণ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথের এই উক্তির প্রতিক্রিয়ায় বলা যেতে পারে যে, সাহিত্য-শিল্পে নামকরণ বহু চিন্তা-ভাবনার প্রতিফলন। নামকরণ ক্ষেত্রকেন্দ্রিক, বিষয়কেন্দ্রিক, চরিত্রকেন্দ্রিক কিংবা ব্যঞ্জনধর্মী হতে পারে। নামকরণের এই ব্যাঞ্জনাধর্মী স্বতন্ত্রতা থেকে সুন্দরবনের শৈল্পিক দৃষ্টিভঙ্গিতে দেখার প্রয়াসও নিঃসন্দেহে সাধুবাদ প্রাপ্য। আহমেদ কায়সার এই সুন্দরবনকে 'সুন্দরী সুন্দরবন', ওয়াজেদ আলি 'জঙ্গলের ভয়াল নিসর্গ', ড. অতনু কুমার রাহা 'বিশ্বের বিস্ময় সুন্দরবন' নামে অভিহিত করেছেন। আদিবাসী-অধিবাসীগণের রহস্যময় জীবনযাপনের অমোঘ অনিশ্চয়তার দিক থেকে আলোচ্য অঞ্চলকে আমরা এককথায় বলতে পারি—'আলো-আঁধারের ঐশ্বর্য'।

আবার সনৎকুমার মিত্র 'সুন্দরবন জল-জঙ্গল-জীবন' শঙ্করকুমার প্রামাণিক-এর গ্রন্থের পরিচায়িকাতে বলেছেন ডাঙায় 'দি রয়্যাল বেঙ্গল টাইগার', তীব্র বিষধর সাপ, আর জলে কুমির, কামোট ভরা ভয়ঙ্কর সুন্দরবনই সুন্দরবন।

তবে সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি সম্বন্ধে বহুমত আছে। সুন্দরবনের সুন্দরী (Heritiers Minor) নামক এক প্রকার বৃক্ষ বহু পরিমাণে দেখা যায়। এর কাঠ দেখিতে পরিষ্কার লালবর্ণ সেইজন্য সুন্দর। এর কাঠ ভারী ও সারযুক্ত অত্যন্ত শক্ত। তাই একে সুন্দরী বা সুন্দ্রবৃক্ষ বলে। এই বৃক্ষের আধিক্যের কারণে বনভাগের নাম সুন্দরীবন বা সুন্দরবন হয়েছে। সতীশচন্দ্র মিত্র, 'যশোহর-খুলনার ইতিহাস' গ্রন্থের (প্রথম খণ্ড) ষষ্ঠ পরিচ্ছেদ এর নামকরণ করেছেন 'সুন্দরবন' তাঁর গ্রন্থের (২৪৯-২৫১ পৃষ্ঠায়) সুন্দরবনের নামের অন্তরালে অবশ্য শ্বাপদ সঙ্কুলে ভরা সুন্দরবনের বাদাবন নিরবিচ্ছিন্ন জঙ্গলাকীর্ণ হলেও তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলি আবাদে ভরপুর ধান্যভূমি ও শস্যপ্রান্তর সত্যিই নয়নানন্দবর্ধন করে বলে উল্লেখ করেন।

ফলে সুন্দরবনের নামকরণ সম্পর্কিত বহু আলোচনা বিভিন্ন লেখক ও গবেষক মহলে একটা সাড়া ফেলে দেয়। কথায় বলে 'নানা মুনির নানা মত'। এক্ষেত্রে সুন্দরবনের অপরূপ বন্য

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, নবগ্রাম হীরালাল পাল কলেজ।

শোভায় সুন্দরবনের একটা নিজস্বতা ধরা পড়েছে। সুতরাং এর বিশেষত্ব শুধু কেবল নামের ব্যঞ্জনায় নয়। কেননা, 'নাম যাই থাকুক, সুন্দরবন চিরকাল আছে। হয়ত পূর্বে যেখানে ছিল, এখন সেখানে নেই। কিন্তু ইহা চিরকাল গঙ্গা বহু শাখা-প্রশাখায় বিভক্ত হইয়া যেখানে সমুদ্রে পতিত হইয়াছিল, সেই স্থানের বেলা ভূমির উপরিভাগ জঙ্গলাকীর্ণ হইয়া সুন্দরবনে পতিত হয়।' সতীশচন্দ্র মিত্র যশোহর-খুলনার ইতিহাস (প্রথম খণ্ড, পৃ. ৫০)-এ এমন স্পষ্ট ইঙ্গিত দিয়েছেন।

এ প্রসঙ্গে বলা ভালো সুন্দরবনের 'নামরহস্য' নিয়ে নিয়ে প্রাচীন ও ঐতিহাসিকগণ নামকরণ এর পাশাপাশি আধুনিক অনুমান নির্ভর নামকরণের ক্ষেত্র সমীক্ষায় দেখা যায় বিভিন্ন যুক্তি। অবশ্য প্রত্যেক গল্প লেখক বা গবেষকগণ নিজস্ব অনুসন্ধানকারী নামের বদলে প্রত্যেকে সুন্দরবনকামী মানুষের পোষাকী 'সোঁদরবন' নামটিকে সকলে শেষ পর্যন্ত মেনে নিয়েছেন। তবে সুন্দরবনের নাম 'সুন্দরবন' কবে থেকে প্রচলিত বা কোনো সুনির্দিষ্টভাবে ইতিহাসে নেই। তবে সুন্দরবন নামটির তাৎপর্য বিশ্লেষণ করতে এসে ভিন্ন ভিন্ন মতবাদ আমাদের সামনে এসে দাঁড়ায়। প্রথমে সুন্দরবন সম্পর্কিত বিভিন্ন লিখিত গ্রন্থ সম্পর্কে একটি আলোকপাত করে পরবর্তীতে একটা সিদ্ধান্তে পৌঁছানোর চেষ্টা করব। এক্ষেত্রে সুন্দরবন সম্পর্কে লিখিত গ্রন্থ থেকে (table work) টেবিল ওয়ার্কের মাধ্যমে একটা সিদ্ধান্তে আসা যেতে পারে। প্রথমে সতীশচন্দর মিত্র মহাশয়ের 'যশোহর খুলনার ইতিহাস'-এর কথা বলা যেতে পারে। এরপর সুভাষচন্দ্র নস্করের 'দক্ষিণ বঙ্গের লোকসমাজে মন্ত্র'-এ আধুনিক নামকরণের ক্ষেত্রে সতীশচন্দ্র মিত্র মহাশয়কে অনুসরণ করেছেন কিছুটা, যেমন সুন্দরবনে সুন্দরী (Heritiers Minor) নামে একপ্রকার গাছ যে সুন্দরবনে প্রচুর জন্মাত এবং এই কাঠের রং লাল ও দেখতে সুন্দর। ফলে লাল এবং সুন্দর বলেই গাছের নাম সুন্দরবন বা সুন্দরীবৃক্ষ। জঙ্গলে এই বৃক্ষের আধিক্য হেতু বনভাগের নাম– 'সুন্দরীবন', 'সুঁদরীবন', 'সোন্দরবন', 'সুন্দরবন'।

দিলীপকুমার নাহা 'প্রান্ত সুন্দরবনের কথ্যভাষা'য় লিখিত গ্রন্থে নামকরণের ক্ষেত্রে ছয়টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। সেক্ষেত্রে তাঁর মত এক হলেও একটু স্বতন্ত্র, তিনি প্রাকৃতিক উপাদান এখানকার প্রধান বৈশিষ্ট্য হেতু বনভূমিতে 'সুন্দরী' নামক গাছের কথাই বলেছেন। সেক্ষেত্রে 'সুন্দরী' একই মত পোষণ করেছেন। এছাড়া শঙ্করকুমার প্রামাণিকের 'সুন্দরবন-জল-জঙ্গল-জীবন' পরিচায়িকার নামকরণটি অন্যমাত্রা দান করে। তবে কমল চৌধুরী– 'চব্বিশ পরগণা উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন' গ্রন্থেও ছয়টি সূত্রের উল্লেখ করেছেন। তিনিও এক্ষেত্রে সুন্দরীগাছের আধিক্যের কথা বলেছেন। এছাড়া এ.এফ.এম. আবদুল জলিল 'সুন্দরবনের ইতিহাস'-এর নামকরণের ক্ষেত্রে তিনি স্পষ্টই সুন্দরবনের নামের উৎপত্তি সম্পর্কে বলেছেন, 'সুন্দরী বৃক্ষের প্রাচুর্যের জন্য সুন্দরবন মনোরম ও সুন্দরবনানী বলিয়া সুন্দরবন।' এর সঙ্গে বিভারিজ সাহেবের তিনটি মতকে তিনি প্রাধান্য দিতে চান। যেমন-'সুন্ধা' নামক নদী থেকেই সুন্দরবন। 'চন্দ্রবন' থেকে সুন্দরবন এবং 'জগুভগু' শব্দ থেকে সুন্দরবন। রঞ্জন চক্রবর্তী, ইন্দ্রকুমার মিস্ত্রী 'সুন্দরবনের অর্থনীতি, জনসংস্কৃতি' ও পরিবেশ গ্রন্থে সুন্দরবনের নামকরণ প্রসঙ্গে বলেছেন, 'বেশিরভাগ পণ্ডিতের মতে সুন্দরী বৃক্ষের আধিক্য থাকার জন্যই সুন্দরবন নাম।' পাশাপাশি নামের উৎপত্তি;

তার সপক্ষে ফারমিংগারের রিপোর্ট থেকে পাওয়া তথ্যটির কথা উল্লেখ করেছেন। কিন্তু একইভাবে কমল চৌধুরীর 'চব্বিশ পরগণা উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন' গ্রন্থে চব্বিশ পরগণা ডিস্ট্রিক্ট হ্যাণ্ডবুক-এর উল্লিখিত বিষয়টি এক হলে, ফারমিংগারের মতটিকে উভয়ে গ্রহণ করে থাকবেন। আবার, শিবশঙ্কর মিত্র, 'সুন্দরবন সমগ্র'তে নামের ক্ষেত্রে 'সুন্দরী' বৃক্ষের কথা বলেছেন। তবে বিকাশ কান্তি সাহা 'সুন্দরী সুন্দরবন' গ্রন্থে 'সুন্দরী' বৃক্ষের আধিক্যকে মেনে বনাঞ্চলের নাম সুন্দরবন এই মত পোষণ করেছেন। এছাড়া নদী-নালা সুন্দরবাঁধ দ্বারা পরিবেষ্টিত বলে অনেকে বলেন 'সুন্দরীবাঁধা' এই থেকে নাম হয়েছে সুন্দরবন।

তবে সম্প্রতি ২০০৯ ফেব্রুয়ারিতে প্রকাশিত মুহম্মদ অলি উল্লাহ 'সাতপীরার উপকথা : স্বরূপ ও স্বতন্ত্র' গ্রন্থে নামকরণের ক্ষেত্রে আটটি সূত্রের উল্লে করলেও তিনিও 'সুন্দরী' গাছের আধিক্যের কথা অবশ্য স্বীকার করেছেন। এরূপভাবে হয়তো পূর্ববর্তী ও পরবর্তী আরো গ্রন্থ লেখক কিংবা নতুন নতুন গবেষকগণ সুন্দরবন নামকরণের ক্ষেত্রে সুন্দরী গাছের আধিক্যকে স্বীকার করে নিয়ে নতুন ভাবনা-চিন্তা করবেন, একথা বলা যেতে পারে।

সহায়ক গ্রন্থ

১। শিবশঙ্কর মিত্র, সুন্দরবন সমগ্র, আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ৩য় মুদ্রণ, আগস্ট ২০০১, কলকাতা।

২। সতীশচন্দ্র মিত্র, যশোহর-খুলনার ইতিহাস, ১ম খণ্ড, দে'জ পাবলিশিং, জানুয়ারি, ২০০১, কলকাতা পুস্তক মেলা।

৩। কমল চৌধুরী, চব্বিশ পরগণা উত্তর-দক্ষিণ-সুন্দরবন, দে'জ পাবলিশিং, প্রথম প্রকাশ, ডিসেম্বর, ১৯৯৯, কলকাতা।

৪। এ.এফ.এম আবদুল জলিল, সুন্দরবনের ইতিহাস, প্রথম ভারতীয় সংস্করণ, ২০০০, নয়া উদ্যোগ, কলকাতা।

নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের শিক্ষা ও সমাজ চেতনা (১৮৮০-১৯৪৭)

শ্যামা প্রসাদ মণ্ডল*

হিন্দু ধর্মের আকর গ্রন্থ ঋগ্বেদে জাতিভেদের উল্লেখ থাকলেও চণ্ডাল কথার উল্লেখ নেই। বেদান্তের কালে ১০০-৬০০ খ্রিস্টাব্দে বেদ ভিত্তিক সাহিত্যেই প্রথম চণ্ডাল জাতির ছয় ছয়বার উল্লেখ পাওয়া গিয়েছে। চণ্ডালদের পেশা ছিল কৃষিকাজ। কৃষিকাজের সাথে আরো কিছু আনুসাঙ্গিক পেশা ছিল তাদের। নিজ পেশায় তারা ছিলেন অসম্ভব দক্ষ জাতি। জনসংখ্যার দিক দিয়ে একালের নমঃশূদ্র কিংবা সেকালের চণ্ডালেরা ছিল পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে বড়ো হিন্দু জাতি।[১] বাঙলার নমঃশূদ্র কৃষকেরা তাদের নেতৃত্বকে শ্রদ্ধার সাথে হৃদয়ের মণিকোঠায় বসিয়ে রেখেছিলেন ততদিন যতদিন কৃষকের দুঃখ, কষ্ট ও যন্ত্রণাকে স্বজাতি নেতৃবৃন্দ প্রবলভাবে গুরুত্ব দিয়েছিলেন। উচ্চবর্ণের সামন্ত প্রভুরা নিম্নবর্ণের কৃষকদের নানাভাবে হয়রানি করতেন, নানা প্রক্রিয়ায় শোষণ করতেন, তা সত্ত্বেও নিম্নবর্ণের শিক্ষিত সম্প্রদায় ভদ্রলোক রাজনৈতিকদের সংস্পর্শে গিয়ে তাদের অধিনতা মেনে নিতে লাগলেন এবং ভুলে যেতে থাকলেন পিছনের ইতিহাস।

সাধারণভাবে মত্ত শব্দ থেকে মতুয়া শব্দের উৎপত্তি হয়েছে। মতুয়া শব্দের ভাবগত ব্যাখ্যায় এই ধর্ম প্রবর্তনার প্রথম থেকে আজ পর্যন্ত নানা ভাবে ব্যক্ত করা হয়েছে। মতুয়ারা শুধু ব্যক্তি প্রেমে মাতোয়ারা নয়, শক্তি ও বীর্যের সাধনায়ও তারা মত্ত। শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিতে বলা হয়েছে: মতুয়া এই নীতি, নিত্যপথে করে গীত / অনিত্য সংসার চক্রে কিছু মাধ্য নাই / শান্তি নিয়ে তাঁর খেলা, শক্তিকে করিয়ে ভেলা / শক্তি সিন্ধু মাঝে চলে মাতিয়া সবাই।[২] তবে মতুয়া শব্দের আদি পুরুষ ছিলেন রামদাস ব্রহ্মচারী।

মানবসভ্যতার আদি কাল থেকে ভারতীয় সমাজ শ্রেণি, বর্ণ ও কৌমে বিভক্ত ছিল। তাই তাদের ধর্মবিশ্বাস এবং সংস্কারও বিভিন্নরূপে বর্তমান। তবে সময়ের দীর্ঘ যাত্রাপথে বিভিন্ন ধর্মবিশ্বাস ও সংস্কারের জনগোষ্ঠী পারস্পরিক মিলন ও বিরোধের মধ্য দিয়ে সমন্বয়ের পথে অগ্রসর হয়। ভারতে আর্যদের আগমন, তাদের প্রভাব বিস্তার ও আর্য ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অভিঘাতে নমঃশূদ্র জনগোষ্ঠী পিছিয়ে পড়ে এবং তারা বৌদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করে পুনরায় উঠে আসার চেষ্টা করে। তাদের জীবনে নেমে আসে অনগ্রসরতার অভিশাপ আর আর্থিক অনটন। এই আর্থিক অনটনে তারা সমাজে পরিচিতি পায় পতিত জাতিরূপে। তারা কৃষিকাজ, নৌচালনা, মৎসজীবী প্রভৃতি জীবিকা গ্রহণ করে। কেউ কেউ পরিসংখ্যানের সাহায্যে বিশ্লেষণ করে দেখতে পারেন কোন জাতির লোক লৌকিক বৃত্তি পরিত্যাগ করে অন্য পেশা ধরেছেন।[৩]

রাজনীতিতে প্রবেশের অনেক আগে থেকেই নমঃশূদ্রদের মধ্যে শুরু হয়ে যায় সামাজিক জাগরণ ও শিক্ষা বিস্তারের আন্দোলন। অধ্যাপক নরেশচন্দ্র দাস তাঁর সুবিখ্যাত 'নমঃশূদ্র সম্প্রদায়

* গবেষক, ইতিহাস বিভাগ, রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

ও বাংলাদেশ' গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, ঢাকার নমঃশূদ্র নেতা রাম কিঙ্কর রায় (১৮৩৩-১৯১২)-এর নেতৃত্বই এই সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষা বিস্তার শুরু হয়। তাঁর বাড়ির ভৌগলিক অবস্থানগত সুবিধার সুবাদে তিনি স্বজাতি ও স্বসমাজে শিক্ষা বিস্তারে অগ্রপথিকের ভূমিকা গ্রহণ করেছিলেন। এই জেলার ড. দীনবন্ধু মণ্ডল ১৮৯৬ সালে ডাক্তারি পাশ করে এ সমাজের প্রথম সরকারি ডাক্তার হন। অবশ্য যুগনায়ক গুরুচাঁদ ঠাকুর (১৮৪৭ - ১৯৩৭)-ই সর্বপ্রথম ১৮৮১ সালে খুলনার দত্তডাঙ্গা গ্রামে নমঃশূদ্র সম্মেলন করে গ্রামে পাঠশালা স্থাপনের আহ্বান জানিয়েছিলেন। তাঁর আহ্বানে সাড়া দিয়ে নমঃশূদ্র অধ্যুষিত বিভিন্ন গ্রামে বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয় এবং এই সম্প্রদায়ের লোকদের মধ্যে দ্রুত শিক্ষার প্রসার ঘটে। ১৯০২ সালে নমঃশূদ্র সমাজের প্রথম গ্রাজুয়েট হন পাবনার কেশবলাল সরকার এবং দ্বিতীয় ও তৃতীয় হন যথাক্রমে ফরিদপুরের কোটালিপাড়ার সিদ্ধেশ্বর হালদার (১৯০৪) ও খুলনার কুমুদ মল্লিক (১৯০৬)। এই সমাজ থেকে প্রথম ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেটের পদও অলঙ্কৃত করেছিলেন কুমুদ বিহারী মল্লিক। ওড়াকান্দির ভীষ্মদেব দাস ছিলেন এই সমাজের প্রথম উকিল। এমনিভাবে শিক্ষা প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে সামাজিক সচেতনতাও বৃদ্ধি পায়।

১৮৮০-১৯২৫ এই সময়কালে খ্রিস্টান মিশনারীরাও একটা ভূমিকা পালন করেছিল। মিশনারীরা বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, যশোর অঞ্চলে তারা বহুদিন ধরে কাজ করছিল। এই কাজের ফলে সেখানের সমাজে একটা প্রভাব পড়েছিল গুরুচাঁদ ঠাকুরের বাড়িতে যাতায়াতের ফলে নমঃশূদ্রদের নিজস্ব ধর্ম 'মতুয়া ধর্ম' প্রতিষ্ঠিত ও প্রচারিত হয়েছিল। গুরুচাঁদ সেই ধর্মের প্রধান ও সেই ধর্মীয় নমঃশূদ্র সমাজের গুরু ও নেতার পদে মান্যতা পেয়েছিলেন। ১৮৮০-৮৫ থেকে ১৯২০-২৫ সময়কালে নমঃশূদ্রদের একটু ভাল থাকা থেকেই নমঃশূদ্ররা তাদের সামাজিক মর্যাদার কথা তুলতে লাগে। উপনিবেশিক সরকারের লোকগণনা রিপোর্টে পূর্ব বাংলার বলিষ্ঠ জনগোষ্ঠী নমঃশূদ্রদের চণ্ডাল নামে উল্লেখ করা হত। এমনকি সরকারি জমি জরিপে চণ্ড লেখা হত। ১৯১১ খ্রিস্টাব্দে সেন্সাসের রিপোর্টে নমঃশূদ্রদের চণ্ডালের পরিবর্তে নমঃশূদ্র লেখা হত। 'চণ্ডাল' নামের পরিবর্তে 'নমঃশূদ্র' নাম চাওয়া হল, দেওয়াও হল অথচ আজও জানা যায়নি নমঃশূদ্র শব্দটিতে কি বোঝানো হল।

শ্রী গুরুচাঁদ ঠাকুর ছিলেন স্বশিক্ষিত তাই সকলের শিক্ষা গ্রহণের প্ররোচনা দিয়ে বিদ্রোহী করে তুলেছিলেন। গুরুচাঁদ ঠাকুরের পিছনের মানুষদের টেনে উপরে তোলার প্রক্রিয়ার মধ্যেই ছিল বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি। হীনমন্যতা মানুষকে ছোটো হতে শেখায়। সুশিক্ষার মধ্যে দিয়ে সমকক্ষ হওয়াতে বিশ্বাস করতেন গুরুচাঁদ ঠাকুর। শিক্ষা প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন— খাও বা না খাও তাতে কোনো দুঃখ নাই। / ছেলে পিলে শিক্ষা দাও এই আমি চাই।[৪]

গুরুচাঁদ তাঁর নিজ পরিবারের মধ্যে বিদ্যার প্রসার ঘটাতে মনোনিবেশ করলে তাকে সহযোগীতা করেন স্ত্রী সত্যভামা দেবী। নিজ বাড়িতে গড়ে তোলেন শিক্ষাকেন্দ্র। তাদের ধারণা ছিল অন্যরাও তাদের দেখানো পথে অনুসরণ করবে। আদর্শ দেখাতে প্রভু নিজ কর্ম করে / পাঠশালা দেয় পুত্র বিদ্যাশিক্ষা তরে।[৫]

বারিশাল জেলার চাঁদসী গ্রামে পদ্মলোচন দাস ও তার পুত্র মোহিনী দাসের হাত ধরে এক চিকিৎসা ব্যবস্থার উদ্ভব হয় যা চাঁদসী চিকিৎসা ব্যবস্থা নামে পরিচিত। এই চিকিৎসা ব্যবস্থা

এতটাই সুফল বহন করেছিল যে এর সুবাদে নমঃশূদ্র জাতি ইংরেজদের অনুগ্রহ লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। 'সম্রাট পঞ্চম জর্জ রাজপরিবারের ক্ষত চিকিৎসার জন্য ড. মোহিনী দাসকে তৎকালীন গভর্ণর জেনারেল লর্ড চেমস ফোর্ডের পারফতে আমন্ত্রণ করিয়াছীলে (১৯২০ খ্রিঃ লাটভবন)।' এর থেকে বোঝা যায় যে উপযুক্ত সুযোগ-সুবিধা পেলে এই চিকিৎসা ব্যবস্থা যে বিশেষ কল্যাণ সাধন করতে পারত সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।[৬] রাজনীতি প্রসঙ্গে গুরুচাঁদ বলেন, কিবা বিদ্যা, কিবা ধন, কিবা শিল্পে, কিবা বিজঙ্গনে / রাষ্ট্রনীতি ক্ষেত্রে রাজ-কাজে। / সবখানে থাকা চাই, তা ভিন্ন উপায় নাই। / রাজবেশে সাজ রাজ-সাজে।[৭]

ঊনবিংশ শতাব্দীত বিভিন্ন অন্ত্যজ শ্রেণি নিমজ্জিত অন্ধকারে থেকে নিজেদের মুক্তির উদ্দেশে শুরু করে আত্মজাগরণের আন্দোলন। অন্ত্যজ শ্রেণির শিক্ষিত প্রতিনিধিরা নিজেদের সম্পর্কে সচেতন হন এবং নিজ জাতিগোষ্ঠির উন্নতির চেষ্টা করেন এই আন্দোলনকে Self Respect Movement বলা যেতে পারে। শিক্ষা জাগায় চেতনা, চেতনা আনে মুক্তি। উপনিবেশিক শাসনকালে আধুনিক পাশ্চাত্য শিক্ষা পশ্চাৎপদ জাতিগুলিকে যে প্রভাবিত করেছিল তার সুস্পষ্ট ইঙ্গিত পাওয়া যায় পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রসার ও বর্হিজাগতিক জ্ঞানের প্রসারের ফলে। কোনো জাতির অগ্রগতির পথে কবি, সাহিত্যিক গোষ্ঠি বিশেষ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার আলো প্রবেশের পর এই জাতির অগ্রগতির পথকে প্রশস্ত করেছেন এই সম্প্রদায়ের কবি দ্বিজকানাই। তিনি রচনা করেন 'মহুয়া' কাব্য গ্রন্থ, যার কাব্য মূল্য অপরিসীম। তারকচন্দ্র সরকার রচনা করেন 'শ্রী শ্রী হরি হরিচাঁদ চরিত'। শ্রী মহাপন্দ হালদার রচনা করেন 'শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত'। আরো পরবর্তীকালে কবি ও সাহিত্যিক শ্রী জলধর বিশ্বাস তাঁর লেখা 'ডালি' ও ইংরাজি কবিতা 'To my love' প্রভৃতি কবিতা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই সকল কবি ও সাহিত্যিক তাদের লেখনির মাধ্যমে জাতির আত্মজাগরণের পথকে প্রশস্ত করেছিলেন। নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের মধ্যে শিক্ষার যে প্রসারের প্রতিফলন ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পরেও। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর বাংলার বিভিন্ন প্রান্ত থেকে প্রকাশিত হতে থাকে নানান সাহিত্য পত্রিকা। এই বিষয়ে শ্রী মজুমদার পাথেয় শ্রী মনোরঞ্জন বড়াল সম্পাদিত 'কোনপথে শ্রী যোগেশচন্দ্র বিশ্বাস' ও অন্যান্য সম্পাদিত 'সমকাল' ও 'ভারতবাণী' প্রভৃতি বিশেষ উল্লেখযোগ্য যা জাতির আত্মজাগরণের পথকে সুগম করেছিল।

আবার এই সময়ে প্রকাশিত কতগুলি পত্রিকা ও পুস্তক এদের জাগরণের পথকে প্রশস্ত করে। ১৯১২ সালের পূর্বে গুরুচাঁদ ঠাকুরের সম্পাদনায় ওড়াকান্দি থেকে প্রকাশিত হয় 'নমঃশূদ্র সুহৃদ' পত্রিকা। এই সকল পত্রিকা এদের মধ্যে সামাজিক অধিকারবোধ জাগ্রত করতে সহায়তা করে। অনেক সময় উচ্চবর্গীয় সমাজ দরদীও এই সকল পত্রিকায় তাদের প্রবন্ধ লিখতেন যেমন শ্রী দিগিন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য নমঃশূদ্র পত্রিকায় 'নিপীড়িতের উত্থান' নামে একটি প্রবন্ধ লেখেন যদিও পরবর্তীকালে এই প্রবন্ধের কিছুটা পরিবর্তন করে 'নিপীড়িতের নিদ্রাভঙ্গ' নামে তাঁর 'জাতিভেদ' নামক বিখ্যাত গ্রন্থে পুনর্মুদ্রিত করেন। এই সময় নমঃশূদ্র সংঘ নামে আরো একটি পত্রিকা প্রকাশিত হয়। এই সকল পত্রিকা এদের সামাজিক শিক্ষাকে সর্বস্তরে আরো বেশি প্রভাবিত করে।

খুলনা জেলার নমঃশূদ্র সম্মেলনে রাজনীতিগতভাবে ক্ষমতার কেন্দ্রে পৌঁছানোর দাবি জোরদার হয়ে উঠেছিল। শিক্ষিত হয়েও তারা চাকুরিতে প্রবেশের অধিকার পাচ্ছিলেন না। শিক্ষিত হয়ে ওঠা নমঃশূদ্রদের এই সমস্যা নিয়ে ১৯০৭ সালে মিড সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন গুরুচাঁদ ঠাকুরের নেতৃত্বে এক প্রতিনিধিদল তদানীন্তন বাঙলা ও আসামের গভর্ণর হেয়ার সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন এবং নমঃশূদ্র পরিবারের উচ্চশিক্ষিতদের বেকার থাকার ঘটনা অবহিত করান। এই সাক্ষাৎকারের কিছু দিনের মধ্যেই কুমুদবিহারী মল্লিক, শশিভূষণ ঠাকুর, তারিণীচরণ বালা সরকারি চাকরিতে যোগ দেন। প্রাক্-পলাশি যুগে কোনো নমঃশূদ্র চাকরিজীবী ছিলেন না এবং এই সময়ে তারা প্রথম শাসন ক্ষমতার কাছাকাছি আসতে পারলেন। এ দিয়ে উঁচুবর্ণের মানুষের কাছে থেকে আদায় করে নিতে পেরেছিলেন সম্মান।[৮]

প্রকৃতপক্ষে মতুয়াতত্ত্ব দর্শনজাত নারী স্বাধিকার অর্জন আন্দোলনের প্রথম পর্ব সূচিত হয়েছিল যুগাবতার ঠাকুর শ্রী শ্রী হরিচাঁদের সমকালীন সময়। দ্বিতীয় পর্বে তারই নির্দেশিত পথে ধর্ম ও জীবন আচরণে নারীর স্বাধিকার প্রতিষ্ঠা আন্দোলনের সুযোগ্য উত্তরসূরি ছিলেন তার পুত্র যুগনায়ক ঠাকুর শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ। বস্তুত ঠাকুর কোনো সমাজ-সংস্কৃতিতে শিক্ষার মূল্যবোধ কতটা খাঁটি তা স্থির করা যায় নারীকে শিক্ষার আওতায় আনা হয়েছে কিনা তা থেকে। পোড়খাওয়া স্বার্থপর আত্মকেন্দ্রিকতা, নিরঙ্কুশ ক্ষমতাপ্রিয়তা ও আগ্রাসী আধিপত্যবোধকে কতটা সংযম করতে সক্ষম হয়েছেন তা বুঝতে পারা যায় বিবাহ ও সংসারধর্ম পালনে নারীর মতামত প্রয়োগের অধিকার কতটা স্বীকৃতি পেয়েছে তা অনুধাবনের মধ্যে। নারীর বৃত্তি, উৎপাদন ব্যবস্থায় নারীর পোশাক পরিচ্ছেদের প্রতি তিনি নজর রেখেছিলেন। সমাজে মেলামেশার সুযোগ জনজীবনে অংশগ্রহণ করার স্বাধীনতা এবং সমাজের উন্নতি বৃদ্ধিতে নারীর স্থান নির্ণয়ের কঠোর সত্যকে দৃঢ়ভাবে মোকাবিলার আহ্বান জানিয়েই যেখানে তিনি নারী জাগরণ আন্দোলনের সূত্রপাত করেছিলেন যা সামাজিক ও অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এক আমূল পরিবর্তনের পথ সূচিত হয়।

যুগসচেতন ঠাকুর গুরুচাঁদ এই উপলব্ধিতে উপনীত হয়েছিলেন যে বিংশ শতকের সাংস্কৃতিক চেতনার পরিবর্তনের মূলে আছে পরিবার ও গৃহজীবনের ধারার আমূল পরিবর্তন। এই সময়ে জীবনের বাইরে সর্বক্ষেত্রে নারীমুক্তির চেতনা প্রসারিত হয়েছে এবং গৃহজীবনের প্রবেশ বিপুল জগতে পুরুষের পাশাপাশি নারী ও কর্মের জগতে প্রবেশ করা আরম্ভ করেছে। সুতরাং সমাজে ও সংসারে নারীকে সমান অধিকারের উপযোগী করে তোলার জন্য চাই তার প্রয়োজনীয় পারিপার্শ্বিকতা ভিত্তিক উপযুক্ত শিক্ষার ব্যবস্থা।

পশ্চাৎপদ শ্রেণির মানুষের মধ্যে শিক্ষার প্রসার ঘটানোর উদ্দেশ্য ঠাকুর গুরুচাঁদ ১৮৮০ খ্রিস্টাব্দে জন্মস্থান ওড়াকান্দিতে প্রথম প্রাথমিক স্কুল স্থাপন করেন যা ১৯০৮ সালে হাই ইংলিশ স্কুলে উন্নীত হয়। এছাড়া ক্ষেত্রানুসন্ধানে জানা যায় ১৯৩২ খ্রিস্টাব্দে তার উদ্যোগে ওড়াকান্দিতে শ্রী শ্রী হরিগুরুচাঁদ মিশন স্থাপিত হয়। এই সময় শিক্ষক-শিক্ষণেরও ব্যবস্থা করা হয়। তদুপরি তখনকার জিটি (গুরু ট্রেনিং) স্কুলে যারা শিক্ষকতার ট্রেনিং নিতেন তাঁরা গুরুচাঁদের আদেশ শিরোধার্য করে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, জেলা থেকে জেলায় শিক্ষা বিতরণে ও শিক্ষা প্রসারে প্রাণপাত করতেন।

ঠাকুর গুরুচাঁদ ইংরেজ আমলে অনুন্নত শ্রেণির জন্য প্রথম প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন এবং শিক্ষা প্রসারে ও মানোন্নয়নে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সফল প্রচেষ্টা চালিয়েছেন। ড. আম্বেদকরও অনুরূপভাবে বৃহত্তর ক্ষেত্রে স্কুল, কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয় ও ছাত্রাবাস নির্মাণের উদ্যোগ নিয়েছিলেন এবং নিঃস্ব ও গরিব সমাজের মানুষের মধ্যে বাধ্যতামূলক সর্বজনীন ও অবৈতনিক শিক্ষাব্যবস্থা গ্রহণের জন্য স্বাধীনতা লাভের আগে থেকে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত সরকারের ওপর চাপ সৃষ্টি করেছেন। শিক্ষার যথেষ্ট অগ্রগতি হলেও এই শিক্ষা আজও মানুষের মৌলিক অধিকার হিসেবে গৃহীত হয়নি।

গুরুচাঁদ ছিলেন আধুনিক মনস্ক। তিনি মনে করতেন যে প্রতিটি মানুষ শিক্ষা পেয়ে হয়ে উঠবে সংস্কৃতিবান ও বিশেষজ্ঞ। আত্মোন্নতির সঙ্গে সমাজের, দেশের ও জাতির উন্নতি সাধন হবে শিক্ষার মূল কথা। তার শিক্ষা থেকে প্রকাশ পাবে তার জীবনের পরিচয়, পরিণতির প্রতিটি ধাপেই তাকে সকল প্রতিকূলতার পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে জীবন ও জাতিকে সমৃদ্ধ করতে হবে।

১৯৩০-এর খুলনা জেলা নমঃশূদ্র সম্মেলনে সভাপতির দায়িত্ব পালন করেছিলেন মতুয়া ধর্মান্দোলনের অবিসংবাদিত নেতা ও সংগঠক গুরুচাঁদ ঠাকুর। বৈষয়িক ও সামাজিক বিকাশের জন্যে দলীয় রাজনীতির কথা সভায় স্পষ্ট করে জানিয়ে ছিলেন।[৯] এই ঘোষণার আগে গ্রাম বাঙলার দরিদ্র চাষিদের মন জয় করেছিলেন তিনি। তাঁর অতুলনীয় সংগঠনীক্ষমতা দিয়েই তিনি তা করতে পেরেছিলেন। ১৯৩৫ সালে গুরুচাঁদ ঠাকুরের দেহান্তরের পর তরুণ বয়সের রাজনৈতিক কর্মী জগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, বিরাটচন্দ্র মণ্ডল সহ আরো কিছু নেতাদের সহযোগিতায় নমঃশূদ্রদের ঐক্যের প্রয়াস চালিয়ে যান এবং ১৯৩৭-এর সাধারণ নির্বাচনে বাখরগঞ্জ অসংরক্ষিত কেন্দ্র থেকে যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অশ্বিনী দত্তের ভাইপো জমিদারবংশীয় কংগ্রেস প্রার্থী সরল দত্তকে হারিয়ে বিপুল ভোটে জয়ী হন। একজন সহায়-সম্পদহীন মানুষ কেবলমাত্র জনগণের ভালোবাসায় নির্ভর করে নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন। যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল বরিশাল জেলা কংগ্রেসের সভাপতি অশ্বিনী দত্তের ভাইপো জমিদার বংশীয় জনগণের ভালোবাসায় নির্ভর করে নির্বাচনে জয়ী হতে পারেন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল সেই সাক্ষ্যই বহন করেন।[১০]

বিশ শতকের গোড়ায় ১৯০২ সালে ঢাকায় গঠিত হয়েছিল নমঃশূদ্র হিতৈষিণী সভা। মতুয়া ধর্মান্দোলনের কেন্দ্রভূমি ওড়াকান্দির সঙ্গে যোগাযোগ রেখেই তাঁরা তা করেছিলেন। এর কিছুদিনের মধ্যেই ১৯০৮ সালে যশোহর সম্মেলনে নমঃশূদ্রদের সামাজিক সমস্যাই মূলত প্রধান আলোচনার বিষয়। এরই ফলশ্রুতিতে ১৯১২ সালের পরবর্তীকালে বাংলায় ২২টি জেলায় বেঙ্গল নমঃশূদ্র অ্যাসোসিয়েশন ইউনিট প্রতিষ্ঠা পায় ব্রিটিশের রিপোর্ট থেকে তাদের শক্তিশালী সাংগঠনিক প্রক্রিয়ার কথা জানা যায়।

বেঙ্গল নমঃশূদ্র এ্যাসোসিয়েশনের সর্বভারতীয় রাজনীতিতে অংশীদার হওয়ার কথা মাথায় রেখে ১৯৪২ সালের এপ্রিলে কোলকাতায় এক সম্মেলন করে গঠন করেন বেঙ্গল শিডিউল কাস্ট লীগ এবং তার সভাপতি হন যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল।[১১] তপশিলি নেতাদের অনেকেই তখন কংগ্রেসী রাজনীতির দিকে ঝুঁকেছেন। ব্যতিক্রমী ছিলেন সামান্য কয়েকজন। ১৯৪২ সালে ড.

বি.আর.আম্বেদকরের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় তপশিলি ফেডারেশন নির্মিত হওয়ার পরেই সেদিকেই আনুগত্যের হাত বাড়িয়ে দিলেন যোগেন্দ্রনাথ এবং এই সর্বভারতীয় সংগঠনের বেঙ্গল প্রদেশের সভাপতি হন তিনি। তারই নেতৃত্বে প্রথম প্রাদেশিক সম্মেলন হয় ১৯৪৫ এর এপ্রিলে ফরিদপুর জেলার গোপালগঞ্জ শহরে। তপশিলিরা সর্বভারতীয় রাজনীতির ক্ষেত্রে আলাদা রাজনৈতিক আইডেন্টিটি রক্ষা করে চলবেন বলে বলা হয়। ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে ৩০টি সংরক্ষিত কেন্দ্রের মধ্যে ২৪টিতে কংগ্রেস প্রার্থীর জয়ী হন কিন্তু ফেডারেশন প্রার্থী হিসেবে একমাত্র যোগেন্দ্রনাথ কংগ্রেস ও হিন্দু মহাসভার প্রার্থীকে পরাজিত করেন। এই নির্বাচনে গুরুচাঁদ পৌত্র পি.আর. ঠাকুর, রাজবংশী নেতা প্রসন্নদেব রায়কত এবং নমঃশূদ্র সম্প্রদায়ের সামাজিক জাগরণ ও আন্দোলন চলতে থাকে।

তথ্যসূত্র

১। শেখর বন্দ্যোপাধ্যায়, অভিজিত দাশগুপ্ত (সম্পা.), *জাতি, বর্ণ ও বাঙালি সমাজ*, কলকাতা, ১৯৯৮, পৃ. ১২৭

২। কল্যাণী ঠাকুর চাঁড়াল (সম্পা.), *মতুয়া ধর্ম প্রসঙ্গে*, কলকাতা, ২০১০, পৃ. ৫-৬

৩। প্রাগুক্ত, পৃ. ১১

৪। রসময় বাইন , *শিক্ষার আন্দোলনে গুরুচাঁদ ঠাকুর*, ২৪ পরগনা (উঃ), ২০১৩, পৃ. ৭

৫। মহানন্দ হালদার, *শ্রী শ্রী গুরুচাঁদ চরিত*, ২৪ পরগনা (উঃ), ২য় সংস্করণ, ১৯৮২, পৃ. ১০২

৬। নরেশচন্দ্র দাস, *নমঃশূদ্র সম্প্রদায় ও বাংলাদেশ*, কলকাতা, ১৩৬৮, পৃ. ৪

৭। মহানন্দ হালদার, প্রাগুক্ত, পৃ. ৪৪৩

৮। রাইচরণ বিশ্বাস, *জাতীয় জাগরণ*, কলকাতা, ১৯২১, পৃ. ৬২

৯। মতুয়া মহাসংঘ (প্রকাশিত), *মতুয়া মহাসংঘের লক্ষ্য ও কর্মসূচী*, ২য় সংস্করণ, ঠাকুরনগর, ১৯৮৪, পৃ. ৯-১০

১০। দেবেশ রায়, *বরিশালের যোগেন মণ্ডল* (উপন্যাস), আজকাল, শারদ সংখ্যা, ২০০৫

১১। *অমৃতবাজার পত্রিকা*, ২৪ এপ্রিল, ১৯৪২

ঢোল গোবিন্দের কবিতা : একাকীত্বে স্থবির সময়

সৌমি দাশ*

কবি তুমি এত ক্লান্ত! কবি; একটু পা চালিয়ে, পদাতিক কবি তুমিও মিছিলের শহরে একা হয়েছ একথা আজও কবিতা ভোলেনি। রাজনীতি আর কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় একসময়ে সমার্থক হয়েছিল; সেই তিনিই মিছিলের জোয়ারে মানুষের ভিড়ে হাঁটতে হাঁটতে একদিন একা হয়ে গিয়েছিলেন। জীবনের নানান চড়াই উৎড়াই পেরিয়ে যে সময় পদাতিক কবি কোথাও হোঁচট খেয়ে একটু দাঁড়িয়ে গিয়েছেন ক্লান্তিতে সংকটে সে সময়কেই ফিরে দেখার তাগিদ অনুভূত হয় যখন আজকের সমাজের ক্লেদ আর অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে আমরা নিজেরাও ক্লান্তিতে দীর্ণ, পথভ্রষ্ট, কোথায় যেন একাকার হয়ে যায় বোধ আর ভাবনাগুলি।

যে কবি মিছিলের ভিড়ে স্বস্তি খুঁজে পেতেন, যিনি শ্লেষ, ব্যঙ্গ বিদ্রুপে ক্ষুরধার, জনযুদ্ধের গানে সজাগ সেই সুভাষ মুখোপাধ্যায় জীবনের শেষপর্বের মৌলিক কবিতার সৃজনে সম্পূর্ণ অচেনা মানুষ।

১৯৮০-তেই কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায় ছেড়ে যান তাঁর প্রিয় পার্টি সি. পি. আইকে। ছেড়ে দেন সর্বক্ষণের সদস্যপদ। কথায় আর কাজের বিস্তর ফারাক মতাদর্শগত অমিল ইত্যাদি নানান কারণে রাজনীতি থেকে সরে আসতে বাধ্য করে কবিকে। সুভাষ এমন একজন কবি ব্যক্তিত্ব যিনি রাজনীতি থেকে সরে যাওয়া; রাজনীতির আঙিনাকে দরিদ্র করেছে। কবি বুঝতে পারেন বিশ্বাসের ভূমি কোথাও যেন টলে যাচ্ছে, মতাদর্শগত ভূমি নয়—পার্টি বা দলীয় রাজনৈতিক বিশ্বাসের ভূমি। দল বা পার্টি আজ যেন কোথাও নিজের বলে ভাবতে কষ্ট হচ্ছে। আদর্শহীন সময়, চেতনাকে ভ্রষ্ট করছে অনায়াসে, ক্ষমতার লোভ, অপব্যবহার আদর্শবান কবিকে পার্টি ছাড়তে বাধ্য করেছিল। ১৯৭৯-তে 'একটু পা চালিয়ে ভাই' কাব্যগ্রন্থটি প্রকাশিত হয়। তাকে কেন্দ্র করে সমালোচনা, বিতর্কের ঝড় ওঠে। কী লিখেছেন তা নিয়ে নয়, বইটি কোথা থেকে প্রকাশিত হয়েছে সেটাই কট্টর মার্কসবাদী সমালোচকদের মুখ্য বিষয় হয়ে উঠেছিল। এক তো আনন্দ পাবলিশার্স থেকে প্রকাশিত পাশাপাশি সোভিয়েত কবি সল্‌ঝেনিৎসিন বড়ো মাপের কবি হলেও রাষ্ট্রদ্রোহী, সোভিয়েত সরকারের নিষেধ সত্ত্বেও নোবেল পুরস্কার গ্রহণ করেছিলেন তিনি। এমন অবাধ্য কবির লেখা অনুবাদ করেছেন সুভাষ, এমন লঘু পাপ তাই গুরুদণ্ড স্বরূপ নিন্দার কদর্য কালিমাই প্রাপ্য হয়েছিল কবির।

---

* অধ্যাপিকা, সুরেন্দ্রনাথ কলেজ, কলকাতা।

রাজনীতি কবি সুভাষের শ্বাসে-প্রশ্বাসে, সেই প্রিয় পার্টি ছেড়ে কেমন ছিলেন কবি, বোধহয় তেমন ভালোও ছিলেন না। এই শেষ পর্যায়ের মৌলিক কাব্যগ্রন্থগুলি 'একটু পা চালিয়ে ভাই' (১৯৭৯), 'চইচই-চইচই' (১৯৮৩), 'বাঘ ডেকে ছিল' (১৯৮৫), 'যারে কাগজের নৌকো' (১৯৮৯), 'ধর্মের কল' (১৯৯১), 'একবার বিদায় দেখা' (১৯৯৩), 'ছড়ানো ঘুঁটি' (২০০১)। কাব্যগ্রন্থগুলিতে একধরনের বিষাদ, বিভ্রান্তি, অস্থিরতা, বিশ্বাসের সংকট খুঁজে পাওয়া যায়। মার্কসীয় রাজনীতির সোচ্চার মুষ্টিবদ্ধ মিছিলের আওয়াজ শেষপর্বে স্তিমিত। কবিতায় এক ধরনের চাপা বেদনার সুর সর্বত্র। রাজনৈতিক অতৃপ্তি বোঝাপড়ার অমিল অদ্ভুত বেদনার আকার নিয়েছে, যেমন—'মনে পড়ে কি' কবিতাটির লাইনগুলি—

মনে পড়ে কি?
মনে পড়ে কি
দেয়ালে লেখা
সে সব শপথ
নিশির ডাকে
ভুলতে ভুলতে।

[মনে পড়ে কি : বাঘ ডেকেছিল]

এ-সময় থেকেই কবিতায় নৈরাশ্যবোধ এবং বিদ্রূপ পাশাপাশি ব্যবহৃত হতে থাকে। ভাষার অসামান্য বিন্যাস ও বিশ্বাসের স্থিরতা এ সময়ের কবিতায় দৃষ্ট হয় না। যেখানে মানুষের কথা বলেছেন সে সব কবিতায় ভালোবাসার এক অনুভূতি বারবার হয়তো ফিরে এসেছে। কিন্তু রাজনৈতিক বা সামাজিক চেতনা ঋদ্ধ কবিতায় বিশ্বাসের ভূমি টলমল করেছে, বরং ভাঙনের মর্মন্তুদ আর্তনাদই শোনা গেছে সে সব পঙ্‌ক্তিতে। কোনো বিশ্বাস সেখানে স্থান পায়নি। কেমন যেন অস্বস্তিতে লিখেছেন কবিতাগুলি। রাজনীতি সচেতন প্রশাসনিক ভাবনার কবিতাযাপনে একধরনের অস্থিরতা দেখা গেছে। এ পর্যায়ের আর একটি লক্ষণীয় বিষয়, কবির বাক্‌ভঙ্গি ভীষণ স্পষ্ট, ভাষার কারিগরীতে তিনি অসাধারণ। তবে সমস্ত বিশ্বাসহীনতার মাঝেও সেই লেনিনের কাছে, মানবতার প্রতীক সাম্যবাদের প্রতীকের কাছেই ফিরে গেছেন। এ প্রসঙ্গে 'একটু পা চালিয়ে ভাই' কাব্যগ্রন্থের নাম কবিতাটি উল্লেখযোগ্য:

লেনিনকে আমরা দাঁড় করিয়ে রেখেছি ধর্মতলায়
ট্রামের গুমটির একপাশে।
আস্তাকুঁড়ের ভাত একদল খুঁটে খুঁটে খাচ্ছে
ডাস্টবিনে হাত চালিয়ে দিয়ে।
লেনিন দেখছেন।

.....

হঠাৎ দেখলাম একটু নড়েচড়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন।
যেদিকে তাঁর নজর, সেই দিকে তাকিয়ে দেখলাম
লাল নিশান নিয়ে একদল মজুরের এক বিশাল মিছিল আসছে।
আমার মনে হল, লেনিন যেন চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বললেন,
শতাব্দী শেষ হয়ে আসছে—
একটু পা চালিয়ে; ভাই একটু পা চালিয়ে।

[একটু পা চালিয়ে ভাই]

এ-কবিতা আমাদের অনেকটাই আশ্বস্ত করে, কবি মজুরের মিছিলের সাথেই একাত্ম ছিলেন শেষদিন পর্যন্ত, লেনিন তাঁর ধমনীতে রক্তের মধ্যে মিশে ছিল। বিশ্বাসের অবস্থান শুধু পাচ্ছিলেন না রাষ্ট্রীয় রাজনীতিতে, কর্মকাণ্ডে। হয়তো বিভ্রান্ত ছিলেন, অস্থির নৈরাশ্যের মাঝে একা হয়ে পড়েছিলেন, এক আত্মবিশ্বাসের সংকট তাঁকে এ পর্বে ভীষণ মাত্রায় গ্রাস করেছিল। বিশ্বাস ভাঙেনি তবে বিশ্বাসের চারপাশে এক অন্ধকার বলয় তাকে দুর্বল করে দিয়েছিল।

সমাজ সচেতন পদাতিক জীবনের অন্তরতম সত্তার কবি হয়ে উঠেছেন 'জল সইতে' (১৯৮১) কাব্যগ্রন্থে। 'যাচ্ছি' কবিতাটি তারই চিহ্নবহন করছে। কবিসত্তার এবং কাব্য দক্ষতার চূড়ান্ত নিদর্শন এই কবিতাটি। এ প্রসঙ্গে কবি শক্তি চট্টোপাধ্যায় বলছেন—''যাচ্ছি কবিতার মধ্যে এমন একটা চাপা বিদায়ের সুর আছে, যা খুব কম কবির হাত দিয়ে বেরোতে পারে। একালের একটি শ্রেষ্ঠ কবিতা যাচ্ছি—

ও মেঘ
ও হাওয়া
ও রোদ
ও ছায়া
যাচ্ছি

আট পৃষ্ঠার এই কবিতা যেমন সহজ, তেমনি কঠিন। নয়তো লেখাই যেতো না 'ও দেহ, ও প্রাণ যাচ্ছি।' পড়তে পড়তে গোটা কবিতাটি একটা মন্ত্রের মতো লাগে। এই ভালোবাসা, এই বিদায়—এখন সুভাষদার কবিতায় লেগেছে।" [তিয়াত্তরে পা দিয়ে নিশ্চিন্ত, আনন্দবাজার পত্রিকা ১৪ এপ্রিল ১৯৯২]

কবিতাটি পড়তে পড়তে এক চূড়ান্ত বোধ আমাদের চেতনাকে ঘিরে রাখে। আত্মহননের দীর্ঘযাপিত সুর আর তা থেকে উত্তরণের নিঃশব্দ স্বগতোক্তির সঙ্গে জীবন একাত্ম হয়ে উঠেছে। বলা যায় জীবন থেকে বিদায় নেওয়ার বিষাদ আর যাওয়ার আগেও নতুন এক সত্তায় লীন হয়ে যাওয়ার উল্লাস কবিতার মাঝে যে সঙ্গীত রচনা করেছে তা হয়ে উঠেছে

ভালোবাসার গান। রবীন্দ্র ছিন্নপত্রের মর্ত্যপ্রীতি ভাবনাকেই কোথাও যেন সমর্থন করে কবিতাটি। 'যাচ্ছি' কবিতার অন্তঃস্থলে 'পৃথিবীকে ভালবাসি' ধ্রুবপদ হয়ে কবিতার পায়ে পায়ে জড়িয়ে আছে। এ যেন পৃথিবী থেকে দূরে বহুদূরে চলে যাওয়ার আত্মিক পরিভ্রমণ চিরকালীন যাত্রার এক পথ পরিক্রমা করেছেন পদাতিক।

'জল সইতে' কাব্যগ্রন্থের অধিকাংশ কবিতার শব্দ ভাস্কর্য অসাধারণ। শব্দের অসাধারণ বিন্যাস কবিতাগুলির বৈশিষ্ট্য, পাশাপাশি শ্লেষ, রাগ, অভিমান, ক্ষোভ, নৈতিক অবমূল্যায়ণের প্রতি তীব্র শাণিত পরিহাসপ্রবণ মার্জিত উপস্থাপন। এ পর্যায় অনবদ্য মুন্সিয়ানায় স্বরবৃত্তের দোলায় পরিহাস আর তীব্র কটাক্ষে তরবারি শানিয়েছেন সম্পূর্ণ নতুন ভাবে। এই প্রতিবাদের নির্মাণ সজোরে বুকে গিয়ে লেগেছে; আমরা স্তব্ধ হয়েছি, হয়েছি হতবাক্। 'চইচই'-তেও একই ভাবে বিদায়ের সুর, যন্ত্রণার করুণ আবহ। এখানেও চলে যাওয়ার প্রার্থনা রূপ পেয়েছে কবিতায় 'একা তোকে ফেলে রেখে গেছে প্রত্যেকে' একথা বলেছেন কবি; এ সময় যে সত্যিই বড়ো একা করেছিল তাঁকে। রক্তক্ষরণের চিহ্নগুলিই তাঁর কবিতা শরীরে স্পষ্ট হয়ে আছে।

১৯৮৫-তে প্রকাশিত হয় 'বাঘ ডেকেছিল'। এই কাব্যগ্রন্থের উল্লেখযোগ্য কবিতা 'টানা ভগতের গান' অবহেলিত লাঞ্ছিত সভ্যতার থেকে বহুদূর নিবাসী মানুষগুলির মধ্যে সে মানবিক সৌন্দর্য তিনি দেখেছিলেন তাই এ কবিতায় ফুটে উঠেছে।

১৯৮৯ তে লেখা 'যারে কাগজের নৌকো'-তে, কবিতায় একটি নতুন বাঁক লক্ষ করা গেল। লোকায়ত মেজাজ, ছোটো ছোটো পঙ্‌ক্তির ব্যবহার অসাধারণ ছন্দ, তীর্যক বাক্‌ভঙ্গিতে লিখলেন কাব্যগ্রন্থ। তবে অনেকে মনে করেন এ সময় কবি নিজেকেই অনুকরণ করেছেন। কারণ সময়টা অন্যরকম।

মার্কসীয় ধরতাই বুলি নেই, বরং তা তিনি সমর্থন করছেন না। মার্কসীয় আদর্শে বিশ্বাস হারিয়েছেন এমনটাও নয়, নতুন পরিস্থিতিতে নতুন ভাবে সমাজ বদলের স্বপ্নে বিভোর কবি। মধ্যবিত্ত স্মৃতিকাতরতা এ কাব্যে দেখা গেছে। পসরা নিয়ে বসেন কবি, কবিতার পিতামহ কথক কবি অসাধারণ ভাবে পিতামহের মতোই কবিতার স্মৃতিতে আত্মজৈবনিক ভঙ্গিতে বলে ওঠেন তাঁর উত্তরসূরিদের উদ্দেশ্যে—

বৃষ্টি পড়ছে, তবে তো এক্ষুনি
যেতে হয় রথের মেলায়।
আমি যাচ্ছি। তুই যাবি?
ভিজলে কারও হয় কিছু? ছাই হয়।

মা বাবারা বলতে হয় বলে—
তাও শুধু নিজের ছেলেকে।
ভয় দেখায়, ভয়।

[যারে কাগজের নৌকো]

স্মৃতির নৌকোয় ঘুরে ফিরে বেড়াচ্ছেন কবি। একটা পিছুটান এই প্রবীণ পদাতিকের কবিতাকে ঘিরে ধরেছে বলেই মনে হয়।

আমি রইলাম প'ড়ে
অজলে অস্থলে
মনপবনে দেখবে
ময়ূরপঙ্খী চলে
রওনা হয়ে
কাগজের নৌকো
আর ফেরেনি
বাড়ি মুখো
ভেসে গিয়েছে
আমার সৃষ্টি
চোখের কোণে
নামিয়ে বৃষ্টি।

[যারে কাগজের নৌকো]

নষ্টালজিয়ায় আক্রান্ত কবি। কবিকে ফেলে সময় চলে যাচ্ছে, নৌকায় যাত্রী হতে চান, কবিতায় এক কল্পনার নৌকোর দেখা মেলে, যাত্রারও কোনো দিশা নেই অনেকটাই 'নিরুদ্দেশ যাত্রা'-র মতো, কবির দীর্ঘ জীবনের পথে এ পর্বের কাব্যে দিশাহীন যাত্রার আভাসের পাশাপাশি সেখানে যেতে না পারার বেদনা সংক্রামিত হয়েছে এভাবে :

কানের কাছে বাজছে ভোঁ
মন বলছে যাব যাব
যাওয়ার নেই জো
এখুনি ছিল, এই এখানে, সামনেই
যেই ফেলেছি পলক
আর নেই
হাতে চাবুক, ঘোড়ায় জিন
তর সয়না
আমাকে ফেলে চ'লে যাচ্ছে দিন।

[ফিরি]

বর্তমান যখন প্রায় ঝাপসা, তখন অতীত স্মৃতি নিয়ে জীবনের শেষবেলায় এসে কবি, স্মৃতির সরণীতে পথ হেঁটেছেন ঠিকই, পাশাপাশি গভীর আশা ও প্রত্যয় থেকে ভ্রষ্ট হননি। মানবতার পক্ষে শেষদিন পর্যন্ত প্রত্যয়ী থেকেছেন—

বন্ধ করো ভ্রাতৃযুদ্ধ
যেন কেউ মানুষ মারে না—
ঘরে না, বাইরে না।

আবার আত্মগত যন্ত্রণা থেকে বলছেন—

সেজেগুজে তৈরী হয়ে, কী যন্ত্রণা
বসে রয়েছি কখন থেকে
নিতে এল না।
হাতে কোনো কাজ রাখিনি
টেবিল ধোয়ামোছা
ঘড়ির কাঁটায়
সারাক্ষণ খোঁচা
নিতে এল না
নিতে এল না।

[নিতে আসেনি]

'ধর্মের কল' ১৯৯১-তে প্রকাশিত মৌলিক কবিতার অপর একটি সংকলন। এর কবিতাগুলি সর্বস্তরের পাঠকের মনোযোগ দাবি করে। হালকা চালে, জটিলতার চিহ্নমাত্র নেই সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গিতে লেখা কবিতাগুলি। আবেগের বাহুল্য নেই তবে গদ্যের গতিশীলতা লক্ষণীয়। কাঁচালঙ্কা, গন্ধরাজ লেবু, আলনা, হাতপাখা ইত্যাদি আপাত তুচ্ছ বস্তু অসাধারণ হয়ে উঠেছে কবিতায়।

চলে যেতে চান অদ্ভুত নিরাসক্ত ভঙ্গিতে—

কেউ যেতে বললে হয়
আমি অমনি
এক পায়ে খাড়া
.....
সেজেগুজে ফিটফাট
আমি তৈরী।

[যেতে বললে]

আবার নিজেই যেতে চাননি, এই জীবন, পৃথিবীর টুকরো টুকরো স্মৃতিকে ছেড়ে, বাঁচতে চেয়েছেন সব কিছুর শেষে—

এমন মজার খেলাঘর ছেড়ে
দূর! এখন কে যায়।

[এখন কে যায়?]

জীবনের শেষদিন পর্যন্ত বিশ্বাসের সঙ্গে কোনো রফা করেননি—

হাওয়ার উল্টোমুখে
শক্ত করে মাটিতে পা টিপে টিপে চলেছি।

[ধর্মের কল]

এ বই-এর শেষদিকের কবিতাগুলি হালকা চালে ছোটোদের ছড়ার মতো; এগুলিও বেশ উপভোগ্য। 'একবার বিদায় দেখা' (১৯৯৫) কাব্যগ্রন্থের কবিতাগুলিও সৌকর্যে অসামান্য। স্তবক বিন্যাসের পরীক্ষা-নিরীক্ষা দেখবার মতো।

অনেকেই এ সময়ের কবিতার বেদনাকে কৃত্রিম বলেছেন। তাঁর পার্টি থেকে সরে আসা বা রাজনৈতিক স্ট্যাণ্ডকে ভুল বলেছেন, এই মত পার্থক্য এ পর্বের কবিতার ভিত্তিমূলকে নাড়িয়ে দিয়েছিল কিনা বা রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেছিল কি কবিতা? এমন নানান প্রশ্ন সন্ধানী পাঠককে আলোড়িত করে। জনপ্রিয়তার দোষগুণ দুইই কবিকে আঘাত করেছে। অনেক সমালোচক মনে করেছেন বিষয়ের অভাবে ভুগছেন কবি, বানানো বলেও কথা উঠেছে।

জনপ্রিয় এবং সমালোচিত কবিতা 'যাচ্ছি'। কবিকে রীতিমতো সমালোচনা করা হয়, একজন মার্কসিস্ট হওয়া সত্ত্বেও কবিতায় ঈশ্বর বিশ্বাসের আভাস রয়েছে কেন? মনে করা হয়েছে তিনি Compromise করেছেন। একাকীত্বের গ্রাসে কবিতার সংখ্যাও অনেক কমেছে। নানান প্রশ্নের মুখে বৃদ্ধ পদাতিক, তিনি কি নিজেকে ঠিক বুঝে উঠতে পারেননি, না কি অভিমান! তিনি নাকি নিজেরই কবিতার অনুকরণে ব্যস্ত, তাঁর কবিতা সবটুকু শেষ, নতুন কিছু দেওয়ার নেই তাঁর। কবিতাগুলির মূল অসুখ হল কবির শেষ জীবনের বিপর্যস্ত দিন, যার ফলে কবিতা শরীরেও সেই দীনতা লক্ষ করা যায়। হয়তো চরম অসম্মান, সংকট, দ্বিধা তাঁকে স্তব্ধ করে দিয়েছিল। আগের সেই তেজ, সেই সংকল্প কুয়াশাবৃত্ত একথা না মেনে কোনো উপায় নেই। একঘেয়েমি ঢাকতে অতিরিক্ত স্মার্টনেসের আশ্রয়, কী যেন অনুপস্থিত কবিতায়; তা হয়তো বিশ্বাসের তাপ। পথভ্রষ্ট কবি শেষপর্যায় কাব্যভূমিতে দাঁড়িয়ে নিঃসঙ্গ, নিঃস্ব। একথাও কবির ক্ষেত্রে কিছুটা সত্যি জনকল্যাণকর কবিতা লিখলেও তাঁর কবিতা মানুষের গভীরতম অনুভূতি প্রদেশে প্রবেশ করেনি। এ প্রসঙ্গে প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত বলেছেন— ''জন্ম-জীবন-মৃত্যুর যে জটিল রহস্য আমাদের অস্তিত্বে আস্তীর্ণ হয়ে গেছে, তার বিশেষ

কোনো চিহ্ন নেই তাঁর কবিতায়। তিনি অত্যন্ত নিপুণ কবি, কিন্তু তাঁর দৃষ্টি অনেকটাই ওপর ওপর বলে মনে হয়।" [প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত—'চল্লিশের কবিতা', আলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক কবিতার ইতিহাস, ১৯৮৩ পৃ: ১২৬-১২৮] এই ধরনের সমালোচনার তির তাঁর দিকে অনেক সময়ই ধেয়ে এসেছে, কিন্তু জীবনের শেষে কোনো এক গভীর বোধের থেকেই জ্বেলে রেখে যান প্রাণের প্রদীপ, কাল থেকে কালান্তরের পথে, যে পথে মানুষের ব্যক্তিগত আমিত্ব বোধের উর্দ্ধে আর এক 'আমি'-র উপস্থিতি যার অস্তিত্ব সমগ্রতায়। তাঁর 'দৃষ্টি ওপর ওপর' এমনটা বলতে কোথাও যেন কালের পাঠক একটু হলেও কুণ্ঠাবোধ করবে যখন তিনি বলে ওঠেন—

ঘরের কুলুঙ্গিতে
আমি জ্বেলে রেখে এসেছি
চেরাগ—
তোমরা দেখো, ভাই।

[পরের দিন, একবার বিদায় দেখা]

তথ্যসূত্র

১। সুভাষ মুখোপাধ্যায় কবিতা সংগ্রহ ৩য়, ৪র্থ, ৫ম খণ্ড দে'জ, ১৯৯৫
২। শক্তি চট্টোপাধ্যায়, 'তিয়াত্তরে পা দিয়ে নিশ্চিন্ত', আনন্দবাজার পত্রিকা, ১৪ এপ্রিল ১৯৯২
৩। প্রণবেন্দু দাশগুপ্ত—'চল্লিশের কবিতা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত আধুনিক কবিতার ইতিহাস, ১৯৮৩

নির্মলেন্দু গুণের কবিতা ঃ সময়ের সাহসী সন্তান

সৌরভ চক্রবর্তী

তিরিশের দশকে এক বাঙালি কবির কবিতা যখন Transparent মসলিন দিয়ে বিভাজিকা ঢাকছে ঠিক সেই সময়-ই আর এক বাঙালি কবির কবিতা নগ্নদেহে ছুটে চলেছে। আর এই নগ্নদেহে ছুটতে ছুটতে তার গা-হাত-পা ছড়ে গেছে। দুজনেই তো এক সময়ের। তাই সময়কে এড়িয়ে যাওয়ার প্রশ্ন নেই। তবুও এই রকমফের কেন? একজন যখন নিবিড় পর্যবেক্ষণে প্রায় অস্ফুটে উচ্চারণ করেন—

দূরে কাছে কেবলি নগর, ঘর ভাঙে;
গ্রাম পতনের শব্দ হয়;
মানুষেরা ঢের যুগ কাটিয়ে দিয়েছে পৃথিবীতে,
দেয়ালে তাদের ছায়া তবু
ক্ষতি, মৃত্যু, ভয়,
বিহ্বলতা বলে মনে হয়।[১]

অন্যজন তখন ঝংকার তোলেন—

আমি পরশুরামের কঠোর কুঠার,
নিঃক্ষত্রিয় করিব বিশ্ব, আনিব শান্তি শান্ত উদার!
আমি হল বলরাম-স্কন্ধে,
আমি উপাড়ি ফেলিব অধীন বিশ্ব অবহেলে নব সৃষ্টির
মহানন্দে।[২]

বস্তুত, সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের থাবায় দুজনেই রক্তাক্ত। তবুও একজন Introvert অন্যজন Extrovert। এর পিছনে খানিকটা সহজাত প্রবৃত্তি তো আছেই। আসলে মানুষের প্রকৃতি যেমন তার সহজাত প্রবৃত্তির দ্বারা নির্ধারিত হয় তেমনি সাহিত্যের প্রকরণগুলিও তাদের সতন্ত্র সত্তাতেই সুন্দর হয়। প্রাসঙ্গিকভাবে এখানে আরও একটা কথা বলা দরকার, কালবেলার কড়াঘাতে সত্তার রূপান্তর তো অনিবার্য ভবিতব্যই। তাইতো কোমলাঙ্গী হয়েও সময়ের দাবিতে কবিতার শরীরে ফুটে ওঠে যুক্তির শাখা প্রশাখায় নির্মিত পৌরুষময় প্রবন্ধের ঝাঁঝ—

বর্তমানের কবি আমি ভাই, ভবিষ্যতের নই 'নবী'।
কবি ও অকবি যাহা বল মোরে মুখ বুজে তাই সই সবি!
কেহ বলে, 'তুমি ভবিষ্যতে যে

---

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, আসাম বিশ্ববিদ্যালয়।

ঠাঁই পাবে কবি ভবীর সাথে হে!'
যেমন বেরোয় রবির হাতে সে চিরকেলে-বাণী কই কবি?
দুষিছে সবাই, আমি তবু গাই শুধু প্রভাতের ভৈরবী।[৩]

সময়ের অনিবার্য ভবিতব্যতা নির্মলেন্দু গুণকে দিয়েও লিখিয়ে নেয়—

বাজি রেখে রচনা করেছি কাব্য,
স্বপ্নকে দিয়েছি মুক্তি।
...
জীবনের অনুগত করেছি শিল্পকে,
কল্পনার চেয়ে বাস্তবকে দিয়েছি মর্যাদা।
গোলাপের চেয়ে কাঁটাকে একেছি বড় করে,
শোষণের হিংস্রতায় কালি দিয়েছি মাখিয়ে
সুন্দরের মুখের লাবণ্যে।[৪]

বস্তুত সমাজ ও স্বদেশ চেতনার গভীর উপলব্ধিতে বাস্তবের যে চোরাবালি প্রত্যক্ষ করেছেন, তা দিয়েই তিনি তাঁর কবিতার ইস্তেহার রচনা করেছেন। ধনতান্ত্রিক সভ্যতায় অর্থনীতির চাকা ঘোরানোর দায়িত্বটা যাদের হাতে থাকে বিত্ত শব্দটি কিন্তু তাদের অভিধানে থাকে না। ন্যূনতম গ্রাসাচ্ছাদনের সাবলীল জোগানোর স্বপ্নেই হাড় জিরজিরে হয়েই কেটে যায় - 'সাধের এ মানব জীবন'। আর এই সাধের জীবনের বঞ্চনার ধনেই ধনতন্ত্রের ধ্বজা ওড়ে। তাই মার্কসবাদে দীক্ষিত এই কবি তাঁর কাব্যে অনায়াসেই বলতে পারেন —

'ইসক্রা' থেকে জ্বলবে মশাল'
টলবে আসন শোষকের,
পুড়বে মুখ ও পৃষ্ঠ তাতে
পুঁজির পৃষ্ঠপোষকের।[৫]

আর এই স্বপ্ন দেখতে দেখতেই সহজ কথাগুলি খুব সহজ করেই বলতে পারেন —

সংগ্রামই সুন্দর
সংগ্রামই সত্য;
এ-ছাড়া আর যা
সবই ভুল তত্ত্ব।[৬]

বস্তুত এই সংগ্রামের মধ্য দিয়েই একদিন সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত হবে। মিলবে মুক্তির আস্বাদ। আসলে সাম্যবাদী সমাজ প্রতিষ্ঠিত না হলে তো 'সেনাবাহিনীর বন্দুক নয় শুধু গোলাপের তোড়া হাতে কুজকাওয়াজ' কিংবা 'বনবাদার ডিঙিয়ে কাঁটাতার পেরিয়ে ব্যারিকেড পেরিয়ে সাঁজোয়া গাড়ি' আসা সম্ভব নয়। তাই বিশুদ্ধ মানবত্ব প্রতিষ্ঠার প্রত্যয়ী বিশ্বাসে বিশুদ্ধ কবিতার নন্দনতত্ত্বকে অস্বীকার করে যেন নিজের অগোচরেই কবিতায় শ্লোগান দেন —

স্বৈরাচার নিপাত যাক, গণতন্ত্র মুক্তি পাক।[৭]

যদিও তাঁর কবিতা কিন্তু মোটেই শ্লোগান নির্ভর নয়। তবে তিনি রাজনীতি সচেতন তো বটেই। এই রাজনীতি সচেতনাতায় পূর্বসূরি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের অমোঘ প্রভাব তার ওপর পড়েছিল। শুধু রাজনৈতিক মতাদর্শেই নয় কবিতার form এর ক্ষেত্রেও কোথাও কোথাও তিনি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রত্যক্ষ অনুসারী। এখানে সুভাষ মুখোপাধ্যায় ও নির্মলেন্দু গুণের কবিতা দুটি উদ্ধৃত করে দেখা যেতে পারে —

কে যায়?
আমরা।
আমরা গাঁয়ের
আমরা শহরের
হাড় কালি মানুষ।
চলেছি মিছিলে।
হাতে কী?
নিশান।
কোথায় যাও?
দমন রাজার
দরবারে।
থামো—
—না।
বাধা দিলেও
—না।
...
রাস্তা দাও।
আমাদের যেতেই হবে
মিছিলে।[৮]

আবার—

- যাচ্ছো কই?
ঞ্ঝ মিছিলে,
- হাতে কী?
ঞ্ঝ বজ্রমুঠি,
- চোখে কী?
ঞ্ঝ স্বপ্ন-কোটি।

- মুখে কী?
ঃ জয়ধ্বনি।
- বুকে কী?
ঃ রক্ত লাল।
- সামনে কী?
ঃ আগামীকাল?
- মনে কী?
ঃ অভয়মন্ত্র।
- লক্ষ্য কী?
ঃ সমাজতন্ত্র।[৯]

কোথাও আবার তাঁর কবিতায় নজরুলের কবিতার প্রতিফলন ঘটেছে —

মূর্খেরা সব শোনো, মানুষ এনেছে রাষ্ট্র—
রাষ্ট্র আনেনি মানুষ কোনো।[১০]

আর নজরুল লিখেছিলেন —

... মূর্খরা সব শোনো,
মানুষ এনেছে গ্রন্থ; গ্রন্থ আনে নি মানুষ কোনো![১১]

এ প্রসঙ্গে তিনি নিজেই বলেছেন —

আমি যা লিখবো তার অনেক আগেই বিদ্রোহী নজরুল
আর বিপ্লবী সুকান্ত ভট্টাচার্য বহু কথা, অনেক কবিতা,
বহু গান, স্বাস্থ্যবান অনেক নির্দেশ দিয়ে গিয়েছিল।
এই বাংলার অনুর্বর মাঠে, ঐ বিষাক্ত কপিশ বাতাসে তাঁরা
কত যে দুঃখের-কান্নার চাষ করেছিল, প্রতিবাদ কত যে
ভীষণ চিৎকার অন্যায়ের মুখোমুখি রক্ত দিয়েছিল;
কই? কোথায় হিসেব তার? তোমরা তার কতটুকু জানো?[১২]

তাই তাঁকেও পূর্বসূরিদের অপূর্ণ স্বপ্নই ফেরী করে বেড়াতে হয় —

নজরুল সুকান্তের মতো আমিও প্রত্যেক ঘরে সংগ্রামের ডাক দিয়ে যাই,
'আকাশ বিদ্রোহী হোক, জনতার তৃপ্তি হোক শ্রাবণের বাঁধভাঙ্গা বানে...[১৩]

নির্মলেন্দু গুণের এই কবিতাগুলি একান্তভাবেই বিষয়ধর্মী। আবার বিষয়ের যে অভিনবত্ব আছে তা ও নয়, আসলে, —'' আধুনিক সমস্যা বলে কোন পদার্থ নেই, মানুষের সব গুরতর সমস্যাই চিরকালের।" [১৪] ভাব প্রকাশের সবচেয়ে দুর্বলতম মাধ্যম ভাষাকেই তিনি বেছে নিয়েছেন মূক মুখে কথা ফোটাতে। তাই তিনি যা বলতে চেয়েছেন স্পষ্ট করেই বলেছেন। এই সততার জোড়টাই তার কবিতার ঐশ্বর্য। বুভুক্ষু মানুষের কানে আত্মার মুক্তির মন্ত্র শোনানো যেমন

নিষ্ফলা তেমনি সর্বহারার বাঁচার মন্ত্র লিখতে গিয়ে ভাষাতীতের ব্যঞ্জনা সৃষ্টি করাটাও তো ব্যার্থ প্রচেষ্টারই সামিল। তাই তাঁর স্পষ্ট উচ্চারণ —

> আমার কবিতা বাক্যেশ্বরী
> অনিবার্য সে বাঁচার মন্ত্র,
> আমার কবিতা সর্বহারার
> মুক্তিসনদ, সমাজতন্ত্র।[১৫]

এইবার আমরা ফ্ল্যাশব্যাকে ফিরে গিয়ে কবির জীবনের ঘটনাক্রমের দিকে একটু চোখ ফেরাতে পারি। '৫২ এর ভাষা আন্দোলনের সময় কবি শিশু। ১৯৫৮ থেকেই শুরু হয় বাঙালির মুক্তি সংগ্রাম। '৫৮ থেকে পরবর্তী ঘটনাগুলো কিশোর কবির চিন্তা চেতনায় প্রত্যক্ষ প্রভাব ফেলেছে। জেনারেল আইয়ুব খানের শাসন ও স্বৈরাচারের নতুন পর্ব চলে ১৯৫৮ থেকে ১৯৬৬ এর মধ্যে। এই সময়ের ঘটনাক্রম থেকে আমরা জানতে পারি —''রবীন্দ্র বিতর্ক, ছাত্র আন্দোলন, ভাষা ও সংস্কৃতির সংগ্রাম, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, পাক-ভারত যুদ্ধ এবং ছয়দফা আন্দোলন ক্রমান্বয়ে বাঙালি মুক্তিসংগ্রামকে একটি নির্দিষ্ট আকর দান করে। ফলে ছেষট্টির পরে অত্যন্ত দ্রুততালে পাঁচ বছরের মধ্যে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা, উনসত্তরের গণ অভ্যুত্থান, আইয়ুবের পতন, সত্তরের নির্বাচন ও একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ ধাপে ধাপে বাংলাদেশকে স্বাধীনতার সিংহদ্বারে পৌঁছে দেয়।'' [১৬] এই সব রাজনৈতিক প্রেক্ষাপট কবির মনে গভীরভাবে প্রভাব ফেলেছে। তিনি ক্রমেই সোভিয়েত ঘেঁষা বাম রাজনীতির প্রতি অনুরক্ত হয়ে পড়েন এবং জাতিয়াতাবাদী ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির প্রতি আকর্ষণ বোধ করেন। সেই কারণেই তৎকালীন উদীয়মান নেতা শেখ মুজিবের আদর্শ এবং জনদরদী কণ্ঠ তাঁকে আকৃষ্ট করে। কবি সরাসারি কোনো রাজনৈতিক দলের নেতা না হলেও ছাত্রজীবন থেকে ছাত্র রাজনীতিতে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছেন। তিনি মেনন গ্রুপের পিকিং পন্থী সমর্থক ছিলেন। ১৯৬৫ সালের ৩ এপ্রিল মেনন গ্রুপের সম্মেলনে তিনি ঢাকায় যোগ দেন কিন্তু পরবর্তীকালে চীন আদর্শভিত্তিক মেনন পন্থী ছাত্র ইউনিয়ন থেকে দূরে সরে যেতে থাকেন। 'আমার কন্ঠস্বর'এ তিনি বলেছেন—

> বি এস সি পড়ার সময় আনন্দমোহনে আমার রুমমেট ছিল চিত্রনায়ক - পরিচালক সোহেল রাণা। তার আসল নাম মাসুদ পারভেজ। সে ছিল ছাত্রলীগের নেতা। সৈয়দ নজরুলের ভাগ্নে আনোয়ারও ছিল আমার সহপাঠী বন্ধু। ছাত্রলীগ নেতা মুজিবর রহমান মিলকিও আমার সহপাঠী বন্ধু। এদের সংস্পর্শে এসে মেননপন্থী ছাত্র ইউনিয়নের প্রতি আমার দুর্বলতা কাটতে থাকে।[১৭]

এরপর কবি আর কোনো দলের সদস্যভুক্ত হননি। তবে সোভিয়েতপন্থী বামরাজনীতি ও বাঙালি জাতীয়তাবাদ ভিত্তিক ধর্মনিরেপেক্ষ রাজনীতির প্রতি তাঁর যুগপৎ অনুরাগ লক্ষ্য করা যায়।

১৯৬৬ সালে যখন ৬ দফা কেন্দ্রিক স্বায়ত্বশাসনের আন্দোলন চলছে, শুরু হয়েছে গ্রেফতার, নির্যাতন আর গুলি তখন এই পরিস্থিতির বিরুদ্ধে জেগে উঠতে শুরু করেছে নতুন শক্তি। এই সময়ের প্রতিবাদী রূপ ধরা পড়েছে নির্মলেন্দু গুণের কবিতাতেও। তিনি বললেন কলম তাঁর বিশ্বস্ত বন্ধু এবং কবিতা তাঁর 'নেশা, পেশা এবং প্রতিশোধ গ্রহণের হিরন্ময় হাতিয়ার।' প্রকৃতপক্ষে শুধু কবিতা নয়, সাহিত্য যুগে যুগে বিপ্লবের বাণী সঞ্চারিত করতে ব্যবহৃত হয়েছে। সেই প্রত্যাশাতেই হয়তো রচিত হয়েছে —

সবকিছুই একদিন লাল হয়; আবীর ছড়ায়। গাছের হলুদ পাতা,
জনতার হলুদ চোখেও, দেখে নিও - একদিন হবে।
বাংলার সবলোক সেইদিন দোলপূর্ণিমায় নতুন পালক নেবে,
তোমার জিহ্বার মত লাল হবে সংগ্রামের ব্যতিক্রম লালে।
কোনোদিন চাইনি কিছুই, আজ কিছু রক্ত চাই; প্রেয়সীগো,
চেয়ে দেখো বাঙালির চোখগুলো রক্তহীন ভীষণ হলুদ।[১৮]

অবশেষে '৭১ এর মুক্তিযুদ্ধের পর স্বপ্নের স্বাধীনতা এসেছে কিন্তু কাঙ্খিত সাম্যবাদ আসেনি। এরসাদের স্বৈরশাসন কায়েমের কালে স্বপ্নের স্বাধীনতা চোপসানো ফানুসে পরিণত হয়েছে। ঘুন ধরেছে বিশ্বাসে, তৈরি হয়েছে ব্যক্তির অস্তিত্বের সংকট। এখানে বহিঃশত্রুর বিরুদ্ধে সমষ্টির প্রতিরোধ নেই। এখানে আছে বিশ্বাসভঙ্গকারী স্বজাতির প্রতিনিধি। একরাশ ঘৃণায় বোজা গলায় তিনি বলে চলেছেন —

তোমার মুক্তির জন্য যাদের বিরুদ্ধে একদিন প্রাণ দিয়ে
লড়াই করেছি, তারাই আজকে দেখো কী সুন্দর ব্যঘ্রচর্ম গায়ে
পার্শিয়ান গালফ থেকে উড়ে যাচ্ছে বঙ্গোপসাগরে, তোমার উদ্ধারে।[১৯]

তবুও তিনি বিশ্বাস রাখেন —

একদিন নিশ্চয়ই আমাদের পৃথিবী আর এরকম থাকবে না,
একদিন নিশ্চয়ই অনেক মানুষের স্বপ্ন এসে একটি বিন্দুতে মিলবে।[২০]

এখানে লক্ষ্যণীয় দেশের সমস্যার প্রসঙ্গ টেনে তিনি দেশের মুক্তির স্বপ্নতেই সীমাবদ্ধ থাকেননি, স্বপ্ন দেখেছেন পৃথিবীর মুক্তির, সমগ্র মানব জাতির মুক্তির, এখানেই তাঁর জাতীয়তা থেকে আন্তর্জাতিকতায় উত্তরণ। আবার এই উঁচু গলায় কথা বলতে গিয়ে সমকালীন কবিদের থেকে নিজেকে আলাদা করে নিয়েছেন। আটপৌঢ়ে ঢঙে কথা বলার ভঙ্গিতে কবিতা বলে কানের ভিতর দিয়ে মরমে অনায়াসে সঞ্চারিত করতে চেয়েছেন। কথার কৌনিকতায় তাঁর কবিতা কোনো দুর্বোধ্য ফ্রেমকে ধরতে চায়নি; কারণ —

না, আমি নির্মিত নই বাল্মীকির কাল্পনিক কুশে,
আমাকে দিয়েছে জন্ম রক্তঝরা অমর একুশে।[২১]

তথ্যসূত্র

১। দাশ জীবনানন্দ, 'পৃথিবীলোক', ''জীবনানন্দ দাসের শ্রেষ্ঠ কবিতা'', ভারবি, কলকাতা, দ্বিতীয় ভারবি সংস্করণ, দশম মুদ্রণ আগস্ট ২০০৩, পৃ. ৭৪

২। ইস্‌লাম নজরুল্‌, 'সাম্যবাদী'-'বিদ্রোহী', 'সর্বহারা', ''সঞ্চিতা'', ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, একসপ্ততিতম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৬

৩। ইস্‌লাম নজরুল্‌, 'আমার কৈফিয়ৎ' -'সর্বহারা', ''সঞ্চিতা'', ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, একসপ্ততিতম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৮৮

৪। গুণ নির্মলেন্দু, 'সাতই আষাঢ়', 'দূর হ দুঃশাসন', ''কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি, বইমেলা ২০১০, পৃ. ২৪

৫। গুণ নির্মলেন্দু, '২ নং কবিতা', 'ইসক্রা', ''কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০, পৃ. ৬৩

৬। গুণ নির্মলেন্দু, '৩ নং কবিতা', 'ইসক্রা', ''কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী বইমেলা ২০১০, পৃ. ৬৩

৭। গুণ নির্মলেন্দু, 'নূর হোসেন', '১৯৮৭', ''কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০, পৃ. ২৬১

৮। মুখোপাধ্যায় সুভাষ, 'যেতেই হবে', 'ফুল ফুটুক', ''কবিতা সংগ্রহ'', দে'জ পাবলিশিং, প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, পুনর্মুদ্রণ - জুন ২০১৪, পৃ. ১৪০

৯। গুণ নির্মলেন্দু, 'মিছিলে', 'শান্তির ডিক্রি', ''কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০, পৃ. ১১৬-১১৭

১০। গুণ নির্মলেন্দু, '৪৩ নং কবিতা', 'ইসক্রা', ''কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খন্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারী বইমেলা ২০১০, পৃ. ৭০

১১। ইস্‌লাম নজরুল, 'সাম্যবাদী'-'মানুষ', 'সর্বহারা', ''সঞ্চিতা'', ডি. এম. লাইব্রেরি, কলকাতা, একসপ্ততিতম সংস্করণ, জানুয়ারি ২০১১, পৃ. ৭২

১২। গুণ নির্মলেন্দু, 'আলটিমেটাম', 'প্রথম দিনের সূর্য', ''কাব্যসমগ্র প্রথম খন্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ৪৫৪

১৩। পূর্বোক্ত, পৃ. ৪৫৪

১৪। ঠাকুর রবীন্দ্রনাথ, ''রক্তকরবী'', বিশ্বভারতী গ্রন্থন বিভাগ, কলকাতা, জ্যৈষ্ঠ ১৪১৫, পৃ. ১১৮

১৫। গুণ নির্মলেন্দু, 'আমার কবিতা', 'চাষাভূষার কাব্য', ''কাব্যসমগ্র প্রথম খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ৪০৬

১৬। আহ্‌মদ সালাহ্‌উদ্দীন, সরকার মোনায়েম (সম্পাদনা), ''বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামের ইতিহাস, ১৯৪৭-১৯৭১'', ২য় মুদ্রণ ১৯৯৯, পৃ. ৮২

১৭। গুণ নির্মলেন্দু, ''আমার কণ্ঠস্বর'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ মুদ্রণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০, পৃ. ২৯

১৮। গুণ নির্মলেন্দু, 'হলুদ চোখ', 'প্রথম দিনের সূর্য', ''কাব্যসমগ্র প্রথম খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ৪৪৪।

১৯। গুণ নির্মলেন্দু, 'গৃহশত্রু, সমুদ্র তোমার', 'ধাবমান হরিণের দ্যুতি', ''কাব্যসমগ্র দ্বিতীয় খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, তৃতীয় সংস্করণ, ফেব্রুয়ারি বইমেলা ২০১০, পৃ. ৩৪৩-৩৪৪

২০। গুণ নির্মলেন্দু, 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র', 'তার আগে চাই সমাজতন্ত্র', ''কাব্যসমগ্র প্রথম খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ৩০০

২১। গুণ নির্মলেন্দু, 'আমার জন্ম', 'পৃথিবী জোড়া গান', ''কাব্যসমগ্র প্রথম খণ্ড'', কাকলী প্রকাশনী, ঢাকা, চতুর্থ সংস্করণ, অক্টোবর, ২০১১, পৃ. ৪২৭

নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটোগল্পের দেশ এবং অন্ধ বেড়াল

স্বরূপ হালদার*

সারাটা বিশ্বের আর পাঁচটা দেশের মতোই ভারতবর্ষ নামক দেশখানির গায়েও আষ্টেপৃষ্ঠে লেপ্টে রয়েছে বহুযুগের পুরাতন পঙ্কিল জঙ্গলাকীর্ণ এক অতীত, যা আজ ইতিহাসে পর্যবসিত। সে ইতিহাস সুদীর্ঘ, বহুব্যাপ্ত। দীর্ঘ তার পথচলা। তবে সে ইতিহাসের চরিত্রাবলী, ঘটনাবলী, সময়কাল এবং স্থানসমূহ ভিন্ন ভিন্ন হলেও, মোটা দাগে তার ফলাফল নির্ণয় করে বলা যেতে পারে 'ক্ষমতা' নামক বস্তুটির প্রলোভনের লড়াইয়ে একদল বিজিত, অন্যদল পরাজিত। ক্ষমতাধীন যারা, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তারা অত্যাচারী এবং ক্ষমতাহীনেরা অত্যাচারিত। তারপর যুগে যুগে এ চেনা ছকের আমূল পরিবর্তন ঘটতে দেখা গিয়েছে। ঘটেছে যুক্তি-বুদ্ধি-জ্ঞানের অনুপ্রবেশ। তথাকথিত ইতিহাসের রূপ বদলাতে থেকেছে বারংবার। তবে 'যুদ্ধ নয় শান্তি' পেরেছে বা আদৌ করেছে কিনা তার সাক্ষী তো রয়েইছে ইতিহাস। তবে যে কারণে ইতিহাস সংক্রান্ত এই গৌরচন্দ্রিকা, তা হল ভারতবর্ষ নামক এই যে দেশ, তারই অন্তর্ভুক্ত একটি দেশ রূপ অবস্থান করত বাংলাদেশ নামক ভূখণ্ডটি। আর সাম্প্রতিক বাংলাদেশের যে দ্বিখণ্ডিত রূপ, তারও পশ্চাতে রয়েছে ইতিহাস। বলা বাহুল্য, সে ইতিহাসের পাতাগুলি অচেনা বা অজানা নয়। দ্বিজাতিত্ত্বের ভিত্তিতে ভারতবর্ষেরই একটি খণ্ড আলাদা হয়ে গেল পররাষ্ট্র হিসেবে—পাকিস্তান। ভারতবর্ষ বৈদেশিক শাসনের নিগড় থেকে মুক্তি পেল আত্মবলিদান দিয়ে। তবে পশ্চিম পাকিস্তানের সঙ্গে পূর্ব পাকিস্তানের বহুযোজন মাইলের দূরত্ব ঘুচল না। বহু টানাপোড়েনের পর ভারতের সক্রিয় সাহায্যে মূল পাকিস্তান থেকে জন্ম নিল বাংলাদেশ নামক নতুন বাঙালি রাষ্ট্রখানি। ভারতবর্ষের অন্তর্গত পশ্চিমবঙ্গের পার্শ্ববর্তী রাষ্ট্র বাংলাদেশের বিচ্ছেদের সাক্ষ্য শুধু ইতিহাসই নয়। বাংলা সাহিত্যও হয়ে রইল। এ বিচ্ছেদের ব্যাথা-বেদনা ধরা থাকল বাংলা কবিতায়, গানে, গল্পে, উপন্যাসে, নাটকে, প্রবন্ধে, চলচ্চিত্রে। সর্বোপরি দুই বাংলার মানুষের মননে—

আমরা যেন বাংলা দেশের
চোখের দুটি তারা।
মাঝখানে নাক উঁচিয়ে আছে—
থাকুক গে পাহারা।
দুয়োরে খিল।
টান দিয়ে তাই
খুলে দিলাম জান্‌লা।
ওপারে যে বাংলাদেশ
এপারেও সেই বাংলা।

(পারাপার; ফুল ফুটুক / সুভাষ মুখোপাধ্যায়)

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, প্রেসিডেন্সি বিশ্ববিদ্যালয়।

এভাবেই স্বাধীনতা বেঁচে রইল। স্বাধীনতা বেঁচে রইল দেশভাগে, সাম্প্রদায়িকতায়। কাঁটাতারের বেড়ায় বেড়ায় ধরা থাকল স্বাধীনতার স্বাদ। রক্তের ঘ্রাণে, মৃতদেহের স্তূপে, ভিটেহারা উদ্বাস্তুদের ক্ষুধার আর্তনাদে, কান্নার কলরোলে ধুঁকতে থাকল স্বাধীনতা। হিংস্রতার, লোলুপতার যে বিষবৃক্ষের বীজ অ-স্বাধীন ভারতবর্ষে রোপণ করা হয়েছিল, তার বিস্তার স্বাধীনতার পরেও কেটে ফেলা সম্ভব হয়নি। স্বাধীনতাকে কেন্দ্র করে যে সুখ-স্বপ্নগুলোকে দেশবাসী সেদিন সাকার করার আশায় ছিল, প্রচেষ্টায় ছিল, বাস্তবে দেখা যেতে লাগল তার সবটাই মিথ এবং মিথ্যে। স্বাধীনতা এই শব্দটি যে ইতিবাচকতার ইঙ্গিত করে, সেদিন তা ধরা দিল নেতিবাচকতার আবহে। আর এ আবহে বেড়ে উঠতে থাকা মানুষগুলোর মনে একসময় জন্ম নিল একইসঙ্গে চরমতম ক্ষোভ এবং ক্রোধ। তাই ষাটের দশকে শুরু হল ছাত্র আন্দোলন। আর ষাটের দশকের শেষ পর্ব থেকেই তো সূচনা ঘটে গেল নকশাল আন্দোলনের। বলাই বাহুল্য, এ আন্দোলনের জোয়ার-ভাটা সেদিনকার জনসাধারণকে ভিন্নতর সমস্যা এবং সংকটের মুখোমুখি করেছিল। যদিও এ আন্দোলনের উত্থান-পতন, সফলতা-ব্যর্থতা, এককথায় এর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার বিশ্লেষণ এবং সমালোচনা অন্যতর সমীক্ষার বিষয়। তবে এটুকু বলা যায়, এহেন আন্দোলনের ঝোড়ো হাওয়ায় বাংলা সাহিত্যেরও একটা ভিন্ন বাঁক লক্ষ করা যায়, আর এ ভিন্নতর বাঁকেরই অন্যতম একজন নবারুণ ভট্টাচার্য (১৯৪৮-২০১৪)। ষাটের দশকের একেবারে শেষের দিকে তাঁর সাহিত্যক্ষেত্রে আগমন। সাহিত্যজগতে তাঁর অবির্ভাব ছোটোগল্প এবং কবিতাকে সঙ্গে করে। তবে ঔপন্যাসিক হিসেবে তাঁর আত্মপ্রতিষ্ঠা 'হারবার্ট'কে সঙ্গী করে নব্বুই-এর দশকে। যদিও এক্ষেত্রে আলোচনা মূলত ছোটোগল্পকে কেন্দ্র করেই আবর্তিত, তবুও এ তথ্যটুকু পরিবেশন করতেই হয় যে, 'শিল্পের জন্য শিল্প'-এ তত্ত্বে অবিশ্বাসী এ ব্যক্তিত্বটি সাহিত্যজগতে ঢুঁ মেরেছিলেন আরও গভীর প্রত্যাশা থেকে। তাঁর কাছে সাহিত্য আনন্দ বিনিময়ের বা বিনোদনের বিষয় নয়, 'আরও গভীর এক অ্যালকেমি যেখানে বিস্ফোরণের ঝুঁকি রয়েছে।' আর এ ঝুঁকির নিদর্শন নেহাতই হাতে গোনা নয়। তাই কবিতাতেও শোনা গেছে তাঁর দৃপ্ত, বলিষ্ঠ কণ্ঠস্বর—

একটি সজীব মৃতদেহ যখন অপরাপর পুষ্ট
মৃতদেহকে উৎসাহ দেয়
লুকিয়ে মানুষকে ফাঁসি দেওয়ার জন্য সমগ্র রাষ্ট্রযন্ত্র
যখন বেশ্যার মতো সজাগ
একটা কুকুর যখন বাস চাপা পড়ার পরে
বাস্তার চাঁদের আলোয় রক্তে ভিজে শুয়ে থাকে
আর তার শেষ চিৎকার টেপ রেকর্ড করে
ইস্কুলের বাচ্চাদের শোনানো হয়
যখন কবি ও লেখকবৃন্দ পোকা ধরার জন্যে
বড় বড় আলোর পাশে ওঁৎ পেতে থাকে
যখন একটা লোকের সাশোটা নারি ভাড়া খাটে
আর একটা লোক ক্রাচ নিয়ে রাস্তা পার হয়

তখন আমৃত্যু লিখে যাব প্রতিবাদ
উন্মত্ত হিংস্র ও ক্রুদ্ধ নিরবধি
এ যদি সমাজ হয়
তবে আমি সমাজবিরোধী।

(সমাজ বিরোধিতার কথা; এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না)

এতো গেল কবিতার কথা। তবে নবারুণ ভট্টাচার্যের ছোটোগল্পের পরিসরেও লক্ষ করা যায় বিস্ফোরণের ঝুঁকি, অনুভব করা যায় বিস্ফোরণের আঁচ। আর এ আঁচের আভাস মেলে 'পরিচয়' পত্রিকায় ১৯৬৮ সালে প্রকাশিত তাঁর প্রথম গল্প 'ভাসান' থেকেই। এ গল্পের বয়ান স্বয়ং এক মৃত ব্যক্তির। কাজেই গল্পকার নবারুণ ভট্টাচার্যের এই প্রথম অভিজ্ঞানটি দেখেই পাঠক অন্তত বুঝে নিতে পারে এ গল্পকার গল্পের রাজ্যে অন্য পথের পথিক — ''যে গল্প খুব প্রত্যাশিত, যে গল্পের মধ্যে অভ্যেসের আরাম আর বস্তাপচা ক্লিশের পুনরুচ্চাপ চলেইছে, তিনি যে সে পথে হাঁটবেন না, তা বোঝা গিয়েছিল তার প্রথম গল্প 'ভাসানে'ই।" (রাজীব চৌধুরী) নিছক গল্প লেখা বা গল্প বলা তাঁর উদ্দেশের মধ্যে ছিল না। গল্প নিয়ে তিনি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন। সে পরীক্ষা-নিরীক্ষার দেখা মেলে গল্পগুলির উপস্থাপনায়, গল্পের বিষয়ে, গল্পে ব্যবহৃত শব্দ বা শব্দগুচ্ছ এমনকি গল্পের উপমা কিংবা চিত্রকল্পে। গল্প অর্থে পাঠকের গল্পপিপাসু মনের চাহিদানুযায়ী এ গল্পগুলির বুনন নয়। নবারুণীয় গল্পের বুনন আরও ঠাসা, তার শেকড় আরও বেশি গভীরের। আর লেখক তো বলেছেনই— ''... গ্রামে মানুষদের ওপরে পুলিশ ও গুণ্ডা টার্গেট প্র্যাকটিস করবে, বন্ধ কারখানার শ্রমিক হয় রক্তবমি করে মরবে বা ক্রিমিনাল হয়ে যাবে, কলকাতার বুকের ওপরে কারখানা লোপাট করে রাক্ষুসে শপিংমল ও রাক্ষসের থাকার রেসিডেন্সিয়াল কমপ্লেক্স তৈরী হবে, রাস্তার কুকুরদের শীতকালের বরাদ্দ রোদ কেড়ে নেবে অক্ষমের চিয়ারলিডার হয়ে মজা মারব এটা হয় না।" এই যদি কাছ থেকে সাজানো-গোছানো, কল্পনাপুষ্ট রোমান্টিক জোলো প্রেমের গল্প বা তথাকথিত অখ্যানধর্মী গল্পের জন্মদান বড্ড বেশি বেমানান বা খেলো বলে মনে হয়। তাছাড়া এটাও ভুলে যাওয়া চলে না যে, ষাট-সত্তরের ঘটনাবহুল সময়টাতে নবারুণের সাহিত্যজগতে পদার্পণ। আর এ ষাট-সত্তরের ঝোড়ো হাওয়া নবারুণের মত সাহিত্যিকের মনে কোনো সাড়া বা উত্তেজনা জাগাবে না — এখন ভাবনাকে মুর্খামি ছাড়া আর কিছু বলা চলে না। তাছাড়া স্বয়ং লেখকের বক্তব্য—

> সত্তরের আন্দোলন দ্বারা আমি যে প্রভাবিত হয়েছিলাম একথা তো সবাই জানে। আমার রেসপন্সটা ছিল কিন্তু লেখক হিসেবেই। আমার যেটা দায় সেটা আমি আমার লেখা দিয়েই পূরণ করে দিয়েছি। সত্তরের ত্যাগটা যদি আমাদের এখানে কেউ অস্বীকার করে বা ভুলে যায় তাহলে সে খুব অন্যায় কাজ করবে। কারণ অতবড়ো ঘটনা আমাদের জীবনকালে আর কখনও ঘটেনি, এক বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ ছাড়া। সত্তরের তেজটা তো আমার মধ্যে আছে, আর যে মেজাজ এবং সেই সময় আমার যে ক্রোধ সেটা আমার কাছে একটা স্থায়ী সম্পদ।

আর বলাটাই বাহুল্য, এ সম্পদের প্রতিফলন ঘটতে দেখা গেছে নবারুণের সাহিত্যকর্মে। আর

তাঁর ছোটোগল্পগুলিও এর ব্যতিক্রম নয়। নবারুণ ভট্টাচার্যের গল্পগুলি পাঠ করতে গিয়ে মাথায় রাখা প্রয়োজন, এ গল্প দুপুরবেলা ভাতঘুমের পরে বা কাজের অবকাশে অবসর পাঠ্য নয়। এ গল্প পাঠ করতে হয় নিবিড় মনোনিবেশে, সচেতনভাব। আর এই সচেতনতাবশতই তাঁর ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া, আর এই ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার ফর্মূলায় জন্ম নেওয়া কিছু অদ্ভুত জীব, অদ্ভুত পরিস্থিতি এবং অদ্ভুত শব্দ বা শব্দগুচ্ছের। আর এ সমস্ত কিছুর প্রেক্ষিতে গড়ে ওঠা অদ্ভুত সব আদর্শের কথাও টের পাওয়া যায়। যে আদর্শে 'পুলিশ করে মানুষ শিকার'। যেখানে রাজনৈতিক মতাদর্শ মানুষে-মানুষে নির্ধারণ করে দেয় সম্পর্কের, মূল্যায়ন করে মূল্যবোধের। খুন, জখম, রাহাজানি, ধর্ষণ, ছিনতাই, খিদে, বেকারত্বে ইত্যাদি সব শব্দগুলোর অস্তিত্ব প্রবলভাবে মূর্ত হয়ে ওঠে মৃতদেহ মৃতদেহের স্তূপ। অসংখ্য, অগণিত মৃতের স্তূপ। কবি নবারুণ ভট্টাচার্য এই মৃত্যু উপত্যকাকে এড়িয়ে যেতে চেয়েছেন। বলেছেন 'এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না'। অথচ লক্ষ করলে দেখা যায়, তাঁর ছোটোগল্পের দেশখানি কিন্তু মৃত্যু উপত্যকাতেই নির্মিত। সমালোচকের কথায়— ''...মৃত্যু, হত্যা, আত্মহত্যা—নবারুণের গল্পে এক মটিফ-এর মতো পুনরাবৃত্তিময়। প্রেম, স্নেহ, সমতা—এসবও যেন এক আশ্চর্য নৃশংসতার কবলে। মর্কিড আর নাগরিক পরিমণ্ডলে এই সব মানুষদের মৃত্যু উপত্যকা।" অর্থাৎ নবারুণের ছোটোগল্পের ভৌগলিক বৃত্তে নির্মিত এই মৃত্যু উপত্যকার নির্মাতা তিনি। তবে বাস্তবিকই সে মৃত্যু উপত্যকার নির্মাতাকে বা কারা সেটা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তাঁর গল্পপাঠে। আর সে মৃত্যু উপত্যকা নির্মাণের ইতিহাসই তাঁর অধিকাংশ গল্পের উপজীব্য হয়ে উঠেছে বলা চলে। তবে এক্ষেত্রে আলোচনা নবারুণ ভট্টাচার্যের অন্যতম একটি গল্প 'অন্ধ বেড়াল'কে কেন্দ্র করে। তাই এ গল্প সম্পর্কিত কিছু প্রাসঙ্গিক তথ্য উল্লেখ করতে হয়।

'অন্ধ বেড়াল' গল্পটির আবির্ভাব 'প্রতিক্ষণ' পত্রিকায় ১৯৯৭ সালে। আর ২০০১ সালে প্রকাশিত হয় 'অন্ধ বেড়াল' গল্পগ্রন্থটি। 'অন্ধ বেড়াল' সহ এ গল্পগ্রন্থে মোট গল্পের সংখ্যা ছিল চৌদ্দ। এরপর ২০০৬ সালে প্রকাশিত 'শ্রেষ্ঠ গল্প'-তে 'অন্ধ বেড়াল' গল্পটিকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়। তবে নবারুণ ভট্টাচার্যের তৃতীয় গল্প সংকলন 'অন্ধ বেড়াল'-এর মলাট লিখনে বইয়ের একেবারে পেছনের অংশে প্রকাশকের মন্তব্য— ''নবারুণ ভট্টাচার্যের এই গল্প সংকলনে প্রতিফলিত হয়েছে টালটমাল ঘটানো নব্বুই দশক যা গোটা পৃথিবী ও তার বাসিন্দাদের সহজ সরল একটা দুটো নয়, হাজারো জটিল প্রশ্নের সামনে নিলডাউন করিয়ে দিয়েছে।" 'অন্ধ বেড়াল' গল্পটিও নব্বুই দশকের ফসল। তবে তার বীজ রোপণ করা ছিল সত্তর দশকে একথা বললে খুব একটা ভুল বলা হয় না। প্রসঙ্গত স্মরণ করা যেতে পারে মহাশ্বেতা দেবীর বক্তব্য খানিকে। 'সত্তরের দশক ও তারপরে' প্রবন্ধে তিনি বলেছেন— ''এত কাজ করার আছে এবং এত কাজ করা হয়নি, এবং সে পথে বাইরে ভিতরে এত বাধাবিপত্তি, এবং তবু যোদ্ধার মতো কাজ করে চলার এত প্রয়োজন—এ সব কথা যে আজ লিখতে পারছি তার মূলেও সত্তর দশকের প্রচণ্ড অভিঘাত।" বলা বাহুল্য, নবারুণ ভট্টাচার্যের নব্বুই দশকের যে গল্প, তাও সেই 'সত্তর দশকের প্রচণ্ড অভিঘাত।' এই 'সত্তরের তেজ'ই তো তাঁর গল্পের অলিতে-গলিতে ছড়ানো। তাই তো

তাঁর ছোটোগল্পের দেশেও মৃত্যুর উপত্যকা — ''কপালের ওপর হাত চেপে ধরলো আর মৃত্যুর একটা অস্পষ্ট সংজ্ঞা ভাবলো। পরিস্কার স্পষ্ট কিছুই নয়, অনেক কালো ঢেউ-এর মধ্যে বড়দিনের গাছ সাজানোর আলোয় মৃত্যু হাসছে। মৃত্যু কী? ... মৃত্যু অনেক আনন্দের ও কষ্টের সংঘর্ষে জ্বলে ওঠা ঝাউবনে বীভৎসা মুখ, মৃত্যু ওভারব্রিজের নিচ দিয়ে ট্রেন চলে যাওয়ার পর আকাশে হারিয়ে যাওয়া কয়লার নিশ্বাস ধোঁয়ায় অর্থহীন ভয়ের বৃত্ত, মৃত্যু জেটিতে লোহার আর কাঠের পাটাতনের তলায় রাত্রির কালোজলের আঘাতের শব্দের বোধ, মৃত্যু শিশুকাল ও যৌবন পরবর্তী বিশ্বাসঘাতকতার বামনই, মৃত্যু সামগানের সৌম্য স্বরামুকান, নীলবিষ, মৃত্যু উপেক্ষিত শূন্যতার বিস্তার, চলন ধীর বিলম্বিত, গতিঋজু, রঙ অজানা। ভয় অসহায়তা অসমসাহস।'' (স্টিমরোলার)

এভাবেই, এরূপেই গল্পে মৃত্যুকে দেখেছেন এবং দেখাতে চেয়েছেন লেখক। আর 'অন্ধ বেড়াল' গল্পটিতেও রয়ে গেছে এহেন মৃত্যুরই সম্ভাবনা। 'বেড়াল' বা 'বিড়াল' নামক এ প্রাণীটির উপস্থাপনা বাংলা সাহিত্যে আন্‌কোরা কোনো বিষয় নয়। বহুকাল আগে এই বেড়ালের রূপকেই সাম্যবাদী সমাজতন্ত্রের বক্তব্য রেখেছিলেন বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তাঁর 'বিড়াল' নামক প্রবন্ধটিতে। তারওপরে এই বিড়াল গল্পে কবিতায় উপন্যাসে নানা কবির, নানা লেখকের ভিন্ন ভিন্ন মনস্তত্ত্বের প্রকাশে প্রকাশ্যে এসেছে। জীবনানন্দ লিখছেন 'বেড়াল' নামক কবিতা, সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ও লিখছেন 'বিড়াল' নামক কবিতা, আবার গল্পকার জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর 'গিরগিটি' নামক গল্পে বেড়ালের রূপকে দাম্পত্য সংকটের প্রকাশ ঘটতে দেখা গেছে। এমনকি নবারুণ ভট্টাচার্যের 'হারবার্ট' উপন্যাসেও দেখা যায়, জ্বরের ঘোরে অচেতন হারবার্ট দেখে ''একটা জায়গায় সে আটকে গেছে। গলির মধ্যে। ... কারণ ... এক চোখ কানা একটা খেয়োবেড়াল বসে আছে। গেলেই কামড়াবে।'' আর এ ঔপন্যাসিকেরই লেখা 'অন্ধ বেড়াল' গল্পটি। এক্ষেত্রে বেড়ালের একটা বিশেষণ যোগ করা হয়েছে— 'অন্ধ'। আর সে অন্ধত্বের অতীত সন্ধানেই গল্পের সূচনা। তবে গল্পটির সূচনার আগেই রয়েছে লেখকের প্রত্যক্ষ নিবেদন— ''আমার এই ছোটগল্পটি 'গোলা' নামের একটি বেড়ালের স্মৃতির প্রতি নিবেদিত। আমার অনেক অনাদর তার স্বল্পস্থায়ী জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। অনেক আদরও আছে। তার মৃত্যুও আমার কাছে এক শিক্ষা। চূড়ান্ত অসুস্থ অবস্থায় এক রাতে সে স্বেচ্ছায়, অজ্ঞাতে মৃত্যুবরণ করতে চলে যায়। আর তাকে দেখা যায়নি।'' এদিক থেকে গল্পটির উপস্থাপনভঙ্গীকে অভিনবত্বখানি ধরা পড়ে। তবে এ গল্পে আঁটসাঁটো কোন কাহিনির বুনন লক্ষ করা যায় না। আপাতভাবে মনে হয় খাপছাড়া, অর্থহীন। তবে নবারুণ ভট্টাচার্যের মতো সাহিত্যিক এক অন্ধ বেড়ালের কীর্তিকলাপ বর্ণনা করে সাহিত্যের ঝুলি বোঝাই করবেন এমন ভাবনা অবান্তর। এ বেড়ালটি বহু ঘটনার সাক্ষী। নদীর পাড়ে একটা হোটেলে তার আশ্রয়, যে হোটেলটার একটা টাল ছিল নদীর দিকে। অন্ধ বেড়াল দেখতে পায় না, তবে শুনতে পায়। তবে বুঝতে পারে কিনা তা নিয়ে মতভেদ রয়েছে। তাছাড়া গল্পে উল্লেখ করা হয়েছে বাহাত্তর সালের দুপুরে কোমরে রিভালবার থাকা মানুষটির কথা, যে ডাকাত ছিল না, যিনি মানুষদের জন্য কবিতা লিখতেন। রয়েছে এক প্রেমিকাযুগলের আত্মহত্যার কথা, ট্রলার মালিকের হত্যার কথা। তবে কোনকিছুতেই অন্ধ বেড়ালের কোনো প্রতিক্রিয়া নেই, কেননা সে

তো অন্ধ। আর এই অন্ধত্বের কারণেই প্রশ্ন ওঠে বেড়ালটির নিরাপত্তা নিয়ে, তার নিরাপদ আশ্রয় নিয়ে। সে প্রশ্নের সম্ভাবনাময় উত্তর রয়ে গেল দুটি। প্রশ্ন হল যদি কোন ভয়াবহ ঝড়ে নদীর জলোচ্ছ্বাসে হোটেলটা ভেসে যায়, তাহলে সম্ভাবনা এক, হয়তো জল বেড়ে গিয়ে এক ঝটকাতেই সমস্ত হোটেলটা ভেসে যেতে পারে, সেক্ষেত্রে অন্ধ বেড়াল নিরুপায়। মৃত্যু সুনিশ্চিত। অথবা সম্ভাবনা দুই, হয়তো ঝড় ভয়ানক হল না। হোটেলটা যেমন আছে তেমনই রইল। তাহলে বেড়াল বেঁচে রইল। এই সম্ভাবনাময় ভাবনাতেই গল্পটির সমাপ্তি। তবে এ গল্পের হলেও ভাবনার সমাপ্তি নয়, ব্যঞ্জনার সমাপ্তি নয়। এ গল্পটিকে একটু ভিন্নভাবে ভাবা যেতে পারে। না, কোনো বিশেষ প্রাকরণিক ছাঁচে ফেলে মোটা দাগে রূপক গল্প বা প্রতীক গল্প না হয় নাই বললাম। তবে এভাবে তো ভাবা যেতেই পারে সে, এ গল্পে হোটেলটির নদীর দিকে টাল খেয়ে থাকা অবস্থানটি তৎকালীন দেশ বা রাজ্যের অবস্থানকে বোঝাতে সাহায্য করে। যে আশ্রয়ে মানুষের অবস্থান তা সম্পূর্ণ নিরাপদ নয়, বিপদসঙ্কুল। আর সে বিপদ সর্বদা একমুখী নয়, সর্বমুখী এবং প্রতিনিয়ত। আর অন্ধ বেড়ালকে ভাবতে ইচ্ছে হয় সমকালীন বিপদ-সঙ্কুল দেশের, নিরাপত্তাহীন রাষ্ট্রব্যবস্থার জনসাধারণের প্রতিনিধি হিসেবে, যারা জন্ম থেকেই অন্ধ নয়তো বা অস্তিত্বের লড়াইয়ে অন্ধ হয়ে যাওয়া জীবন্মৃত। এই বলা যায়, এই জীবন্মৃতদেরই লেখক দেখলেন এবং দেখাতে চাইলেন 'অন্ধ-বেড়াল' এর উপস্থাপনায়।

সহায়ক গ্রন্থ

১। নবারুণ ভট্টাচার্য, শ্রেষ্ঠ গল্প।
২। নবারুণ ভট্টাচার্য, অন্ধ বেড়াল।
৩। নবারুণ ভট্টাচার্য, এই মৃত্যু উপত্যকা আমার দেশ না।
৪। নবারুণের আখ্যান বিশ্ব, সেখ মোফাজ্জাল হোসেন।
৫। সত্তর দশক (খণ্ড এক), সম্পাদক অনিল আচার্য।

রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের কয়েকজন প্রতিবাদী পুরুষ ও নারীচরিত্র

শিখা ঘোষ*

আমাদের আত্মা বা হৃদয়ের সঙ্গে 'সহিত' অর্থাৎ সংযোগের সম্বন্ধই প্রকাশিত হয় সাহিত্যে। আত্মার এই অনুভব কখনো সুখ, কখনো দুঃখ, কখনো বৈরাগ্য আবার কখনো বা প্রতিবাদের ভাষা-রূপ পায় সাহিত্যে। দেশে-বিদেশে নানা ভাষায় না-রচিত সাহিত্য, প্রতিবাদের শানিত অস্ত্র নিয়ে নানা সময়ে অন্যায়ের পথ রুদ্ধ করতে সামিল হয়েছে লেখক-লেখিকার কলমে। বাংলা সাহিত্যেও এই দৃষ্টান্ত অসংখ্য। বিশেষত বাংলা সাহিত্যের অবিসংবাদী যুগস্রষ্টা বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের লেখা একাধিক রচনাই এই প্রতিবাদী ভাবনার বাহন হয়ে উঠেছে। যার মূলে রয়েছে স্বয়ং রবীন্দ্র প্রতিবাদী মনন ও চিন্তনের মেলবন্ধন।

রবীন্দ্র কথা সাহিত্যের ব্যাপ্ত পরিসর তথা সমুদ্র থেকে নুড়ি সঞ্চয়ের মতো কিছু কিছু প্রতিবাদী ভাবনা সম্বলিত সাহিত্যিক দৃষ্টান্তের কথাই আজ আমরা আলোচনা করব।

রবীন্দ্র ছোটোগল্পের প্রায় সূচনালগ্নের গল্প 'দেনাপাওনা'। এটি রবীন্দ্রনাথের হিতবাদী-সাধনা পর্বের গল্প। ১২৯৮ বঙ্গাব্দে গল্পটি 'হিতবাদী' পত্রিকায় প্রকাশীত হয়। এই গল্পের নায়িকা নিরুপমা। পণপ্রথার করাল গ্রাস থেকে, বিবাহ নামক সামাজিক নিয়ম অনুষ্ঠানের প্রহসন ও বঞ্চনা থেকে মুক্তি পেতে দরিদ্র পিতা রামসুন্দরের আদরের কন্যা এবং ধনী রায়বাহাদুরের পুত্রবধূ নিরুপমা নীরব প্রতিবাদ স্বরূপ আত্মহত্যা করেছে নিরুপমার আত্মহত্যার কারণে প্রতিবাদের ভিত্তিভূমি পাঠকের কাছে কিছুটা দুর্বল মনে হতে পারে। কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের ভাষা দিয়ে ছিলেন নিরুপমার মুখে। তাই বাবা রামসুন্দরকে পণের টাকা দিতে নিষেধ করে নিরুপমা যে প্রতিবাদের ভাষায় কথা বলেছিল তা আমাদের অন্তরকে প্রজ্জ্বলিত করে — 'নিরু কহিল, ''টাকা যদি দাও তবেই অপমান। তোমার মেয়ের কি কোনো মর্যাদা নেই। আমি কি কেবল একটা টাকার থলি, যতক্ষণ টাকা আছে ততক্ষণ আমার দাম! না বাবা, ও টাকা দিয়ে তুমি আমাকে অপমান কোরো না''।' যদিও গল্পের পরিণতি নিরুপমার আত্মহত্যার নেতিবাচকতাকে ইঙ্গিত করে তবুও একথা আমরা অবশ্যই বলতে পারি নিরুপমার মধ্য দিয়েই রবীন্দ্রনাথ নারীর আত্মসম্মান বোধের জাগরণ ও আপন ভাগ্য জয় করিবার মানসিকতার পরবর্তী ধাপে উত্তীর্ণ হওয়ার প্রাথমিক প্রতিবাদী সূচনা করেছিলেন। যে প্রতিবাদী ভাবনার বীজ কালেকালে মহীরূহে পরিণত হয়েছিল।

রবীন্দ্রনাথের অন্য আর একটি প্রতিবাদী পরিণতি সম্বলিত গল্প 'জীবিত ও মৃত'। হিতবাদীসাধন পর্বের আর একটি উল্লেখযোগ্য গল্প এটি। ১২৯৯ বঙ্গাব্দে গল্পটি প্রকাশিত হয়

* গবেষিকা, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

'সাধনা' পত্রিকায়। কুসংস্কার ও অবিশ্বাসের ট্র্যাজিকে পরিণতির শিকার রাণীহাটের জমিদার বাড়ির বিধবা বউ কাদম্বিনী। শ্মশানে মৃত্যুমুখী, চিতা থেকে হঠাৎই জীবিত হয়ে ফিরে এলেও, সে যে জীবিত রয়েছে এই প্রমাণ দিতে তাকে শেষ পর্যন্ত মৃত্যুবরণ করতে হয়েছে। যে একদিন সকলের প্রিয় ছিল, সে যে এখন একজন জীবিত মানুষ, ভূত-প্রেত নয়, এটা সে কাউকে বিশ্বাস করাতে পারেনি। তাই লজ্জা, অপমান ও ঘৃণায় প্রতিবাদ স্বরূপ সে মৃত্যুকে মুক্তির পথ হিসেবে বেছে নিয়েছে। তাই গল্পের পরিণতি বাক্যে গভীর ঘৃণা ও শ্লেষের সঙ্গে রবীন্দ্র তাঁর শাব্দিক প্রতিবাদ ছুঁড়ে দিয়েছেন এই কু-সংস্কারাচ্ছন্ন সমাজ ও সেই সমাজের প্রতিনিধিদের প্রতি— 'কাদম্বিনী মরিয়া প্রমাণ করিল, সে মরে নাই'।

পরপর দুটি গল্পে প্রতিবাদী ভাবনা থাকলেও রবীন্দ্র সৃষ্ট এই দুই নারী চরিত্রই জীবনের সঙ্গে লড়াইয়ে শেষ পর্যন্ত টিকে থাকতে না পেরে মৃত্যু পরিণতিকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু এবার এমন একজন বিশিষ্ট ও প্রতিবাদী নারী চরিত্রের কথা আলোচনা করব, সে সম্পূর্ণভাবে আজকের এই উত্তর আধুনিক একবিংশ সমাজের স্বাধীন বাক্-সত্ত্বার অধিকারী নারী সমাজের প্রতিনিধি। যার ভাবনা, চিন্তা, আত্মপ্রকাশ, প্রতিবাদী বাক্‌ভঙ্গি বর্তমান পাঠককেও বিস্মিত করে, রবীন্দ্র মননের ভবিষ্যতদ্রষ্টা আধুনিকতাকে কল্পনা করে। এই নারী হল 'স্ত্রীর পত্র' গল্পের মৃণাল। পত্রটি কেবল স্বামীর উদ্দেশে লেখা স্ত্রীর (মৃণালের) পত্র নয়, এটি আত্মসম্মানের অধিকারের দাবি জানানো প্রতিবাদের দলিল। ১৩২১ বঙ্গাব্দে 'সবুজপত্র' পত্রিকায় গল্পটি প্রকাশীত হয়। 'স্ত্রীর পত্র ' গল্পটির প্রসঙ্গে ড. সমরেশ মজুমদার বলেছেন : '' 'স্ত্রীর পত্র ' মুখ্যত একটি প্রতিবাদী গল্প। একে নারীমুক্তির গল্প বলেও অভিহিত করা যেতে পারে।"

গল্পের সূচনায় মেজো বউ-এর লেখা দিয়ে পত্রারম্ভ হলেও প্রকৃতপক্ষে মৃণাল লিখেছে পত্রটি কারণ সে বলেছে 'এ তোমাদের মেজ বৌয়ের চিঠি নয়'। কারণ বিবাহের দীর্ঘ পনেরো বছরের জমে থাকা অবহেলা, লাঞ্ছনা, অপমান, অবমাননার একাধিক কারণই কংক্রিটের মতো জমাট বেঁধে আজ মেজ বৌ থেকে মৃণালকে স্বতন্ত্র করেছে। এই গল্পে রবীন্দ্র প্রতিবাদী ভাবনার একাধিক dimension দেখা যায় মৃণালের ভিন্ন ভিন্ন উক্তিতে। শ্রীক্ষেত্রের আদিগন্ত ব্যাপ্ত সমুদ্র ও জগদীশ্বরের সান্নিধ্যে দাঁড়িয়ে মৃত্যুকে পায়ের ভৃত্য জেনে সে বৃহত্তর জগতের তথা জীবনের অনুসন্ধানে ব্রতী হয়েছে, বাঁচার সাহস তথা প্রতিবাদ করার সাহস অর্জন করেছে। তাই সে বলে— 'আজ সাহস করে এই চিঠিখানা লিখছি'। ছেলেবেলায় ভাই-এর সঙ্গে সান্নিপাতি জ্বরে ভাইকে হারিয়ে মৃত্যুর লড়াইয়ে পুনরায় জীবনে ফিরেছিল মৃণাল। সেই জীবন থেকে আরো এক, দুই, তিন করে অগণিত জীবনের স্বাদ পেল মৃণাল। তৈরি করল তার স্বতন্ত্র্য আত্ম পরিচয়। তাই স্বামীর উদ্দেশে লেখা চিঠিতে মৃণাল নিজেকে নিছক মেয়ে মানুষ হিসেবে নয়, বরং একজন বুদ্ধিমতী, ব্যক্তিত্বপরায়ণা ও সৃষ্টিশীল প্রতিভাসম্পন্ন কবি হিসেবে আত্মপরিচয় জানিয়ে শ্লেষোক্তিতে বলেছে— 'আমি যে কবি, সে এই পনেরো বছরেও তোমাদের কাছে ধরা পড়েনি'। তার বুদ্ধিদীপ্ততাকে দমিয়ে দিয়ে ঠাট্টা করে তাকে সবাই 'মেয়েজ্যাঠা' বলে গালি দিলেও, মৃণাল কিন্তু

তার কবি সুলভ হৃদয় প্রসারতার কারণে সেই কটুক্তিকারীদের ক্ষমা করেছে। মৃণালের এই প্রতিবাদী নারীসত্তা গড়ে ওঠার মূলে রয়েছে অনেক স্বজন হারানোর শোক। আঁতুড় ঘরে সদ্যোজাত কন্যাকে হারিয়েছে, ছোট্ট ভাইকে অকালে হারিয়েছে, একান্ত প্রিয় বালিকা বিন্দুকে হারিয়েছে। এত বেদনা, শোক তাকে দুঃখের আগুনে পুড়িয়ে পুড়িয়ে খাঁটি সোনার মতো ঝকঝাকে প্রতিবাদী নারী করে তুলেছে। তাই মৃণাল বলে— 'মা হবার দুঃখটুকু পেলুম, কিন্তু মা হবার মুক্তিটুকু পেলুম না'। এই স্বচ্ছ হৃদয়বোধ ও যুক্তিবোধের জায়গা থেকেই সে বড়ো জায়ের অনাথা বোন 'কালো মেয়ে' বিন্দুকে আপন করে নেওয়ার ক্ষেত্রে বলে—'আমি যেটাকে ভালো বলে বুঝি, আর কারও খাতিরে সেটাকে মন্দ বলে মেনে নেওয়া আমার কর্ম নয়'। কিংবা পাগল ছেলের সঙ্গে বিন্দুর বিয়ে দিলে, শ্বশুর বাড়ি ত্যাগ করে চলে আসার পর সকলে বিন্দুর বিপক্ষে গেলেও, মৃণাল তার প্রতিবাদ করে বলেছে—'এমন ফাঁকির বিয়ে বিয়েই নয়'। আর সেই অপমান সহ্য না করতে পেরে বিন্দু যখন গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করল, তখন মৃণাল বিন্দুর চলে যাওয়াকে এইভাবে অনুভব করেছে যে— 'আমি মৃত্যুর চেয়ে বড় / এই শেষ কথা বলে / যাব আমি চলে', অর্থাৎ বিন্দু মরে বেঁচেছে। এমন ঘৃণ্য জীবনে দগ্ধ বাঁচার থেকে এ মৃত্যু সম্মানের সুখকর। তাই এর প্রতিবাদে ব্যঙ্গ ও শ্লেষোক্তি করে মৃণাল বলেছে— 'নাটকের তামাশাটা কেবল বাঙালি মেয়েদের শাড়ির উপর দিয়েই হয় কেন, আর বাঙালি বীর পুরুষদের কোঁচার উপর দিয়ে হয় না কেন ...'। সমাজের এই লিঙ্গ বৈষম্যকে ধিক্কার জানিয়েই মৃণাল সিদ্ধান্ত নিয়েছে—'আমি আর তোমাদের সেই সাতাশ নম্বর মাখন বড়ালের গলিতে ফিরব না।' তাই পুরুষ সমাজের বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণায় গৌরব অনুভব করে মৃণাল— 'আজ বাইরে এসে দেখি, আমার গৌরব রাখবার আর জায়গা নেই।' তাই বৃহত্তর জগতের মুক্তির আস্বাদ মৃণালকে স্পর্শ করে যায়। আর এভাবেই গল্পের পরিণতিতে 'মেজবৌয়ের' খোলস ছিন্ন করে মুক্তি ঘটে মৃণালের। তাই পত্রের শুরুতে 'শ্রীচরণকমলেষু' সম্বোধনে যে বক্তব্যের সূচনা হয়েছিল, সমাপ্তিতে আত্মসম্মান বোধের জাগরণে সেই সম্বোধনের পরিণতি ঘটেছে— 'তোমাদের চরণতলাশ্রয়চ্ছিন্ন মৃণাল'।—এই প্রতিবাদী উক্তিতে ও ভাবনায় '' 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণালের দাম্পত্য সমস্যা তার ব্যক্তিত্বের জাগরণের ফলে সৃষ্টি হয়েছে। তার সবল ব্যক্তিত্ব ঠুনকো বংশ মর্যাদা ও দাম্পত্য সম্পর্কের গণ্ডীকে হেলায় অতিক্রম করেছে। পরে সে যে চিঠি দিয়েছে তা স্বামীর কাছে স্ত্রীর পত্র নয়—পুরুষের কাছে এক ব্যক্তিত্বময়ী নারীর পত্র।" সিরাজুল ইসলামের বক্তব্য তাই এপ্রসঙ্গে যথার্থতার দাবি রাখে।

রবীন্দ্রনাথের 'নষ্টনীড়' গল্পের পরিকাঠামোগত রূপায়ণেও আমরা রবীন্দ্র প্রতিবাদী ভাবনার বিশেষ অনুষঙ্গ খুঁজে পাই। ১৩০৮ বঙ্গাব্দে 'ভারতী' পত্রিকায় বৈশাখে অগ্রহায়ণ সংখ্যায় গল্পটি প্রকাশিত হয়। সামাজিক বিধানে চারু-অমলের সম্পর্ক বৌদি ও দেওরের। সেখানে প্রেমের কোনো স্থান নেই। তবুও ভূ-পতির সঙ্গে বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ হয়েও চারুলতা ও অমল পরস্পরকে ভালোবেসেছে। সংবাদপত্রের প্রতি একনিষ্ঠ মমত্বে ভূপতি সেখানে চারুলতাকে

নিয়ে তার প্রেমের নীড় গড়ে তুলতে ব্যর্থ হয়েছে, সেই শূন্য স্থান সুন্দরভাবে পূর্ণ করতেই কোনো অজানা আকর্ষণে নির্মিত হয়েছিল চারু-অমলের স্বপ্নিল নন্দন-কানন। প্রকৃতপক্ষে চারুর প্রতি স্ত্রীর কর্তব্যে ভূপতির দায়িত্বজ্ঞান প্রবল থাকলেও, স্ত্রীকে হৃদয়ের দোসর করে তুলতে যে ভালোবাসার স্পর্শ ও আবেশানুভূতির প্রয়োজন ছিল, ভূপতি সেখানে চারুলতাকে দারুণ অবহেলার পাত্র করে তুলেছিল। তাই অমলের প্রতি চারুলতার সমাজনিষিদ্ধ পরকীয়ার অসীম আকর্ষণকে রবীন্দ্রনাথ যেমন মনস্তাত্ত্বিক ব্যাখ্যার ভিত্তিভূমি দিয়েছেন, তেমনি বলা যায় এই প্রেম একইসঙ্গে ভূপতির অবহেলার চূড়ান্ত প্রতিবাদ, বলা যায় অনুশাসন ও নিয়মের নিগড়ে পিষে ফেলা মানসিকতার বিরুদ্ধে তীব্র জেহাদ ঘোষণা। এইভাবে নরনারীর প্রেমের ত্রিভুজ সমস্যার কথা সাহিত্যের অন্যতম দ্বান্দ্বিক বিষয় হয়ে ওঠে। 'চোখের বালি' উপন্যাসেও মহেন্দ্র ও বিহারীর প্রতি বিধবা বিনোদিনীর অনুরাগের প্রকাশ ও ব্যাপ্তি ঘটিয়ে রবীন্দ্রনাথ আরো একবার সামাজিক অনুশাসনের লাল চোখকে উপেক্ষা ও উপহাস করেছেন, বিশেষত একজন নারীকে কেনই বা অসংখ্য 'না' এবং 'কেন'র শৃঙ্খলে চলতে বাধ্য করা এই সমাজের বিরুদ্ধে, এই গল্প ও এই উপন্যাসের দুই চরিত্রকে দুটি ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদী করে চিত্রিত করেছেন। বলা যায় তার প্রতিবাদী ভাষা ও আচরণ দিয়েছেন গল্পের নায়িকাদের মধ্যে। তাই 'নষ্টনীড়' গল্পের শেষে দেখি চারু তার সমস্ত দহন যন্ত্রণা নিভৃতে ভোগ করে নিঃস্ব হৃদয় ভূপতিকে মুক্তি দিতে তার সঙ্গে মৈশুরে যেতে অস্বীকৃত হয়ে উচ্চারণ করেছে এক অভিমানী ও প্রতিবাদী উক্তি— 'না, থাক'। এ প্রসঙ্গে ড. সমরেশ মজুমদার বলেছেন— ''পরের হৃদয়ের কাছে বিক্রীত স্ত্রীকে সাহচর্য দিতে তার মন চায়নি। কিন্তু পরে চারুর ভবিষ্যতের কথা ভেবে তাকে সঙ্গে নিতে চাইলেন। এবার চারু রাজি হল না— যে স্বামী তাকে গ্রহণে অনিচ্ছুক তার সঙ্গ সে আর চাইছে না।" তাই ছোট্ট শব্দবন্ধের মধ্যেই চারুর জীবনের সকল অপূর্ণতাকে পূর্ণ করতে ব্যর্থ ভূপতির প্রতি ব্যঙ্গ, খেদ, প্রতিবাদ সমস্তই দারুণভাবে ব্যঞ্জনা পেয়ে যায়।

এতক্ষণ আমরা রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের বিশেষত ছোটোগল্পে নারীর প্রতিবাদী ভাবনার কয়েকটি দৃষ্টান্ত আলোচনা করেছি। এবার আমরা যে গল্পের আলোচনা করব সেখানে দেখব সামন্ততান্ত্রিক system এর বিরুদ্ধে এক পুরুষের প্রতিবাদ। সে হল 'হালদার গোষ্ঠী' গল্পের বনোয়ারীলাল। গল্পটি ১৩২১ বঙ্গাব্দে (১৯১৪ খ্রিঃ) 'সবুজপত্র' পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। জমিদার মনোহরলালের জ্যেষ্ঠ পুত্র সে, তবুও সেই বাড়িতে তার স্বাধীনতার দারুণ অভাব, প্রকৃত সম্মান না পাওয়া, বিষয়কর্মে নিজের যথার্থ অধিকার থেকে বঞ্চিত হওয়া—এ সমস্ত কিছুই বনোয়ারিকে এত প্রতিবাদী চরিত্র করে গড়ে তুলেছে। এ প্রসঙ্গে ড. প্রমথনাথ বিশী বলেছেন— ''রবীন্দ্রনাথের 'দেনাপাওনা (১২৯৮ বঙ্গাব্দ) থেকে 'হালদার গোষ্ঠি' (১৩২১ বঙ্গাব্দ) পর্যন্ত ৬৮ টি গল্পের অধিকাংশই যৌথ পরিবার। এই সমস্ত পরিবারের অধিকাংশ সদস্যই একান্নবর্তিতার সুকঠোর বিধিনিষেধের নিয়ম শৃঙ্খলে আবদ্ধ। পরিবারস্থ ব্যক্তিত্বের ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য বোধ যৌথ পরিবারে খুব একটা মর্যাদা পায় নি।" জমিদার বাড়ির জ্যেষ্ঠ পুত্র হওয়া সত্ত্বেও জমিদারীতে তার কোনো

ক্ষমতা নেই, অথচ সেই ক্ষমতা আছে চাকর নীলকণ্ঠের। যার ওপর সমস্ত তহবীলের ভার, যার ওপর মধু-কৈবর্তদের বিচারের ভার সমস্ত দিয়ে মনোহরলাল নিশ্চিন্ত! এই অনীহা ও অপমান বনোয়ারীকে ভেতরে ভেতরে ক্ষুব্ধ করে তোলে। বনোয়ারীর মনে হতে লাগল— 'মধু কৈবর্তের দুঃখ দূর করিবার ক্ষমতা তাহার নাই, সে ক্ষমতা আছে নীলকণ্ঠের! এমন কাপুরুষের কণ্ঠে পরাইবার জন্য মালা কে গাঁথিয়াছে।' এই ভাবনা থেকেই বনোয়ারী পিতার বিরুদ্ধে গিয়ে মধু-কৈবর্তদের জন্য লড়াই করে, কিন্তু শেষ পর্যন্ত মধু-কৈবর্তদের সে রক্ষা করতে ব্যর্থ হয় নীলকণ্ঠের প্ররোচনায়। এমনকি তার একান্ত প্রিয়জন স্ত্রী কিরণলেখাকে মনপ্রাণ দিয়ে ভালোবাসতে চেয়েও তার হৃদয়বত্তাকে সে সেই প্রেমের উচ্চতাতর বাঁধতে পারেনি, তাদের সম্পর্ক প্রেমের জোয়ারে দোঁহাকে বাসাতে কোথাও তাই ব্যর্থ হয়ে যায়। আর তাই পরিবারের সকলের কাছে কিরণলেখাকে সহজে গ্রহণযোগ্য হতে দেখে এবং পরিবারের সঙ্গে নিজের দূরত্ব রচিত হতে দেখে বনোয়ারী দারুণভাবে আহত হল। সে চেয়েছিল কিরণলেখা তাকে সমর্থন করুক, তার হৃদয়ক্ষতে প্রলেপ দিক ভালোবাসার, কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তা হয়নি। স্ত্রীকে প্রেয়সী করে যে কবিতার অমরাবতী রচনা করতে চেয়েছিল সেখানেও ব্যর্থ বনোয়ারী। এই সমস্যাত ব্যর্থতা বনোয়ারীর ক্ষতকে দিনে দিনে গভীর থেকে গভীরতর করেছে। তাই ভাইপো হরিদাসের নামে লিখিত সমস্ত সম্পত্তির দলিল সে চুরি করে পিতা মনোহরলালেরে প্রতি প্রবল ঘৃণায় ও প্রতিবাদে। তার মনে হয়েছিল সে সেই দলিল প্রতিযোগী জমিদার প্রতাপ বাঁড়ুজ্যেদের দিয়ে দেবে কারণ যে বিষয় সম্পত্তি থেকে সে চিরকাল অনীহা ও বঞ্চনা পেয়েছে কেবল, 'সেই বিষয় সম্পত্তি সমস্ত ছারখার হইয়া যাক।' কিন্তু শেষ পর্যন্ত বনোয়ারির হৃদয়ের ক্ষোভ যন্ত্রণা এত ক্ষুদ্র মানসিকতায় পর্যবসিত হয়নি হরিদাসের সরল হৃদয়কে ভালোবেসে, পরিবর্তে এক বৃহত্তর প্রতিবাদের মাত্রা পেয়ে যায় বনোয়ারীর গৃহত্যাগ। যে সম্পত্তি তা মানসিকতাকে, আত্মমর্যাদাকে ক্ষুণ্ণ করেছে, তার প্রেমকে কখনো পূর্ণতা দেয়নি, তার স্বাতন্ত্র্যকে কখনো পরিপূর্ণ বিকাশ ঘটাতে দেয়নি, পদে পদে পথরুদ্ধ করেছে তার—সেই সম্পত্তির মোহজাল ছিন্ন করে, দাম্পত্য জীবনের না পাওয়া সব ব্যাথাকে তুচ্ছ করে সে আপন পরিচয় গড়ে তুলতে, ব্যক্তিত্ব ও আত্মসম্মানের প্রকৃত মর্যাদা পেতে কেবল একছত্র চিঠি লিখে চাকরি খুঁজতে বের হল। বনোয়ারীর এই সিদ্ধান্ত তাকে ক্ষমতাহীন রাজা থেকে মনের জগতে রাজার মতো বাঁচার পথে অগ্রসর করেছে। সামন্ততান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার প্রতিবাদে তার ব্যক্তিসত্তার বিকাশ সাধনের লক্ষ্যে এ এক তীব্র জেহাদ।

এমনই আর এক পৌরুষদীপ্ত, কর্তব্যে অবিচল, অন্যায়ের প্রতিবাদী অবিচল ব্যক্তিত্ব অঙ্কন করেছেন রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'রাজর্ষি' উপন্যাসে রাজা গোবিন্দমাণিক্যের চরিত্রে। ১২৯৩ বঙ্গাব্দে উপন্যাসটি 'বালক' পত্রিকায় ধারাহাবিকভাবে প্রকাশিত হতে থাকে। সেখানে ভুবনেশ্বরীর মন্দিরে পশুবলি বন্ধ ঘোষণা করায় পুরোহিত রঘুপতির সঙ্গে নিরন্তর দ্বন্দ্ব চলেছে। গোবিন্দমাণিক্যকে এরজন্য বহু মূল্য দিতে হয়েছে। ভ্রাতৃবিরোধ ঘটে গিয়েছে, প্রজাদের অভিশাপ কুড়িয়েছেন, প্রাণের থেকে প্রিয় ধ্রুব-র সঙ্গে বিচ্ছেদ ঘটে গিয়েছে, শেষ পর্যন্ত সমস্ত রাজ্যভার স্বেচ্ছায়

ভাইকে সমর্পণ করে তিনি রাজ্য থেকে নির্বাসন নিয়ে বহুদূরে চলে গিয়েছেন, তবুও সেই অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ব্যক্তিত্বে অবিচল থেকেছেন, কর্তব্যের কাছে যে ভাই বন্ধু সকলে সমান—এ সত্য তিনি সমগ্র জীবন দিয়ে মেনে চলেছেন।

এইভাবে সমগ্র রবীন্দ্র সাহিত্য বিশ্লেষণ করলে এমন আরো অজস্র প্রতিবাদী চরিত্র ও তাদের ভাবনা সূত্রের মালা গাঁথা সম্ভব। কিন্তু আলোচনার এত ক্ষুদ্র পরিসরে কেবল তার সূচনাটুকুই সম্ভব, বিস্তার অনেক সময়সাপেক্ষ। তবুও এই চরিত্রগুলির প্রতিবাদ, তাদের মানসিকতা ও দৃষ্টিকোণ পর্যালোচনা করলে রবীন্দ্রমননের প্রতিবাদ ধর্মী বৈশিষ্ট্যের উৎসস্থল সম্পর্কে কিছুটা উপলব্ধি করা যায়। তাই পুরুষ শাসিত সমাজের শাসনগত পরিকাঠামো যে ঠাকুরবাড়িতে বর্তমান ছিল এবং সেই চকের গণ্ডীর মধ্যে থেকেই যে ছোট্ট রবি, বিশ্ববন্দিত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর জীবনেও প্রতিবাদ সঞ্চরণকারী এমন বহু ঘটনার প্রেক্ষাপট অবশ্যই ছিল। আর সেইসব শোক, ব্যথা, না-পারার ক্ষোভ-যন্ত্রণা তাঁর কলমে পেয়েছে প্রতিবাদের ভাষা। যে নিয়মের নিগড়ে রবীন্দ্রনাথ নিজেই কখনো-বা শিকার হয়ে গিয়েছেন। চারুলতার প্রতি ভূপতির উদাসীনতা, কিংবা মৃণালের প্রতি তার স্বামী ও শ্বশুরবাড়ির উপেক্ষা কোথাও যেন স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর প্রতি রবীন্দ্রনাথের নিজেরই যথার্থ কর্তব্যপালন করতে না পারার ব্যর্থতাকেই স্মরণ করায়। স্ত্রীর মনের এই ব্যথা সম্পর্কে কবি অনবগত ছিলেন না, তাই মৃণালের ভাবনাকে 'স্ত্রীর পত্র' গল্পে প্রতিবাদী ভাষায় অঙ্কিত করে কোথাও নিজের প্রতিই স্ত্রী মৃণালিনী দেবীর অনুচ্চারিত প্রতিবাদকে আত্মধিক্কারের শাস্তি বলে গ্রহণ করেছেন। আবার পণপ্রথার কারণে নিরুপমার মৃত্যুর মধ্যে কোথাও যেন তাঁর আদরের কন্যা 'বেলি'-র জীবনের করুণ পরিণতিই সমীকৃত হয়ে যায়। মেয়ের শ্বশুরবাড়িতে পিতা হয়ে যে অবহেলা রামসুন্দর সহ্য করেছেন, তার মধ্যেও আমরা কবির হৃদয়যন্ত্রণাকেই স্পষ্ট দেখতে পাই। আর শিক্ষা-সংস্কৃতির মধ্যে যে রবীন্দ্রনাথ চিরকাল তাঁর আনন্দ খুঁজেছেন, তাঁর ব্যথা ভুলেছেন তিনি কোনোভাবেই স্বেচ্ছায় জমিদারী, বিষয়-সম্পত্তির ঊর্ণনাভজালে আবদ্ধ হতে চাননি। তিনি প্রজাদের পাশেই থাকতে চেয়েছেন মনে মনে একান্তভাবে, হয়তো বাস্তব পরিস্থিতিতে সকল ক্ষেত্রে তা সম্ভব হয়নি। এই পারা না-পারার দ্বন্দ্বে রবীন্দ্রনাথও বনোয়ারীর মতোই ক্ষতবিক্ষত হয়েছিলেন। আর তাঁর মনের ক্ষোভ প্রতিবাদের ভাষা পেয়ে যায় তাঁর লেখনীতে। 'নষ্টনীড়' গল্পেও চারু-অমলের অর্থাৎ দেওর-বউদির সমাজ অস্বীকৃত যে মধুর সম্পর্কের ট্রাজিক পরিণতি ফুটে উঠেছে, তা তো কাদম্বরী দেবীর দুঃখময় পরিণতিতে গভীর ক্ষতের মতোই রবীন্দ্র জীবনেও স্পষ্ট ও সত্য। সেই ব্যথা-বেদনা, অভিমান, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ, প্রচলিত সিস্টেম-এর বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের তীব্র প্রতিবাদ ভাষা পেয়ে যায় তাঁর সৃষ্ট ছোটোগল্প উপন্যাসের ঘটনায় ও চারিত্রিক সমাবেশে। যে রবীন্দ্রনাথ বাস্তবজীবনে সত্যের প্রতি অবিচলতায় ও প্রতিবাদে 'নাইট' উপাধি ত্যাগ করেছিলেন, সেই রবীন্দ্রনাথই উপন্যাসের পাতায় সত্যে অবিচল থেকে গোবিন্দ মাণিক্যের মতো সর্বস্বত্যাগী হতে পিছপা হননি। এইভাবে সমগ্র রবীন্দ্র কথাসাহিত্যে রবীন্দ্র প্রতিবাদী মনন ও ভাবনার উজ্জ্বল দৃষ্টান্তের রত্নহার গ্রোথিত হয়ে

আছে, নিহিত হয়ে আছে তাঁর অদ্ভুত হীরকদ্যুতিময় জীবনদর্শন, যা আমাদের ক্ষণে ক্ষণে চমকিত করে, প্রতিবাদী করে। একথাই বারবার মনে করিয়ে দেয় যে— 'অন্যায় যে করে আর অন্যায় যে সহে / তব ঘৃণা যেন তারে তৃণসম দহে।'

সহায়ক গ্রন্থ

১। উজ্জনলকুমার মজুমদার (সম্পাদিত), 'গল্পচর্চা, ১ম সংস্করণ', প্রজাতন্ত্র দিবস, ২০০৮, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, কলকাতা।

২। সমরেশ মজুমদার, 'রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ : বিশ্লেষণী পাঠ', প্রথম প্রকাশ : ডিসেম্বর ১৯৯৮, রত্নাবলী, কলকাতা।

৩। তপোব্রত ঘোষ, 'রবীন্দ্র ছোটোগল্পের শিল্পরূপ', প্রকাশ : ২২ শ্রাবণ, ১৪১৭, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা।

৪। সিরাজুল ইসলাম, 'রবীন্দ্র ছোটোগল্পে পারিবারিক পটভূমি', রত্নাবলী, কলকাতা।

৫। প্রমথনাথ বিশী, 'রবীন্দ্র ছোটোগল্প', মিত্র ও ঘোষ, কলকাতা।

সত্তর দশকের অন্যান্য কবি ও কবি কৃষ্ণা বসু

রুম্পা ভদ্র*

পশ্চিমবঙ্গের সত্তর দশকের অন্যান্য কবি ও কবি কৃষ্ণা বসুর আলোচনা প্রসঙ্গে বাড়তি দু'চার কথা স্বাধীনতা প্রাপ্তি কিংবা স্বাধীন ভারতে পশ্চিমবঙ্গের যে চাপান-উতোর চলছে এই দশকে কিংবা বাংলাদেশ নামক স্বাতন্ত্রিক একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠাকালে পশ্চিমবঙ্গের যে অবদান তাকে বাদ দিয়ে সত্তর দশকের আলোচনা করা যায় না। আর এ প্রসঙ্গকে বাদ দিয়ে সত্তর দশকের আলোচনা যে অপূর্ণ থেকে যাবে। তাই এই দশকের কবি ও কবিতা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে আমরা চলে যাবো কিছুটা অতীতে; ১৯৪৭ সালে ভারতবর্ষ তার চরমপ্রাপ্তি স্বরূপ স্বাধীনতা পেলো। পেলো দীর্ঘ অপেক্ষার সোনার ফসল। নেতাদের আকাঙ্ক্ষাও পূর্ণতা পেলো। পরিবর্তে ভারতবর্ষ নামক দেশটি ভেঙে পাকিস্তান আর পাকিস্তান নামক দুটি স্বতন্ত্র দেশের জন্ম নিল। আর পাকিস্তানের জন্ম দিতে গিয়ে পাঞ্জাব আর বাংলাকে ভাগ করতে হয়। ফলে দেখা দিল উদ্বাস্তু সমস্যার চাপ যা বাংলাদেশ তথা পশ্চিমবঙ্গকে বিধ্বস্ত করেছে। বাংলাদেশ থেকে ক্রমাগত শরণার্থী এসে হাজির হয়েছে পশ্চিমবঙ্গে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতিতে উদ্‌বাস্তু সমস্যাও একটি নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। ভারতবর্ষের ইতিহাসে স্বাধীনতা প্রাপ্তি থেকে পূর্ববঙ্গের বাংলাদেশ রূপে স্বাধীনতাপ্রাপ্তি পর্যন্ত বাংলা কবিতা জগতে কতকগুলি লক্ষণ দেখা দেয়। যথা:–

(১) কমিউনিস্ট দর্শনে অতিমাত্রায় অবস্থা স্থাপন।
(২) কবিতার আঙ্গিক নিয়ে নানান ধরনের পরীক্ষা-নিরীক্ষা।
(৩) অপ্রাপ্তিজনিত দুঃখ বেদনা ও হতাশার চালচিত্র
(৪) নবযুগের প্রত্যাশা।
(৫) ব্যক্তিগত অনুভূতির নিবিড় প্রকাশ।

স্বাধীনতার সময়কালে সারাদেশ জুড়ে যে মন্ত্র উচ্চারিত হয়েছিল– তা হল স্বদেশপ্রেম। এই স্বদেশপ্রীতির ছোঁয়া গিয়ে পড়ে কবিতাতেও। তবে দেশভিত্তিক কিংবা দেশের জন্য জীবনগণের অঙ্গীকার এই সময়ের কবিতায় বিলক্ষণ ছিল ঠিকই তবে কবিতার বিষয় সমূহের বদলও ঘটল। বদল এলো কবিতার আঙ্গিককতার দিকেও। যেমন– এই সময়ের কবি মণীন্দ্র গুপ্তের কবিতায় পাই চিত্রময়তার ছোঁয়া যেমন–

ছোট পাখির মতো রোদ সারাদিন গাছগাছালি
ঠুকরে ঠুকরে
শাখা মেলে শূন্যে ওড়ে শেষ বেলায়

* গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, রাঁচি বিশ্ববিদ্যালয়।

দেশীয় মানুষের দুঃখ-বেদনার পাশাপাশি চিনের সংগ্রাম, মার্কিন সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভিয়েৎনামের স্বাধীনতার যুদ্ধ, রাশিয়ায় স্টালিনের সংস্কারপন্থী পদক্ষেপ – যেকোনো সমাজসচেতন কবির কবিতায় বিষয় হয়ে উঠেছিল। যেমন কৃষ্ণ ধরের লেখা – আমার হাতে রক্ত (১৯৬৭), কালের রাখাল তুমি ভিয়েৎনাম (১৯৪৭) কিংবা পদধ্বনি কাব্যগ্রন্থ ওই সময়কেই ইঙ্গিত করে। আবার পল্লীবাংলার রূপমুগ্ধতা নিয়ে লেখা হয়েছে অনেক কবিতা। যেমন - এনামূল হকের ডিঙি (১৯৪৯)।

শতভিষা পত্রিকায় সম্পাদক আলোক রায়ের কবিতায় ঘাই রূপকথায় অনুভূতি, সুররিয়ালিজমের স্পর্শ কিংবা কবি ইঙ্গিতময়তাকে বুঝিয়ে দিয়েছেন রোমান্টিক অনুভবের প্রগাঢ়তায়।

স্বাধীনতার পূর্বে কৃষিকেন্দ্রিক যেসব আন্দোলনগুলি চলছিল, স্বাধীনতার পরেও তা অব্যাহত থাকে। বরং ১৯৪৭-এর পর তেভাগা আন্দোলন আরও জোরদার হয়ে ওঠে। তেভাগা আন্দোলনের সময় বহু গান ও কবিতা লেখা হয়েছে। নানা কবির কাব্যে তার নিদর্শন মেলে। যেমন সলিল চৌধুরির ''হেঁই সামালো হেঁই সামালো'' কিংবা রাম বসুর 'পরান মাঝি হাঁক দিয়েছে' কবিতাটির কথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে।

আমাদের পেটে তো ভাত নেই
পরনে কাপড় নেই
খোকার মুখে দুধ তো নেই এক ফোঁটাও

এ কবিতা ছাড়াও রাম বসুর অন্যান্য বহু কবিতাতেই পাই কৃষকদের উপর জমির মালিকদের অত্যাচার ও অবিচারের কাহিনিচিত্র।

বিষয়দের রঙ গাঢ় কবি পূর্ণেন্দু পত্রীর কবিতায়। প্রথম কাব্য 'একযুগে রোদ' (১৯৫১) কবিতায় কবির বিষাদ আসলে অভিমান। তবে এ অভিমান পরিণত বয়সে বিষাদ হয়েই ঝড়ে পড়েছে – অতৃপ্তির কারণে। যেমন–

তখন ছিল পিদিম জ্বালা ঘর
বয়স ছিল সোহাগে তৎপর।
বয়সে ছিল মৌমাছিদের ক্ষুধা
মুড়ির সঙ্গে গুড় মিশলেই সুধা।

(আত্মচরিত/ ৩)

দেশ বিভাজনের মূল্যে অর্জিত সুখ এবং দুঃখই উভয়ই অনুভব করেছেন অনেক কবি-সাহিত্যিক। এরকমই এক কবি-ব্যক্তিত্ব হলেন নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তী। স্বাধীনতা উত্তর-বাংলাদেশে মানুষের জীবনে স্থিতি ও অস্থিরতার যে দ্বন্দ্ব দেখা দিয়েছিল – যা তাকে উপনীত করেছিল প্রায় অনিকেত বোধের দোরগোড়ায় আর এসবের প্রত্যক্ষ দ্রষ্টা বলেই নীরেন্দ্রনাথের কবিতায় এর পরিচয় মেলে। নীরেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর কবিতায় সমকাল চেতনা অত্যন্ত প্রখরভাবে উপস্থিত। ব্যক্তিগত

অভিজ্ঞতার আলোকে সে চেতনা কবিতার বিষয়ে এনেছে এক আশ্চর্য আন্তরিকতা। কোনো 'ইজমের' জয়গান না গেয়েও উলঙ্গ রাজা কাব্যের কবিতা 'উলঙ্গ রাজা'।

শিশুটি কোথায় গেল? কেউ কি কোথাও
তাকে কোনো
পাহাড়ের গোপন গুহায়
লুকিয়ে রেখেছে।

(উলঙ্গ রাজা)

মানবতাবাদীকবির বিশেষ জীবন দর্শন সাবলীল অন্তরস্পর্শী ভাষায় ব্যক্ত হয়েছে এ কবিতায়।

কবিদের হাত ধরে কবিতায় জগতে এসেছে পরিবর্তনের ঢেউ। বাংলা কবিতার বিষয় ও আঙ্গিকের ব্যাপার নিয়ে যে সব কাব্য আন্দোলন গড়ে উঠেছে ষাটের দশকের হাংরি কবিরা নিজ-নিজ জীবনাচরণে পরিচিত সংযম ও সামাজিকতাকে বিসর্জন দিয়ে বসেছিলেন। নিয়ম ভাঙার অত্যান্তিক অভীপ্সা তাঁদের আচরণের স্বাভাবিকতাকে যেমন নষ্ট করে আপাত ভালোলাগার বস্তুর প্রতি অতিরিক্ত আগ্রহ দেখানো হয়েছে হাঙরির সুযোগমাত্র হাংরি জেনারেশনের প্রথম বুলেটিনে এর কারণ ব্যাখ্যা প্রসঙ্গে হাংরি কাব্য আন্দোলনের প্রবক্তা মলয় রায়চৌধুরী বলেছেন, – 'কবিতা এখন জীবনের বৈপরীত্যে আত্মস্থ।' কেননা কবিতার মাধ্যমে জীবনের অর্থ বের করার গতানুগতিক প্রয়াসের ইতি ঘটে গিয়েছে – এখন কবিতার প্রয়োজন অনর্থ বের করার কাজে। এবং কবিতা ব্যক্ত করবে 'মানবিক, দৈহিক এবং শারীরিক' ক্ষুধার কথা (দৈহিক ও শারীরিক একই কথার প্রয়োগ কবির অসচেতনার প্রমাণ)। 'মানুষ, ঈশ্বর। গণতন্ত্র এবং বিজ্ঞান পরাজিত হয়ে গিয়েছে। কবিতা এখন একমাত্র আশ্রয়'।

হাংরি জেনারেশনের এক অন্যতম কর্ণধার, ছিলেন– সমীর রায়চৌধুরী। এছাড়াও সুবো আচার্য, উৎপলকুমার বসু, মলয় রায়চৌধুরী, দেবী রায়, তুষার রায় কিংবা অরুণেশ ঘোষ, শৈলেশ্বর ঘোষ, অরণি বসু, কমলেশ সেন প্রমুখ হাংরি আন্দোলনের পুরোধা কবি ব্যক্তিত্ব।

হাংরি আন্দোলন শুরু হওয়ার দু'বছর ঘুরতে না ঘুরতেই পুলিশ তৎপর হয়ে ওঠে। ফলে ১৯৬৪ সালে ২ সেপ্টেম্বর এগারো জনের বিরুদ্ধে এফ.আই.আর করা হয় – দশ জনের নামে ওয়ারেন্ট বেরোয়। বাস্তবে দু'জনকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। পুলিশি অত্যাচারের ভয়ে অন্যান্য আসামীরা (সমীর, প্রদীপ ছাড়া) মলয় রায়চোধুরীর উপর সব দোষ চাপায়। কোর্টে কেস উঠলে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় মলয়ের পক্ষে কোর্টে সাক্ষ দেন। বিভিন্ন ঘাত-প্রতিবাদের মধ্য দিয়ে হাংরি আন্দোলন এগিয়ে গেলেও ১৯৬৮-র পর এ আন্দোলন তার গতি হারায়। মলয় রায়চৌধুরী কিছুদিনের জন্য সরে যান সাহিত্যজগৎ থেকে।

হাংরি কাব্য আন্দোলন বাংলা কবিতার জগতে বড়োসড়ো সাড়া ফেলেছিল। তৎকালীন বিশৃঙ্খল সমাজ পরিস্থিতিতে, অসহনীয় রাজনৈতিক পরিবেশে এক শ্রেণির শিক্ষিত যুবমানস কোন পথে গিয়েছিল – হাংরি আন্দোলন সেই তথ্যকেই তুলে ধরতে সাহায্য করে।

হাংরি আন্দোলনের বচর তিনেক পরেই বাংলা কবিতার জগতে বড়োসড়ো সাড়া ফেলেছিল। তৎকালীন বিশৃঙ্খল সমাজ-পরিস্থিতিতে, অসহনীয় রাজনৈতিক পরিবেশে এক শ্রেণির শিক্ষিত যুবমানস কোন পথে গিয়েছিল – হাংরি আন্দোলন সেই তথ্যকেই তুলে ধরতে সাহায্য করে।

হাংরি আন্দোলনের বছর তিনেক পরেই বাংলা কবিতার জগতে এক আন্দোলন পরিলক্ষিত হয়। এ আন্দোলনের মুখ্য দিক ছিল কবিতার আঙ্গিকতাকে নিয়ে। শ্রাব্যরূপ ও দৃশ্যরূপ কবিতার এই দুই দিককে নিয়ে শ্রুতি আন্দোলকারীরা তাদের মতো করে নিজস্ব অভিমত ব্যক্ত করতে চাইলেন। শব্দের শ্রাব্যরূপের ক্ষেত্রে তাঁরা আবিষ্কার করলেন শব্দের ধ্বনিত্তনকে, দৃশ্যরূপের ক্ষেত্রে তুলে ধরতে চাইলেন দৃশ্যময়তাকে। তবে কাব্য-সাহিত্যে যে ধ্বনিময়তা ও চিত্রময়তা আছে তা থেকে শ্রুতির এই দুই রূপ পৃথক। যেমন ব্রজবুলি ভাষার ধ্বনিঝংকার বিদ্যাপতি, গোবিন্দদাসের কবিতাকে পরম অনাস্বাদ্য করে তুলেছে। কিন্তু শ্রুতি কবিতায় ধীরে ধীরে মন্ত্রোচ্চারণের মত কবিতা পাঠ করলে শব্দের ধ্বনি রূপ বাঙ্ময় হয়ে ওঠে, মন্ত্রের দ্যোতনা আসে তাতে। বর্ণনার অনুপম ক্ষমতায় কবিতায় যে চিত্ররূপ ফুটে ওঠে, সে রূপ শ্রুতি কবিতার নয় – এ ধরনের কবিতায় শব্দ সাজানোর কৌশলেই গড়ে ওঠে চিত্ররূপ। এ রূপ দৃষ্টগ্রাহ্যও।

শ্রুতি আন্দোলনের সমর্থকরা প্রাচীন অনুশাসন ভেঙে ফেলার কতা বলেছেন। বলেছেন ব্যক্তিগত উপলব্ধি ও অন্তর্মুখী চেতনার কথাও। সে কথা ১৯৬৬-তে ইস্তাহারের জুলাই সংখ্যায় প্রকাশিত হয়। এ তাদের অভিমত ছিল–

(১) কোনো রকম ব্যাখ্যা, বিধান বা তত্ত্ব প্রচারের দায়িত্ব কবিতার নেই।

(২) চিৎকার বা বিবৃতি কোনোটাই কবিতা নয়।

(৩) কবিতা হবে ব্যক্তিগত মগ্ন এবং একান্তই অন্তর্মুখী।

(৪) কবিতা একমুখী বক্তব্য বা একটিমাত্র বিষয়ে আবদ্ধ নয়; তা হবে বহু অনুভবের মিলনে জটিল উপলব্ধির আবহ। এছাড়া আরও বহু অভিমত ছিল, শ্রুতি আন্দোলনকারীদের। সবশেষে অভিমতে বলেছেন তাঁরা — ''চরিত্রের স্থবিরতার চেয়ে ব্যক্তিত্বের পরিবর্তনশীলতাই আমাদের লক্ষ্য''।

শ্রুতি আন্দোলনের সঙ্গে প্রত্যক্ষভাবে জড়িয়ে ছিলেন— মৃণাল বসুচৌধুরী, পুষ্কর দাশগুপ্ত, পরেশ মণ্ডল, অনন্ত দাশ, সজল বন্দ্যোপাধ্যায়, সুকুমার ঘোষ, অশোক চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ।

এরপর বাংলায় যে কবিতা আন্দোলনের জন্ম হল— তা হল কংক্রিট কবিতা আন্দোলন। এই আন্দোলনের সূচনা বিশ শতকে ফ্রান্সের কবি দ্য স্টি জন (১৯২০) বললেন 'শব্দেরা সব মৃত, শব্দেরা বন্ধ্যা'। তাই বর্ণ সজ্জার দিকে ঝোঁক দিলেন তাঁরা। ফরাসি কবি মালার্থে এ আন্দোলনকে গতি দিয়েছেন ১৯৫৩ সালে সুইজারল্যাণ্ডের কবি য়ুজিন গোমরিং প্রথম কংক্রিট কবিতার বই বের করেন 'নক্ষত্রপুঞ্জ'। আর বাংলায় কংক্রিট আন্দোলনের সূচনা হয়েছে অশোক চট্টোপাধ্যায় ও পরেশ মণ্ডলের 'ঈগল' পত্রিকার মাধ্যমে। কংক্রিট কবিতা আন্দোলনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল— (১) ভাষার সংক্ষিপ্ততা, (২) চিত্রধর্মিতা, (৩) ইঙ্গিতময়তা কিন্তু ইন্দ্রিয়গোচরতা, (৪)

সঙ্গীতময়তা। শ্রুতি পর্বে কবিতার মূল উপাদান ছিল শব্দ— নানাভাবে তাকে সজ্জিত করে ধ্বনিরূপ কিংবা দৃশ্যরূপ অথবা উভয়রূপ একত্রে ফুটিয়ে তোলা হত। কংক্রিট কবিতার বিচিত্ররূপে ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা করলেন অনেক কবি। যেমন - টাইপরাইটার কবিতা গ্রাপিক কবিতা কিংবা পোস্টার কবিতা এই জাতীয় কবিতার মধ্যে পড়ে।

সত্তরের দশকে বাংলা কবিতার ক্ষেত্রে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হল আঞ্চলিক ভাষায় রচিত কবিতা। তাছাড়া এ সময়ের কবিতায় এক নতুন সুরের আবির্ভাব ঘটে। সে সুর হল যন্ত্রণার সুর— যন্ত্রণার প্রতিবাদী সুরও বটে। আধুনিক যুগে ইউরোপে Modern Poetry-র বিষয়কে Mathew Arnold বলেছেন Modern Life তিনি বলেছেন—

> ... This strange discase of modern life with its sick. hurry, its divided aims, its heads o' ertaked, its palsied hearts...

এই যন্ত্রণা, সন্দেহ, সমস্যা, আশঙ্কার যুগ পূর্বের দশকগুলিতেও ছিল কিন্তু সত্তর দশকের ক্ষেত্রে কবিতা রচনার পাশাপাশি কবিতা পাঠও একটি বিশেষ যুগ বৈশিষ্ট্য বলা যেতে পারে। মেদিনীপুর, বীরভূম, বাঁকুড়া, পুরুলিয়া প্রভৃতি জেলার অঞ্চলের ভাষায় কবিতা রচিত হয়েছে। আবৃত্তিকারদের কণ্ঠে এ কবিতা দেশ ও বিদেশের কবিতা পাঠকদের তৃপ্ত করেছে। কবিতার জগতে একে কেউ কেউ আবার, উত্তর আধুনিক যুগ বলে চিহ্নিত করতে চেয়েছেন।

সাম্প্রতিক বাংলা কবিতার উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হল— ঐতিহ্যের প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধি, প্রাচীন পুরান ও উপনিষদের কাহিনি ও চরিত্রের পুনর্বিচার, রোমান্টিকতার প্রতি আকর্ষণ, গদ্য কবিতার মোহপাশ থেকে ছিন্ন করে বিচিত্র মিলযুক্ত ছন্দের পরীক্ষা-নিরীক্ষা, দু'একজনের মহাকাব্য রচনার আগ্রহ, আঞ্চলিক ভাষায় কবিতা রচনার প্রয়াস ওসিদ্ধি প্রভৃতি। এই দশকে পূর্ববর্তী সময়ের কবিতার ধ্যান-ধারণা নিয়ে হাজির হয়েছেন বহু কবি।

এই দশকের ক্ষেত্রে আরও একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল কবির সংখ্যা আকস্মিকভাবে দ্রুত বৃদ্ধি পেয়েছে। এ প্রসঙ্গে কয়েকটি কারণকে অবশ্যই উল্লেখ করা যেতে পারে—প্রথমত; কাব্যগ্রন্থ প্রকাশে সরকারি অনুদান প্রাপ্তি, দ্বিতীয়ত, বহু লিটল ম্যাগাজিন কর্তৃক স্বল্পব্যয়ে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের উদ্যোগ। তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কয়েকটি প্রকাশক সংখ্যা কর্তৃক কবিরা নিজব্যয়ে কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের ব্যবস্থা করার লাভজনক উদ্যোগ চতুর্থত কোনো এক বিখ্যাত প্রকাশন সংস্থার উদ্যোগে একদিনে একশ কবির একশটি কাব্যগ্রন্থ প্রকাশের মতো হুজুগে আয়োজন। পঞ্চমত, উৎকৃষ্ট কবিতার সংখ্যার নিরিখে নয়, অনেকে আজকাল কাব্যসংখ্যার হিসেবে কবির কবিতার উৎকর্ষ বিচার করে থাকেন। তাই কবিতা লিখতে শেখার সাথে সাথেই এখনকার কবিরা কাব্য প্রকাশের জন্য তাঁদের সর্বস্ব পণ করে বসেন। ফলে বহু অকাব্য বর্তমানে বাংলা কবিতার জগতে আবির্ভূত হয়েছে। বলা ভালো আজও হচ্ছে। এসব যুগগত কবিবৈশিষ্ট্য নিয়ে সপ্তদশ শতক আমাদের সামনে হাজির হয়েছে। আমরা এই সময়ের বেশকিছু কবিদের নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করব—

চিত্রপরিচালক বুদ্ধদেব দাশগুপ্ত বিশ শতকের সত্তরের দশকের কবি হিসেবে পরিচিতি লাভ করেন। সময় সচেতনতার পাশাপাশি বুদ্ধিমত্তার ছাপও রয়েছে কবির বুদ্ধিমত্তার ছাপ পাই 'ছায়া ছায়া' কবিতায়—

পৃথিবীতে আছ অনেক রকমের ছায়া।
অনেক কিছু করতে হয় তাদের। ছুটতে হয়,
ঘুরতে হয় ছায়ার পিছনে।

ছায়ার মধ্য দিয়েই কবি জীবনের চিরন্তন সত্যকে উপলব্ধি করেছেন ঠিক এভাবে—

আসে এক একদিন
ছায়ারা ভুলে যেতে চায় তারা কারোর ছায়া নয়,
কারোর অধীন নয়, এমনকি ছায়া নয় আর ...

পেশায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের স্বাস্থ্য দপ্তরের সমাজকল্যাণ আধিকারিক হলেও কবিতা রচনায় কবি অশোক রায়চৌধুরী কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখেছেন। তার লেখা কাব্যগ্রন্থগুলি হল— জল দাও আমার শিকড়ে (১৯৭১), অন্তর্গত নদী (১৯৭৮), ধারাবিবরণী (১৯৮০), প্রথম নিবেদন (১৯৮৮), 'আবৃত্তির কবিতা, কবিতা আবৃত্তির', ফিরে যাও নিজস্ব নির্জনে, প্রেম আছে প্রেম নাই (১৯৯৮) ইত্যাদি।

তাঁর কবিতায় আছে বর্ণনাধর্মিতা, সাবলীলতা এবং গদ্যছন্দে অনায়াস দক্ষতা যেমন, তাঁর দিনলিপি কবিতাটি—

আমি এক টাইম মেশিন
সত্যি মিথ্যা, মিথ্যা সত্যির জীবন্ত অভিনয়;
জীবনের শাশ্বত সময়।

১৯৪৬ খ্রিস্টাব্দের ১২ এপ্রিল কোলকাতায় জন্ম হয় কবি দেবারতি মিত্রের। ব্যক্তিগত অনুভূতি প্রকাশেই দেবারতির কাব্যপ্রয়াস নিয়ন্ত্রিত। নিসর্গ, সমাজ এবং প্রিয়জনেরা তাঁর কবিতায় ভিড় করেছে এসেছে। কবি নিঃসন্দেহে রোমান্টিক, 'অন্ধ স্কুলে ঘন্টা কাজে'র কবিতাতেই সে পরিচয় মেলে—

রাত্রের নিসর্গ ডাকে অন্ধ সাড়াহীন গাছপালা
নোনা জলে টরে টক্কা টরে টক্কা,
এ কোন পাকির হাহাকার।

উত্তরবঙ্গের কবি রণজিৎ দেবের কবিতায় বারবার এসেছে পারিপার্শ্বিক ভৌগলিক পরিবেশ। পাহাড়, নদী, অরণ্যে ঘেরা পরিবেশ কবির অনুভবের গভীর ছোঁয়ায় মাঝে মাঝে বদলে গিয়েছে। মানুষের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রয়াসী কবি লিখেছেন—

উত্তাল মানুষের চাপ
যে - দিকেই বাড়ুক,
সে তো মানুষেরই অধিকার
পৃথিবীটা কারও একার নয়।

রণজিৎ দেবের উল্লেখযোগ্য কাব্যগ্রন্থ হল—হেমন্তের সকাল (১৯৭০), শাখা-প্রশাখা শেকড়গুচ্ছ (১৯৭৩), এক সারি বালি হাঁস (১৯৮১), অঝোরে বৃষ্টিপাত (১৯৮৬) প্রভৃতি।

সত্তরের কবি অমিতাভ গুপ্ত পেশায় অধ্যাপক হলেও রোমান্টিক মনোভাব ও ব্যক্তিগত অনুভূতির প্রকাশে কবিতায় স্বাতন্ত্র্য আনতে পেরেছেন। মার্কসীয় দর্শনে বিশ্বাসী কবি রাজনীতির কথাও নিজের মতো করে বলেছেন কবিতায়, সাম্যবাদী চিন্তা তাঁকে জগৎ ও জীবনের দ্বন্দ্বময় শাশ্বত রূপ আঁকতে সাহায্য করেছে। আর এই অঙ্কনের ক্ষেত্রে পরিমিতিবোধ ও রূপক প্রতীকের ব্যবহার লক্ষণীয়। আলো (১৯৭০), এসো আমার ঘরে (১৯৭৭), এক বছরের সামান্য কবিতা (১৯৮১), ঝরা মানুষের কবিতা (১৯৮২), অন্ন চাই বস্ত্র চাই (১৯৯৭), একটি ভোরবেলা (২০০১) প্রভৃতি।

অমিতাভ চক্রবর্তী বিশ শতকের সত্তরের অন্যতম কবি ব্যক্তিত্ব। তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলি হল সূর্য-রক্ত-পদচিহ্ন (১৯৭২), আমার মধ্যে আমি ইত্যাদি। এই সময়ের অন্য এক কবি হলেন অজিত বাইরী। ঐতিহ্যকে স্বীকার করে নিয়ে মৌলিক সৃষ্টির ক্ষেত্রে যিনি দৃঢ় প্রত্যয়শীল সেই কবি অজিত বাইরীও কবি হিসেবে তাঁর সুনাম অক্ষুণ্ণ রেখেছেন। অনুভবের গভীরতায়, স্বদেশচেতনা ও সমাজচেতনাত নিরিখে তাঁর কবিতাগুলি শিল্পরসোত্তীর্ণ। প্রেমের আশা-আকাঙ্ক্ষা ব্যর্থ্যতা, নৈরাশ্য এই দুই-ই তাঁর কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে।

প্রশ্ন কবিতায় প্রকাশিত হয়েছে এক প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। যেমন- নৈঃশব্দ, সম্মোহন এবং বিষদ (১৯৭১), অবেলার রোদ্দুরে তোমার মুখ (১৯৭৫), বনসাই বনসাই (১৯৯১), আগুনের চাদর (১৯৯৭), মেঘলা দিনের আলো (২০০২)।

পার্থপ্রতিম কাঞ্জিলাল বাস্তব যুক্তিবাদী কবি হিসেবে সত্তর দশকে আবির্ভূত হয়েছিলেন। সমকালীন স্খলন, পতন তির্যকভাবে শ্লেষের সুরের তিনি উপস্থাপিত করেছেন। গোপন কবিতায় বাস্তব জীবনের ছবি সুন্দর চিত্রকল্পের মাধ্যমে ব্যক্ত হয়েছে এভাবে—

...চুলগালো
দুর্গন্ধ হলেও, মেয়েটি মেয়েই ছিল। (শোক)

এই শতকের অন্যতম অধ্যাপক কবি হলেন —কবি বীতশোক ভট্টাচার্য। তাঁর কবিতা মননশীলতার ছোঁয়ায় ও হৃদয়ের উত্তাপে সমৃদ্ধ। প্রেমের কবিতা রচনায় বীতশোকের কৃতিত্ব উল্লেখযোগ্য কৃত্তিবাস পত্রিকায় তাঁর প্রেমের কবিতা 'শরীর' প্রকাশিত হয়েছিল ১৩৮২ বঙ্গাব্দে। কবিতাটি ঠিক এরকম—

লোহার পলঙ্কে কেন সারারাত, রক্তে এসো,
মাংসময়ী এসো;
ঈষৎ সন্ত্রস্ত হয়ে উঠে এসো নৌকাসম
ঢেউয়ের দু'হাতে!

কবি দেহীপ্রেমের স্বরূপ অঙ্কন করেন অসাধারণ চিত্রকল্পের সাহায্যে—

লালা ও পরাগে মাখা দুটি ঠোঁট,
ফুল ফুল, মোম ও মৌমাছি—
তোমার ছ'কোণ

কবিতার আঙ্গিকতায় কবি মুন্সিয়ানার ছাপ রেখেছেন। কবিতার সৌষ্ঠবে যে গদ্যধর্মীতাকে জীবন্ত করে তোলা যায় তাও কবি দেখিয়েছেন তাঁর কবিতায়—

সত্তরের দশকের কবি রণজিৎ দাশ প্রেমের অনুভবে তিনি জীবনানন্দের অনুসারী। শুধু দেহবাদী ভাবনা নয়, অনুভূতির তীক্ষ্ণতায় তার কবিতায় প্রেমের স্বরূপ চিত্রিত হয়েছে। প্রকৃতির অনুষঙ্গে, জীবনের পূর্ণতায় দিককে অনুসন্ধান করেছেন কবি। তাই আশীর্বাদ কবিতায় কবি অনায়াসেই বলতে পারেন—

আশীর্বাদ কবি আজ, পৃথিবীর মানুষেরা,
তোমাদের সব্জির বাজার যেন সবুজ পালং
শাকে ভরে ওঠে

জীবনের চলার পথে কবি অতি তুচ্ছ ক্ষুদ্রের মধ্যেও আপন সত্তাকে খুঁজেছেন। ক্রোধ কবিতায় কবির সে মনোভাবের প্রকাশ ঘটেছে—

একটি সরু অন্ধকার গলি, মনে হয়,
আমার ঘরের ভিতর দিয়ে,
চলে গেছে। যেন সে জন্যেই ঘরটা সবসময়
একটু আগোছালো...

জিৎ দাশের প্রেমের কবিতায় এসেছে শরীর এসেছে অপূর্ব কল্পনা। তাই কল্পনাধর্মীতার গুণে দেহী প্রেমের একটি পূর্ণাঙ্গ, বাস্তব রূপে আমাদের সামনে প্রতিফলিত হয়েছে।

রতনতনু খাটি এই সময়ের খ্যাতিমান কবি। রোমান্টিক কবি হলেও তিনি সমাজ সচেতন বটে। তাই মানুষ সময় ও দেশ-এর প্রতি বরাবরই দায়বদ্ধ থেকেছেন। প্রেমের কবিতাতে রতনতনু খাটিও যথেষ্ট সাফল্য পেয়েছেন। ঠিক কবিতাটি এপ্রসঙ্গে উদ্ধৃত করা যেতে পারে—

সেই সব ধ্রুব মেঘেদের দেখা গেল বলে,
আমি; যেসব মেঘেরা কাল মেঘাক্রান্ত মেয়েদের
হোস্টেলের খুব কাছে ছিল—

তাঁর কবিরা চিত্রময়তা নাটকীয়তায় পূর্ণ। প্রাকৃতিক দৃশ্য দিয়ে চিত্রকল্পগুলিও প্রশংসার দাবি রাখে।

পশ্চিমবঙ্গের প্রায় সব জেলাতেই ছড়িয়ে-ছিটিয়ে আছে বহু কবি। তাদের কেউ খ্যাতিপ্রাপ্ত আবার কেউ বা লোকচক্ষুর আড়ালে চলে গেছেন। আবার এদের মধ্যে কেউবা নির্জনতাপ্রিয়ও বটে। পুরুলিয়ার কবি নির্মল হালদার অনুভবময়তায়, নির্জন একাকীত্বের প্রকাশে পাঠক হৃদয় জয় করে নিয়েছেন। সত্তরের কবি নির্মল হালদারের কবিতায় রয়েছে গ্রামীন জীবন সহজ-সরল আন্তরিকতা ও স্বতঃস্ফূর্ততা যা সাধারণ হয়েও ব্যঞ্জনাময়। তৎার কবিতার আবেদন অত্যন্ত সহজ, সরল অনুভূতিময়—

তুমি আমার চোখের নিচে কালি হয়ে আছো
লোকে বলে কলঙ্ক। কলঙ্ক হোক।
এই কলঙ্ক নিয়ে আমি জেগে উঠেছি।

বাংলা কবিতার জগতে অন্যতম খ্যাতিমান কবি শামসুর রহমান। শামসুর রহমানের 'হাড়' প্রভৃতি কাব্যে কবির সমাজ সচেতনতা, পরিবেশ সচেতনতা কিংবা ইতিহাস চেতনার প্রকাশ পায়। বয়সের হাত ধরে কবির অভিজ্ঞতারও বয়স বেড়েছে। তিনি অনুভব করেছেন পৃথিবীকে। তিনি বলেছেন—

... প্রাগৈতিহাসিক
পানি প্রত্যুষের
গাল বেয়ে নামে আর গাছের সবুজ
চোখ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব দুঃখীর অশ্রুর মতোই
টপ টপ করে পড়ে শিশিরের জল।

এই সময়ের অন্যতম এক সময়-সমাজ সচেতন কবি হলেন অজিত বাইরি। প্রেম, কামনা, ব্যর্থতা, নিঃসঙ্গতাপ্রায় জনিত স্মৃতিকে আঁকড়ে থাকার প্রবণতা কবি আহতের কবিমানসকে গ্রাস করেছে অনেক বেশি। ব্যক্তিগত অনুভবে ঋদ্ধ তাঁর কবিতাগুলির বিষয় পাঠকের হৃদয়কে ছুঁয়ে গেছে। দেশবন্দনায় কবি অনুভব করেছেন ক্ষুধাময় দেশের কথা। এখানেই কবির স্বাতন্ত্র্য। তাঁর 'বোবা' কবিতাটি ঠিক এরকম—

ক্ষিধের চাবুক, খেতে খেতে ভারতবর্ষ
বোবা যুবকের দুচোখ দ্যাখো, চোখ
ঘোলা জল, বোকা ক্ষোভ।

বিশ শতকের সত্তরের দশকের এক বলিষ্ঠ কবি হলেন কবি জয় গোস্বামী। প্রথাগত শিক্ষায় শিক্ষিত না হয়ে, দারিদ্রতার সঙ্গে আপোষহীন সংগ্রাম চালিয়ে কবিতাকেই জীবনের সঙ্গী হিসেবে বেছে নিয়েছেন তিনি হলেন কবি জয় গোস্বামী। কবির জনপ্রিয়তার কারণ তাঁর বিষয়বস্তু

নির্বাচনে এবং প্রকাশের সহজ-সরল স্বাভাবিক গতিতে। বিশেষ করে তাঁর কবিতায় এসেছে দৈনন্দিন জীবনের জলছবি। আঙ্গিক সচেতন কবি ছন্দ নিয়েও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করেছেন।

দেশ পত্রিকার কর্মী হিসেবে কর্মজিবন শুরু করেন। কবিতার জগতে তিনি আনন্দ পুরস্কার পান— 'ঘুমেয়েছো ঝাউলতা'। বাংলা আকাদেমি পুরস্কার প্রাপ্ত কবির প্রথম জীবন কাটে নদীয়ার রাণাঘাটে।

জয় গোস্বামীর কবিতায় আছে গল্পরস ও নাটকীয়তা। আছে রূকথার স্বপ্নিল মায়াময় জগৎ—যা পাঠককে কোনো এক কল্পলোকে নিয়ে যায়। 'আজ কলিকার জন্য রূপকথা' কবিতায় কবির অনুভূতির স্তর পরম্পরা আমরা প্রত্যক্ষ করি।

প্রেমের কবিতাতেও কবি স্বতন্ত্র। কবি চিরাচরিত রীতিতে প্রেম পেতে চান না বরং উপলব্ধির জগতে তাকে অনুভব করতে চান। 'প্রেম, তার কবিকে' কবিতায় তাই লিখেছেন—

হাতছানি দিই নি, ইশারা করি নি, কোথায়
ও দাঁড়াতে বলি নি
জল থেকে উঠে কখনো, কখনো সামনের
সিট থেকে চেনা দিয়ে গেছি।

জয় গোস্বামীর কবিতা পরবর্তী দু'দশকের কবিদেরও অনুপ্রাণিত করেছে। এখানেই কবির অনন্যতা নিহিত আছে। বৃহৎ বনস্পতির মতো শাখা বিস্তার করে কবিতার জগৎকে ছায়া দান করেছেন তিনি। তাঁর কলম আজ থেমে নেই। শুধু তাই'ই নয়, তাঁর কবিতা পাঠককে নিয়ে যায় অলৌকিক রসের জগতে।

আমাদের আলোচ্য বিষয় তো ছিল সত্তরের দশকের অন্যান্য কবিদের পাশে কবি কৃষ্ণা বসুকে স্বাতন্ত্র্য দান করা। আসলে বিষয়টি তা নয়, তিনি মহিলা কবি বলে নয়, তিনি মেয়েদের জন্য বলেছেন, বলার জন্য সারল্যে, দৃপ্ততায় প্রতিবাদে মুখর হয়েছেন। এই দশকেও কমবেশি মহিলা কবি তো আছেনই তবে তারা এতো দৃপ্তময় নয়। নিজের দাবিতে বজ্রকণ্ঠ নয়। আমার আমিকে চিনিয়ে দিতেও আরাক আমিকে দরকার হয় বৈকি। কবি কৃষ্ণা বসু সেই সত্তা— যার আমিত্ববোধ প্রতিটি মেয়ের মনের দরজাতে কড়া নেড়েছে। বলেছে ওঠো, জাগো, অধ্যাপক কবি, কবি কৃষ্ণা বসু একজন প্রতিভাবান কবি তো বটেই সেই সঙ্গে তিনি সমকালের যন্ত্রণাকে মুগ্ধতা ও অনুভবের মাধ্যমে মেলে ধরে তার মধ্যে সৌন্দর্যের ও আনন্দের সন্ধান করতে চেয়েছেন। তাঁর কবিতায় ঈর্ষা, দ্বন্দ্ব, অতৃপ্তি, বিষাদের কথা থাকলেও শেষ পর্যন্ত তা হয়ে উঠেছে রসোত্তীর্ণ কবিতা।

নিজ স্বাতন্ত্র্য প্রকাশে সমর্থ কবি — কবি কৃষ্ণা বসু (জন্ম ১৯৪৭)-র প্রথম কাব্য প্রকাশিত হয়েছে ১৯৭৬-এ। তিনি সত্তরের দশকের কবি বলে চিহ্নিত হলেও ছয়ের দশকেই তার মধ্যে কবি চেতনার উন্মেষ ঘটে। সত্তরের দশকের দিকে যদি আমরা ফিরে যাই, তাহলে দেখব— এই দশকে পশ্চিমবঙ্গে রাজনৈতিক অস্থিরতা চরম পর্যায়ে পৌঁছেছিল। পুলিশি অত্যাচার অব্যাহত।

নকশাল আন্দোলনের তীব্র রূপ, রাষ্ট্রপতি শাসন জারি ও দ্বিতীয় যুক্তফ্রন্ট সরকারের পতন ইত্যাদি। এই দশকেরই ৭৭ সালে বামফ্রন্ট সরকারের ক্ষমতায় আসেন। পুলিশের নির্মম দমননীতিতে নকশাল পন্থীরা বিপর্যস্ত হন এবং পশ্চিমবঙ্গে ভয়াবহ বন্যা এবং এই দশকের শেষের দিকে নকশাল আন্দোলন ক্রমশ স্তব্ধ হতে থাকে। রাজনৈতিক টানাপোড়েন, অর্থনৈতিক নিরাপত্তাহীনতা আর সামাজিক অস্থিরতায় জনজীবন হয়েছে বিপন্ন। সমকালীন ভাবনায় ভাবিত অন্যান্য কবিদের পাশাপাশি কবি কৃষ্ণা বসু খুঁজে পেলেন নিজস্ব সত্তা এবং তা অবশ্যই নারীবাদী ভাবনা-চিন্তার অঙ্গনে। এক ভালোলাগার অদম্য অনুভূতি কবিকে করেছিল অভিভূতভাব আর তারই অভিঘাতে উৎসারিত হয়েছে কবির কাব্য জগত। মেয়েদের দেখেছেন গভীর সহমর্মীতায়। তাই কবি অবলীলায় বলতে পারেন—

একটু সরে এসে
জীবন নামের কঠিন রাজ্যে দাঁড়াও হেসে।

তাঁর প্রকাশিত কাব্যগ্রন্থগুলির মধ্যে অন্যতম যথা শব্দের শরীর (১৯৭৬), জলের সারল্যে (১৯৮২), কার্ডিগানে কুসুম প্রস্তাব (১৯৭৬) নার্গিসাস ফুটে আছে, একা ও খোলা পাতা, সাহসিনী কে রয়েছ সাজো, ছন্দ ও গদ্য ভরা কবিতার ডালি ইত্যাদি কাব্য কবিতায় কবির সমাজ সচেতনতা এবং সময় সচেতনতার পরিচয় মেলে। মিথ্যে বা মেকি বিষয়ের প্রতি কবির আছে সদা সংগ্রাম, কোনো আপোষ নেই সেখানে। অথচ কবির কী-ই করার থাকে, বিস্ময় অনুযোগ, প্রশ্ন করা ছাড়া। প্রশ্ন চিহ্ন কবির জিজ্ঞাসা—

এবং দরজা খুলে বেরোলেই সেই মিথ্যাগুলি
আমাদের সব সত্য মুহূর্তগুলিকে খেয়ে ফেলে

বিবাহিত জীবনে মেয়েরা যে কত অসুখী—তার একটি চালচিত্র এঁকেছেন 'একটি সামান্য চিঠি' কবিতায়—

তুমিও আশ্রিত জানি দাদার সংসারে
জুতিয়ে বেঁকিয়ে দেব মুখ, বলে তোমার জামাই
না, মা সত্যি জুতো মারেনি, এখনও তবে,
মারবে বলেছে কোনওদিন।

রবীন্দ্রনাথ নারী সম্বন্ধে যতই বলুক (যদিও সেটা তাঁর ব্যক্তিগত অনুভব) 'অর্ধেক রমণী তুমি অর্ধেক কল্পনা'—প্রকৃত ছবিটি তা নয়। দেবী দুর্গার মতো দশ হাতে সেবা করলেও সংসারে তার স্থান অতি নগণ্য। বংশ পরম্পরায় এরকম চলে আসছে—

তোমার গর্ভের থেকে জন্ম যার
সে কন্যা ও দাসী হবে জন্ম জন্ম দাসী
স্বদেশেই ঘর তবু জন্ম বারবাসী

(অন্তহীন / সাহসিনী কে রয়েছ সাজো)

আসলে কবি কৃষ্ণা বসু সমস্ত নারীর হয়েই যেন কলম ধরেছেন। সমস্ত মেয়ের হয়েই বলতে এসেছেন। হাজার বছর ধরে যেসব মেয়েরা মার খেয়ে মুখ বুজে সহ্য করে গিয়েছে, তাদের কথা বলতে এসেছেন। সেই কবেকার—

... সেই কবেকার মেয়েদের কান্নারক্ত ঘাম
এই কলমে ভরেছি,— বলতে এসেছি।

(সমস্ত মেয়ের হয়ে বলতে এসেছি / শ্রেষ্ঠ কবিতা)

অতীতচারিতা সত্তরের কবিদের একটি অন্যতম বৈশিষ্ট্য। কৃষ্ণা বসু এবিষয়ে ব্যতিক্রমী নন, তাঁর চোখে ধরা পড়েছে মধ্যযুগীয় নারী রাধার দুর্দশার কথা। ভগবান কৃষ্ণের প্রেমশক্তির আধার রাধা, সেই নারীকেও হতে হয়েছে নিপীড়নের শিকার। রাধা ভালোবাসায় উজাড় করে দিয়েছেন নিজেকে, পুরুষ কৃষ্ণকে প্রতারক হিসেবে মেলে ধরতেও পিছপা হন্‌নি আধুনিক কবি। তাই অতি সহজেই বলে উঠতে পারেন—

... ভুল নায়কের জন্য তোর সত্য কান্না, সত্যকার চূড়ান্ত আরো রয়ে গেছে আজো।
তোলে আর কেউ খুঁজে পাইনি রাধিকা, তোর জন্য কষ্ট হয়; তোর জন্য মায়া; ...

কবি কৃষ্ণা বসুর কবিতা বিষয়-ভারাক্রান্ত মোটেও নয়, কবিতার আঙ্গিকতার দিকেও আছে কবির সচেতন দৃষ্টি। অক্ষরবৃত্ত, মাত্রাবৃত্ত, স্বরবৃত্ত ও গদ্যছন্দে—সব রকমভাবেই বাংলা কবিতা লেখা হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। আর কবি কৃষ্ণা বসু যে ছন্দের সকল দিকেই সিদ্ধহস্ত নারী তার প্রমাণ মেলে ছন্দ ও গদ্য ভরা কবিতার ডালি বইটি। দু'একটা উদাহরণ দিলেই একথার সত্যতা প্রমাণিত হয়—

জীবন জোড়া উপবাসে দাঁড়িয়েছি ঠায়,
প্রিয় বৃষ্টি হঠাৎ এলে একলা জানলায়

কিছু কবিতা আছে, যেখানে ছন্দবন্ধনে কবি বিষয়কে অনবদ্য করে হাজির করেছেন পাঠকের সামনে—

নিজের মাপের থেকে ছোট হয়ে যাও,
করুণার যোগ্য তুমি করুণা বিলাও !

আধুনিক বাংলা কাব্যজগতে কবি কৃষ্ণা বসুর জীবন ও সাহিত্য নিয়ে বেশ কিছু পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি হয়েছে। সত্তর দশকের নানান ঘটনা তা সে পারিবারিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক যাই'ই হোক না কেন, তা কবি কৃষ্ণা বসুর কবিতায় পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে ফুটে উঠেছে। আরও অন্যান্য অনেক কবি (সত্তরের দশকের)-ই নারী সচেতনতার ছাপ রাখতে চেষ্টা করেছেন তাদের রচনাতে, কিন্তু কৃষ্ণা বসুর মতো বৃহৎ পরিসরে কেউ মেয়েদের কথা ইতিপূর্বে কেউ ভাবেনি। অথচ বিষয়টি শুধুমাত্র সাহিত্যিক দিক থেকেই নয়, সমাজতান্ত্রিক দিক থেকেও গুরুত্বপূর্ণ। মেয়েদের শিরদাঁড়া সোজা করে মাথা উঁচু করে বাঁচতে চাওয়ার কথা শোনান কবি। তাই অতি সহজেই কবি বলতে পারেন—

দশ হাতে, দশ প্রহরেণ নিয়ে,
সিংহবিক্রমের উপর পা-দুখানি রেখে
দাঁড়া দেখি মেয়ে। (দেবীস্তোত্র)

নারীযন্ত্রণায় ভাবিত কবি মানেই তো তিনি সমাজ বিচ্যুত কোনো কল্পলোকের বাসিন্দা নয়। কৃষ্ণা বসু সমাজসচেতন কতটা, তার প্রমাণস্বরূপ অন্নব্রহ্ম কবিতাটির দু'এক লাইন তুলে ধরা যেতেই পারে—

সাদা ভাত, যুঁই ফুল সাদা ভাত, ঘরে ঘরে—
ফুটে ওঠো ঝাঁ ঝাঁ
খিদের সময়...
আহা ভাত, আহা
লক্ষ্মী, কে তোমাকে অস্থির চঞ্চলা বলে?
শিশুর হাসির মতো
ঘরে ঘরে হেসে ওঠো মাটির সানকিতে
আর এনামেল পাত্র
এতো জুড়ে...।

দরদী মনের এতো সুকোমল পরিচয় আমরা বড়ো কমই পাই।

সময়ের হাত সময় বয়ে চলে। বয়ে চলে সাহিত্য জগৎ। কবিতাও সাবলীল গতিতে এগিয়ে চলছে। নানান পরিবেশ পরিস্থিতিতে কবিতা তার আপন সত্ত্বাটিকে টিকিয়ে রেখেছে, তাকে নিয়ে নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা করে চলেছে নানান কারিগর। কাব্যসাধকগণ কবিতার বিষয়বস্তুর পাশাপাশি তার আঙ্গিকসজ্জাতেও বেশ মনোযোগী হয়েছেন। প্রত্যন্ত গ্রামে দেখা মেলে কবিতার আসর। লিটিল ম্যাগাজিনের সম্ভার কিংবা লিটিল ম্যাগাজিন মেলাও। সময়ের সাথে তাল মিলিয়ে চলতে গিয়ে কবিয়া তার বাহ্যিক রূপটাকে বদলে দিয়েছে মাত্র; নিজে সে এমন কিছু বদলে যায়নি আজও। তাকে নিয়ে চলছে আজও নানান পরীক্ষা-নিরীক্ষা। আছে নানান টানাপোড়েন। কবিতার স্থায়ীত্ব? — সেতো কাল উত্তর দেবে।

স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা সাহিত্য : নাগরিক ও গ্রাম্য মানসিকতার দ্বন্দ্ব

তাপস কুমার সরদার*

সভ্যতার ক্রমাগ্রগতির সাথে সাথে নাগরিক জীবনও নিকটে আসে। যদিও গ্রামজীবনের একেবারে অবলুপ্তি ঘটে না। নগর জীবনে ধীরে ধীরে গ্রাম জীবনের অভ্যন্তরে প্রবেশ করে। যন্ত্র-সভ্যতার উন্নতি, বিশ্বায়নের প্রভাবে নাগরিক জীবন ক্রমশ গ্রাম জীবনকে ভাঙতে ভাঙতে এগিয়ে আসে। শহরের বিলাসবহুলতা, অধিকতর স্বাচ্ছন্দ্যের উপকরণ, প্রমোদ উপকরণের অতিরিক্ত সুবিধা, ভোগবহুলতা গ্রামের মানুষকে আকৃষ্ট করে। শহরের প্রতি আকৃষ্টতায় শহরের জনবসতি বৃদ্ধি পায়। শহরের আয়তনও ক্রমশ বাড়তে থাকে। গড়ে ওঠে শহরতলি। শহরের সুযোগ-সুবিধাও সেখানে প্রাগ্রসরতা পায়।

শহর জীবন ও গ্রাম জীবনের মূলগত দিকের মধ্যে কিছু পার্থক্য বিদ্যমান।[১] মূল আলোচনার পূর্বে সেগুলি দেখে নেওয়া যায়—

ক. শহর জীবন অনেক বেশি ব্যক্তিকেন্দ্রিক, এখানে ব্যক্তিস্বার্থ প্রাধান্য পায়। সে তুলনায় গ্রাম সমষ্টিকেন্দ্রিক।

খ. শহর জীবন ব্যক্তিমুখী ও বিচ্ছিন্নতাপ্রবণ। গ্রামজীবন অনেকটা গোষ্ঠির মতো এবং পারস্পরিক সম্পর্ক অনেক বেশি নিবিড়।

গ. শহরে বিশেষজ্ঞ ও বিশেষ কর্মকৌশলে দক্ষ মানুষের সমাদর থাকলেও গ্রামের ক্ষেত্রে তা বিরল।

ঘ. শহর জীবনে পারিবারিক সম্পর্কে শিথিলতা থাকলেও গ্রামে পারিবারিক সম্পর্ক অনেক বেশি সুদৃঢ় হয়।

ঙ. শহর জনারণ্য ও কোলাহলে পরিপূর্ণ। গ্রাম সম্পূর্ণ বিপরীত জীবনের আস্বাদ দান করে।

গ্রাম জীবন ও শহর জীবনের মধ্যে পার্থক্য থাকলেও তাদের পারস্পরিক সম্পর্ককে অস্বীকার করা যায় না। গ্রামের মানুষ অনেক সময় জীবিকার প্রয়োজনে শহরের ওপর নির্ভরশীল। গ্রামের কৃষিজাত সামগ্রীর বাজার মূলত শহর। তাছাড়া গ্রামে বিদ্যুতায়ন, সড়ক ও যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নতি, স্বাস্থ্য ও শিক্ষার উন্নতির মাধ্যমে গ্রামেও নগর জীবনের সুযোগ-সুবিধা প্রদানের চেষ্টা চলেছে।

---

* গবেষক, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়।

বিশ শতকের সূচনালগ্ন থেকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক ব্যবস্থার মাধ্যমে সচেতনভাবে গ্রাম ও নগরের দূরত্ব কমানোর চেষ্টা স্বাভাবিকত্ব অনেকাংশে বজায় ছিল। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের কাল থেকে সরল জীবনযাপন ও কৃষিনির্ভর গ্রামজীবনে চরম আঘাত নেমে আসে। তেতাল্লিশের দুর্ভিক্ষ-মন্বন্তরের করাল গ্রাস গ্রামজীবনকে আচ্ছাদিত করে। গ্রাম জীবনে নেমে আসে চরম অভাব, অনটন, অবক্ষয়। গ্রামকে চুম্বকের ন্যায় শহর আকর্ষণ করতে থাকে। স্বাধীনতা পরবর্তীকালে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ (১৯৫১ খ্রিঃ), প্রথম সাধারণ নির্বাচন, গ্রামের ভূমি সংস্কারের চিন্তাভাবনা, জমিদারী প্রথার উচ্ছেদ (১৯৫৪ খ্রিঃ) বিল গ্রহণের মাধ্যমে গ্রাম জীবনে স্পষ্ট পরিবর্তনের অধ্যায় সূচিত হয়। আবার ১৯৫৬ খ্রিঃ পরবর্তীতে প্রত্যক্ষভাবে শিল্পায়নের শুরু হয়। এককথায় ১৯৬৫ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে পল্লীজীবনে পরিবর্তন দেখা দেয়।

সাহিত্য সমাজের দর্পণ। সমাজ ও ব্যক্তিজীবনে ভাঙা-গড়া, সমস্যার উদ্ভব ঘটে, সাহিত্যিকের মননশীলতায় তা ধরা পড়ে এবং সাহিত্যে রূপায়িত হয়। তিনের দশকে বাংলা সাহিত্যে গ্রাম জীবনের প্রতি স্বতঃস্ফূর্ত আকর্ষণ লক্ষ করা যায়। পাশাপাশি নাগরিক বৃত্তির রূপায়নও ঘটে। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তথা স্বাধীনতার পরে বাংলা সাহিত্যে গ্রাম জীবন এসেছে নতুনভাবে। শহর থেকে অনেক দূরে অবস্থিত এমন কিছু গ্রাম, যেগুলি শহরের উপকণ্ঠে অবস্থিত, যেখানে গ্রাম ও শহরের মিশ্ররূপ দেখা যায়। এখানে আছে দ্বন্দ্ব, পুরাতন থেকে নতুনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার দ্বন্দ্ব। গ্রামের রক্ষণশীলতা, শহরের প্রসার—দু'য়ের সংঘাত নতুন আকর্ষণরূপে দেখা দেয় সাহিত্যিকদের মধ্যে। আমরা পরবর্তী আলোচনার মধ্য দিয়ে বাংলা কথা সাহিত্যে নাগরিক জীবন ও গ্রামীণ জীবনের সম্পর্ক কীভাবে রূপায়িত হয়েছে, তা দেখতে সচেষ্ট হব। আলোচনার সুবিধার্থে দুটি পর্যায়ে সামগ্রিক আলোচনা বিন্যস্ত করা হল :

প্রথম পর্যায় : বাংলা উপন্যাস সাহিত্য
দ্বিতীয় পর্যায় : বাংলা ছোটগল্প।

প্রথম পর্যায়

স্বাধীনতার সমসাময়িক কাল : উপন্যাসে গ্রাম পতনের শব্দ ।।

স্বাধীনতার সমসাময়িক আর্থ-সামাজিক কঠিন প্রতিবেশে শহরের ডেকে-আনা অভিশাপের ছায়ায় গ্রামজীবন তার বহুযুগ প্রবাহিত স্রোত থেকে ধীরে ধীরে অন্য দিকে মোড় নিয়েছে, তারই প্রতিফলন ঘটেছে বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'অশনি সংকেত' (১৯৪৬), মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' (১৯৪৭), শহরবাসের ইতিকথা (১৯৪৭), সুমননাথ ঘোষের 'সর্বংসহা' (১৯৪৬) উপন্যাসে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ, পোড়ামাটির নীতি, মন্বন্তরের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায় 'অশনি সংকেত' উপন্যাসে গ্রাম বাংলার দুর্ভিক্ষতাড়িত জীবনের চিত্র তুলে ধরেছেন। গ্রামের নাম নতুন গাঁ; একটি ব্রাহ্মণ পরিবার, বাকি সব কাপালী ও গোয়ালার বাস। মন্বন্তরের গা ছমছমে পরিবেশই উপন্যাসের প্রেক্ষাপট। নায়ক, গদাচরণ কামদেবপুর থেকে ফেরার পথে দীনু ভট্চাযের

কাছে জিনিসের দুর্মূল্যতা ও যুদ্ধের খবর পায়। চালের দাম বাড়ছে—চার টাকা থেকে ছ'টাকা, এখন দশ টাকা। তাছাড়া এখন কিনে না রাখলে পরে বাজারে মিলবে না। অনঙ্গ বৌও আজ দেখেছে সন্তানের হাত ধরে 'এক মগ ফ্যান ভিক্ষে করতে'। এই প্রথম অনঙ্গ বৌ সামান্য চাল ধার চেয়ে বিফল হয়। ভয়ংকর যুদ্ধ, দুর্ভিক্ষ এগিয়ে আসছে। গ্রামে-বাজারে চাল নেই। না খেতে পেয়ে মতি মুচিনীর মৃত্যু, দু'মুঠো চালের জন্য কাপালী বৌ স্বেচ্ছায় যদু পোড়ার কাছে দেহদানে সম্মতি। আসন্ন দুর্ভিক্ষে গ্রাম জীবন যে ভাঙতে চলেছে, তারই ইঙ্গিত রয়েছে 'অশনি সংকেত'-এ।

মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'চিন্তামণি' উপন্যাসে গ্রাম ক্রমশ ভাঙছে, মানুষের শান্তির নীড় ত্যাগ করে অনিশ্চয়তায় ভর করে শহরমুখী হওয়ার বাস্তব চিত্র প্রতিফলিত। 'শহরবাসের ইতিকথা' উপন্যাসের নায়ক মোহন গ্রাম থেকে শহরে এসেছে। শহরের দ্রুতগতি জীবনের সঙ্গে সামঞ্জস্য বিধানই তার সমস্যা। গ্রাম-সমাজের ধ্যান-ধারণা থেকে, মূল্যবোধ থেকে ক্রমশ আত্মকেন্দ্রিক, স্বার্থপর মানসিকতায় পৌঁছে যায়। শহরের স্বাচ্ছন্দ্য, নীতিহীন, ভোগপঙ্কিল দায়িত্বহীন জীবনের আকর্ষণে মোহনের পরিবর্তন আলেখ্য আলোচ্য উপন্যাস। সহজ সুখের সন্ধানে এসে যে শহুরে বিচ্ছিন্নতার দ্বারা আক্রান্ত হয়। কিন্তু তার স্ত্রী বাহ্যিক চাকচিক্য, শহুরে আচার-কায়দাতে আত্মস্থ করতে পারে না। মেনে নিতে পারে না শহুরে মানুষের বিচ্ছিন্নতা—'কেউ কারো দিকে তাকায় না', 'যে যার নিজেকে নিয়ে থাকে' ইত্যাদি। দেখা দেয় মানসিক দ্বন্দ্ব—শহরে মনের অন্তরালে উঁকি দেয় গ্রাম্য মানসিকতা। সামাজিক সমস্যা ও ব্যক্তি জীবনের দ্বন্দ্ব-সংকটের বিশ্লেষণে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছে উপন্যাসটি।

সুমননাথের 'সর্বংসহা' উপন্যাসটি গ্রাম ও শহরের তুলনামূলক দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশের সার্থক দৃষ্টান্ত। সর্বেশ্বর গ্রাম ও গ্রামীণ শিল্পের প্রতি পরম মমতায় গ্রাম ছেড়ে শহরে চলে আসা মানুষদের গ্রামে ফিরিয়ে আনতে চেয়েছে। তার শহরবাসী বড়ো ভাই রাজেশ্বরের শহুরে মূল্যবোধহীন, অন্তঃসারশূন্য জীবনযাত্রা দেখে হতাশ হয়েছে। গ্রামের পণ্ডিত রামস্বরূপ শহুরে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্কের অগভীরতায় যন্ত্রণাদায়ক হয়েছেন। দেখেছেন অর্থকৌলিন্যের কাছে মানবিক মূল্যবোধ পরাজিত। আপাত ডিগ্রিহীনতার জন্য টিউশন যোগাড় করতে ব্যর্থ। সর্বেশ্বরের স্ত্রী শহুরে চাকচিক্যে আকৃষ্ট হয়ে গ্রামের ধুলোভরা রাস্তা, খড়ের ঘর, মাটির দেওয়াল পুরাতন মনে করেছে। পরিশেষে দেখা যায়, রামস্বরূপ হতাশ হয়ে গ্রামে ফিরেছে, সর্বেশ্বর শহরকে 'ঠকের দুনিয়া' জেনে গ্রামে থেকেছে। কিন্তু রাজেশ্বর শহরের পরিবেশ ও জীবনযাত্রায় নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। বিভিন্ন চরিত্রের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ায় গ্রাম ও শহুরে মনের বৈপরীত্য পরিস্ফুট হয়েছে।

।। পরিবর্তনের কাল : গ্রাম জীবনের প্রাধান্য ।।

লৌকিক জীবনের বৈচিত্র্যে পরিপূর্ণ গ্রামজীবনের সঙ্গে উদ্ভূত পরিবর্তনশীল আর্থ- সামাজিক-রাজনৈতিক স্রোতের সংঘর্ষ চিত্রিত হয়েছে প্রফুল্ল রায়ের 'কেয়াপাতার নৌকা' (১৯৭০), অতীন বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'নীলকণ্ঠ পাখির খোঁজে' (১৯৭১), রমাপদ চৌধুরির 'বনপলাশীর পদাবলী' (১৯৬২), সৈয়দ মুজতবা সিরাজের 'তৃণভূমি' (১৯৭০) উপন্যাসগুলিতে।[২]

রমাপদ চৌধুরির 'বনপলাশীর পদাবলী' আসলে গ্রামীণ জীবনেরই শেষে গিরিজাপ্রসাদ সপরিবারে গ্রামে কাটানোর সিদ্ধান্ত নিয়ে গ্রামে ফিরে আসে। ছোটো ভাই পৈতৃক সম্পত্তি দেখাশুনো করছিল। বড়ো ভাইয়ের আগমনে একটু ভীত, শঙ্কিত। গিরিজাপ্রসাদ নিজের শিক্ষাদীক্ষা, গোপন অহংকারের জন্য গ্রামজীবনকে ঠিক মানিয়ে নিতে পারছিলেন না। সর্বদা একটা নাগরিক আত্মভিমান ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু শহরে থাকার সময় গ্রাম ও শহর জীবনের দ্বন্দ্ব তাঁর মধ্যে ক্রিয়াশীল ছিল। কিন্তু গ্রাম শহর তাঁকে হাতছানি দেয়। বিডিও প্রভাকরের সাথে গিরিনের মেয়ে টিয়ার বিয়ে ঠিক হয়। কিন্তু গিরিজাপ্রসাদের মেয়ে বিমলা তাকে মনে মনে পছন্দ করে। গিরিনের বৌ তা বুঝতে পেরে নিজ মেয়ের পরিবর্তে বিমলার সাথে প্রভাকরের বিয়ের ব্যবস্থা করেন। গিরিন ও তাঁর বৌ-এর মহৎ, নিঃস্বার্থ ও উদারতার কাছে গিরিজাপ্রসাদের নাগরিক অহংকার, স্বার্থপর মানসিকতা পরাজিত। অথচ এই গ্রাম, গ্রামের মানুষ, আত্মীয়দের একদিন হীন, তুচ্ছ ও অপদার্থ বলে মনে হয়েছিল। গিরিজাপ্রসাদ গ্রাম ছেড়ে দূর শহরে ছেলের কর্মস্থলে চলে যান; বনপলাশীর শান্ত, মন্থর জীবনপ্রবাহ এগিয়ে চলে।

সৈয়দ মুস্তাফা সিরাজের 'তৃণভূমি' উপন্যাসটি মুর্শিদাবাদের দ্বারকা তীরবর্তী জনপদ জীবনের পটভূমিতে স্থাপিত। উপন্যাসের সময়কাল ১৯৬৭ খ্রিঃ। সমকালীন 'সাম্যবাদী আন্দোলন, সাঁওতাল ও গরীব হিন্দুমুসলমান-গয়লা-ক্ষেতমজুর চাষী বিদ্রোহ, সশস্ত্র অভ্যুত্থানের ব্যর্থ প্রয়াস' উপন্যাসে স্থান পেয়েছে। দ্বারকা-গঙ্গার সঙ্গমস্থলের তৃণভূমিতে শুভেন্দু পালিত আধুনিক পদ্ধতিতে চাষের জন্য 'ফার্ম' তৈরি করতে চায়। ট্রাক্টর, বুলডোজার প্রভৃতি যন্ত্রপাতির ব্যবহারে পুরানো চাষের ব্যবস্থা, ক্ষেতমজুর অপ্রয়োজনীয় হয়ে পড়ে। আবার আধুনিকীকরণের জন্য দ্বারকা নদীতে বাঁধ দেওয়া হয়। কর্মচ্যুত নারী-পুরুষ জীবন ও জীবিকার তাগিদে সংবদ্ধ আন্দোলন গড়ে তোলে। কিন্তু ব্যর্থ হয়। যদিও শেষ পর্যন্ত শুভেন্দু পালিতের প্রচেষ্টা ব্যর্থ হয়। জয় হয় তৃণভূমির, জয় হয় তৃণভূমির মানুষের।

।। স্থিতাবস্থার কাল : গ্রাম-শহরের রূপান্তর, মেলবন্ধন, মানসিক সংকট ।।

অমলেন্দু চক্রবর্তীর 'রাধিকাসুন্দরী' (১৯৯৬) বিশ শতকের শেষ দশকের স্বপ্ন ও স্বপ্নভঙ্গের কাহিনি, অপরিবর্তনীয় জীবনধারার সঙ্গে পরিবর্তনশীল জীবনধারার সংঘাতের কাহিনি। হুগলি জেলার দাঁড়গাছি গ্রাম থেকে রাধিকা শহরে এসেছে ধনীলোকের বাড়িতে 'কাজের মেয়ে' হয়ে। নিষ্পাপ, সরল গ্রাম্যবালিকা রাধার কাছে 'রাজার বাড়িকে নির্বাসন' বলে মনে হয়েছে, ভুলতে পারে না আকাশজোড়া দাঁড়গাছি গ্রামকে। রাধার পরিবর্তন ঘটেছে। 'সাহেববাড়ি'র নাগরিক জীবনধারার সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে এবং উপলব্ধি করেছে, এ বাড়ির কেউ নয় সে। একদা উদ্বাস্তু পরিবার হলেও 'রাজার বাড়ি'তে ভোগবহুল নাগরিক জীবনের বিলাসবহুল উপকরণ, নাগরিক জীবনচর্যার প্রচলন ছিল। আধুনিক যন্ত্রসভ্যতার কল্যাণে দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয় যন্ত্র ও মানুষের মধ্যে। ফলে 'সাহেব বাড়িতে' কাজের মেয়ের দরকার ফুরিয়ে যায়। রাধার দাঁড়গাছিতে নির্বাসন অনিবার্য হয়েছে— ''আবার তাকে ফিরতে হবে ... আবার সেই মেটে ঘর পানাপুকুর, জলকাদা, মশামাছি ঘুঁটে-গোবরের দেশে।''[৩]

রাধিকা গ্রামজীবনকে মেনে নিতে পারে না। ছাড়তে পারে না শহুরেপনা। অন্যদিকে গ্রামের মানুষের কাছে সে শুধু অপাংক্তেয় নয়, 'নষ্ট মেয়ে'ও। ক্রমশ গ্রাম-শহরের দূরত্ব কমে এসেছে। পাকা দালান, বিজলীবাতি, টিভি এসেছে গ্রামে। গ্রামের দাশু সামন্তের সঙ্গে তার বিয়ের ব্যবস্থা করে 'ডাইনি-মা'। যদিও পাত্রের এসব ভোগবিলাসের উপকরণ না থাকলেও চাষবাস, কৃষিজমি, মাছের পুকুরের অভাব নেই। কিন্তু রাধার মন অজ-পাড়াগাঁয়ে নয়, পড়ে থাকে শহরে। কোলকাতা শহরের আকর্ষণে চালচুলোহীন 'বিদঘুটে' শিবু দেওয়ানকে আশ্রয় করে রাধা গ্রাম ছাড়ে। ''নতুন করে আবার কোলকাতা ফিরে পেল রাধা।'' কিন্তু থাকবে কোথায় সে? উল্টোডাঙার খালধারে কারখানা, বেলেঘাটার বস্তি, বাইপাশের ধারে খোলার চালের খুপরি। গ্রাম থেকে শহরে আসার জন্য একসময় পাগল হয়ে উঠেছিল। কিন্তু এ কোন কোলকাতা শহর! রাধিকা বোঝে, কোলকাতার মধ্যে আছে অনেক কোলকাতা। রাধিকার এই মানসিক সংকট, নয়ের দশকের গ্রামবাংলার ও শহর কোলকাতার রূপান্তরের ইতিবৃত্ত 'রাধিকাসুন্দরী'।

দ্বিতীয় পর্যায়

১.

সাম্রাজ্যবাদী শাসনের শেষপর্বে যুদ্ধ-দাঙ্গা-দুর্ভিক্ষ একশ্রেণির কৃষিজীবী মানুষ কীভাবে ভিখারীতে পরিণত হয়েছে, সেই অবক্ষয়িত রূপ ধরা পড়েছে রমাপদ চৌধুরীর 'ভারতবর্ষ' গল্পে। মাহাতোদের গ্রামে ক্ষেতমজুররা মিলিটারী ট্রেন দেখা ও বখশিসের উৎসাহে একজন-দু'জন করে সমস্ত গ্রামবাদী ক্রমে উপস্থাপিত হয়। বৃদ্ধ মাহাতোর ধমকে কেউ কান দেয়নি। কিন্তু কয়েকদিন পর সেই অসহায় প্রতিবাসী বৃদ্ধ মাহাতো ক্ষেত্রের কাজ ফেলে রেখে তাদের সঙ্গে যোগ দেয়। যুদ্ধ শেষ।

গল্প শেষ হয় কথকের উক্তিতে— ''ক্ষেতিতে চাষ করা মানুষগুলো সব ভিখিরি হয়ে গেল।'' যুদ্ধপরবর্তীকালে ক্ষেতের চাষিরা ভিক্ষাবৃত্তিকে জীবনধারণের সহজ উপায়রূপে মেনে নিচ্ছে। ধূলিস্যাৎ হয়ে যাওয়ার সম্মুখীন হয় গ্রামীণ সমাজ।

গ্রামাঞ্চলে নাগরিক ব্যবস্থার সম্প্রসারণে গ্রামের দুর্ভোগের মাত্রা বৃদ্ধি পায়, তারই আলেখ্য শ্যামল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দখল' গল্পটি। গ্রামাঞ্চলে রেললাইন, ব্যাঙ্ক, সরকারি আবাসন, কলেজ, হেল্‌থ সেন্টার স্থাপিত হয়। রেল লাইনের মাধ্যমে গ্রামের মানুষ জীবিকার তাগিদে শহরমুখী হয়। আবার গ্রামের মানুষ ট্রেনে ফেরি করে, ভিক্ষা করে, মেয়েরা ঝি কিংবা রক্ষিতার কাজে বাধ্য হয়। রেললাইন স্থাপনের ফলে নিস্তরঙ্গ গ্রাম অপরাধী, গুণ্ডা, বদমাইসের আবাসস্থল হয়ে ওঠে। চাষি-মজুরদের জীবনযাত্রার অস্থিরতা, অনিশ্চয়তার ফলে গ্রামজীবনের বিপন্নতাই বড়ো হয়ে দেখা দেয়।

অসীম রায়ের 'তাড়ি', 'তরমুজ' ইত্যাদি গল্পে শহর ও শিল্পাঞ্চলের প্রসারে গ্রাম-সমাজের ভাঙনের চিত্র স্থান পেয়েছে। 'তরমুজ' গল্পে দেওঘর-ত্রিকূট অঞ্চলের শ্রমজীবী কৃষকদের কাহিনি। গ্রাম বা শহরের ভালোমন্দ বড়ো হয়ে ওঠে না। শহরায়নের প্রভাবে ইলেক্ট্রিসিটি ও রাস্তাঘাটের

ফলে মানুষের স্বপ্নের আকাশটি সংকুচিত হয়ে পড়ে। শিক্ষার নামে তরুণ সমাজ শ্রম বিমুখ হয়ে যায়। গ্রামের ভালোমন্দ শহরে চালান হয় আর শহুরে পঙ্কিলতা গ্রামকে গ্রাস করেছে। এককথায় গ্রামকে ছিবড়ে বানিয়েছে শহর। এসব সত্ত্বেও কৃষিজীবী মানুষের ফসল বিক্রির ভরসাস্থল শহর। তাই গ্রাম-শহরের পারস্পরিক সহযোগিতা তাদের একমাত্র সম্বল।

২.

গ্রামীণ জীবনে শহুরে মূল্যবোধের বিরুদ্ধে যৌথ প্রতিরোধের চিত্র দেখা যায় সাধন চট্টোপাধ্যায়ের 'চিংড়ি', সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'রক্তমাংস' গল্পে। গ্রামে সিনেমার স্যুটিং দল এসেছে। এদের শহুরে জীবনযাত্রা, আচার-আচরণ গ্রামের ব্যবসায়ী, অভিজাত মানুষরা মেনে নিতে পারে না। কিন্তু গ্রামের বদনাম হওয়ার আশঙ্কায় মালোদের ছোটো ছেলে তাদের সাহায্য করতে এগিয়ে আসে। স্যুটিং দলের সঙ্গে তার মেলামেশার ফলে সামাজিক প্রতিরোধের মুখে পড়ে মালো ছেলেটির দাদা। আড়তে চিংড়ি বিক্রি করতে পারে না। গল্পটির মধ্যে শহুরে সংস্কৃতির প্রতি বিরোধিতা ও গ্রামের দ্বৈত মনোভাব প্রকাশ পেয়েছে। এমনই একটি গল্প 'রক্তমাংস'। গ্রামের মেয়ে মুম্বাইয়ে মডেল হয়ে অর্থোপার্জন করে বাড়িতে পাঠায়। গ্রামের মানুষ ও আত্মীয়স্বজন তার উন্নাসিক নাগরিক জীবনযাত্রার জন্য গ্রামে এলে কেউ মেনে নিতে পারে না। অর্থাৎ এখানেও শহুরে জীবনযাত্রার প্রতি যৌথ প্রতিরোধই প্রাধান্য পেয়েছে।

৩.

বিশ শতকের শেষ দশকে আবির্ভূত নবীন প্রজন্মের গল্পকারগণ অনেকেই জীবিকাসূত্রে গ্রামে থাকায় নিবিড় পর্যবেক্ষণসূত্রে গ্রাম জীবন ও মানুষ তাঁদের ছোটোগল্পে নতুনরূপে ধরা পড়ে। অমর মিত্র ('কোকিল', 'হনন আত্মহনন'), নীলাঞ্জন চট্টোপাধ্যায়, নলিনী বেরা ('হোমগার্ডের জামা', 'ঘবা তিহা'), অনিতা অগ্নিহোত্রী ('বিপিন সেনাপতির পুনরুত্থান')-এই ধারার রচনাকার। নাগরিক মানষের স্বার্থপর, নীতিহীন জটিল সামাজিকতার পাশে গ্রামীণ মানুষের সারল্য, নৈতিকতার দ্বন্দ্ব সুন্দরভাবে রূপায়িত হয়েছে 'কোকিল' গল্পে। সরকারি অফিসের কর্মচারী অচিন্ত্য বোস ও বন্দনা চ্যাটার্জী। পিওন গৌর; কৌলিক বৃত্তি ছেড়ে অফিসে কাজ নিয়েছে। তাকে দিয়ে ঘুষের টাকা আনা-নেওয়ার সিদ্ধান্তে গৌর বলে— 'আপনি উচ্চবংশ, বড়ো ঘরের লোক ... ঘুষ লবেন।' মফস্বল শহরের নাগরিক জীবনের নীতিহীন মানসিকতার অনাবৃত প্রকাশ 'কোকিল' গল্পটি।

রামকুমার মুখোপাধ্যায়ের রচনায় বাঁকুড়ার গ্রামীণ পরিবেশ নিম্নবর্গ মানুষের জীবন নিপুণভাবে ধরা পড়েছে। 'আকর্ষণ ও বিকর্ষণ' গল্পে কালীধন চাটুজ্যে শহর থেকে শৈশবের গ্রামে ফিরেছেন। গ্রামের পরিবেশ তাঁকে মুগ্ধ করে। কিন্তু গ্রামকে আর সেভাবে পান না। নগরায়নের প্রভাবে গ্রামের পূর্বরূপ এসেছে পরিবর্তন। দ্রুত সময়ের পরিবর্তনে গ্রামে নগরায়নের প্রভাবকে স্বীকার করতে না পেরে যন্ত্রণাদগ্ধ হয়েছেন।

বিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ তথা স্বাধীনতা পরবর্তী বাংলা কথা সাহিত্যের (নির্বাচিত রচনা)

আলোচনার প্রেক্ষিতে এটুকু স্পষ্ট যে, নগরায়ন ও বিশ্বায়নের প্রভাবে গ্রামের জীবনযাত্রায় বিপুল পরিবর্তন দেখা দিয়েছে। প্রত্যন্ত অঞ্চলেও আজ যোগাযোগ ব্যবস্থা ও গণমাধ্যম ব্যবস্থার কল্যাণে নাগরিক জীবনযাত্রার প্রভাব গ্রামজীবনকে আলোড়িত করেছে। গ্রাম জীবন তার বহমান স্রোত থেকে সরে আসছে। যদিও প্রতিনিয়ত তাদের মধ্যে অন্তর্সংঘাত চলেছে। শহর জীবনের সুযোগ-সুবিধা গ্রামে পৌঁছে দেওয়ার পাশাপাশি নাগরিক জীবনের বিকৃতি সম্পর্কে সচেতন থাকতে হবে। আমাদের লোকজীবনের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারক ও বাহক গ্রাম জীবনকে কলুষমুক্ত রাখা আমাদের সচেতন কর্তব্য।

তথ্যসূত্র

১। বিপ্লব চক্রবর্তী, ভারতীয় উপন্যাসে কলকাতা : সমাজতত্ত্ব ও শিল্পরূপ (১৮৫৭-১৯৭১), কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮, পৃ. ১০-১১

২। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়, কালের প্রতিমা, চতুর্থ সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৫, পৃ. ১৮২

৩। আলোক রায়, রাধিকা সুন্দরী : একালের ইতিকথা, দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.), বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস, প্রথম সংস্করণ, কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২, পৃ. ৪৫৮

গ্রন্থপঞ্জি :

১। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। কালের প্রতিমা। ৪র্থ সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

২। অরুণ কুমার মুখোপাধ্যায়। কালের পুত্তলিকা। ৩য় সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০৪।

৩। দেবব্রত চট্টোপাধ্যায় (সম্পা.)। বিংশ শতাব্দীর সমাজ বিবর্তন : বাংলা উপন্যাস। ১ম সংস্করণ। কলকাতা, দে'জ পাবলিশিং, ২০০২।

৪। বীরেন্দ্র দত্ত। বাংলা কথাসাহিত্যের একাল। ১ম সংস্করণ। কলকাতা, পুস্তক বিপণী, ১৯৯৮।

৫। বিপ্লব চক্রবর্তী। ভারতীয় উপন্যাসে কোলকাতা : সমাজতত্ত্ব ও শিল্পরূপ (১৮৫৭-১৯৭১)। ১ম সংস্করণ। কলকাতা, বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, ২০০৮।

রবীন্দ্র-ছোটোগল্পে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর

রামকৃষ্ণ মণ্ডল*

সামন্ততান্ত্রিক সভ্যতার ক্রমবিকাশের জোয়ারে মাতৃতান্ত্রিক সভ্যতার অবনমন রচিত হয়। নারী চলে যায় পর্দার অন্তরালে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষ নানাভাবে নারীকে শৃঙ্খলিত করে। নারী পুরুষের সম্পদ বলে গণ্য হয়। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস বলেছেন,

> মাতৃ অধিকারের উচ্ছেদ হচ্ছে স্ত্রী-জাতির এক বিশত্রব ঐতিহাসিক পরাজয়। পুরুষ গৃহস্থালির কর্তৃত্বও দখল করল, স্ত্রীলোক হল পদানত, শৃঙ্খলিত, পুরুষের লালসার দাসী, সন্তান সৃষ্টির যন্ত্র মাত্র।[১]

সামন্ততন্ত্র অবসানের পর ধনতন্ত্র যখন সামাজিক সমৃদ্ধি ফিতিয়ে আনতে মরিয়া তখনও মেয়েরা থেকে গেল ব্রাত্য। আঠারো শতকের বুদ্ধিজীবী মেরি উলস্টোন ক্রাফট এবং উনিশ শতকে জন স্টুয়ার্ট মিল মেয়েদের শিক্ষার ও জ্ঞানের আলো থেকে বঞ্চিত করে অন্দরমহলে আটকে রাখার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করেন। ট্যোনি মরিসন সমাজে নারীর অধিকারের জন্য লড়াই করেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর নবজাগরণের আন্দোলনের পর বিংশ শতাব্দীর যুগসন্ধিক্ষণে নারীপ্রগতি আন্দোলন ভিন্ন মাত্রায় উন্নীত হয়। বাংলার বুকেও সেই আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়ে। রামমোহন-বিদ্যাসাগরের যুগের সমাজ সংস্কার আন্দোলনের ফলে নারীদের প্রতি সামাজিক দৃষ্টিভঙ্গি প্রসারিত হয়। সতীদাহ প্রথার অবসান ঘটে। বিধবাবিবাহ প্রথা আইনসিদ্ধ হয়। বহুবিবাহ ও বাল্যবিবাহের বিরুদ্ধে মানুষ রুখে দাঁড়ায়। নারীদের সম্পত্তির অধিকারের বিষয়টি স্পষ্ট হয়। স্ত্রীশিক্ষার ব্যাপক প্রসার ঘটে। সামন্ততান্ত্রিক সমাজব্যবস্থায় কুসংস্কার, ধর্মান্ধতা, সামাজিক অন্যায়-অবিচার, নারী-পুরুষের মধ্যে বৈষম্য প্রভৃতি বিষয়গুলি জনমানসে আলোড়ন সৃষ্টি করে। নারীরা শিক্ষা ও স্বাবলম্বনের পথে অগ্রসর হয়। সামাজিক অধিকারের প্রশ্নে তারা সংগঠিত হয়। জাতীয় মুক্তি সংগ্রামে তারা অংশগ্রহণ করে। নারীজাগরণের এই উল্লেখযোগ্য অধ্যায়ে অর্থাৎ ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষাংশের নবজাগরণের তরঙ্গশীর্ষ থেকে বিংশ শতাব্দীর তিন দশকের জাতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনের যুগ পর্যন্ত রবীন্দ্র সাহিত্য সৃষ্টির স্বর্ণযুগ। সমালোচকরা এই সময়পর্বকে রবীন্দ্রযুগ বলে অভিহিত করেছেন। এই যুগের সামাজিক প্রেক্ষাপটে রবীন্দ্র কথাসাহিত্যের বিশেষত রবীন্দ্র ছোটোগল্পের প্রতিবাদী নারী কণ্ঠস্বরের সাযুজ্য কোথায়? রবীন্দ্র সাহিত্যে নারী অধিকাংশ সময়ে এসেছে প্রেয়সী ও জননী বেশে। কিন্তু 'স্ত্রীর পত্র'-এ মৃণাল, 'পয়লা নম্বরে' অনিলা, আর 'ল্যাবরেটরি' গল্পে সোহিনী ব্যতিক্রমী। পুরুষকে আশ্রয় করে যে সম্পর্কের বৃত্ত রচিত হয় সে বৃত্তকে অস্বীকার করে নারীর স্বাতন্ত্র্য ও আত্মমর্যাদা নিয়ে অস্তিত্বকে

---

* গবেষক, বাংলা বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়।

রক্ষা করার সংগ্রামে রচিত হয় রবীন্দ্র ছোটোগল্পে নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। যেখানে নারীত্বই তাদের একমাত্র পরিচয়।

'স্ত্রীর পত্র' গল্পে মৃণাল বিন্দুর মৃত্যুতে উপলব্ধি করতে পেরেছে প্রচলিত সামাজিক বিধানে বিন্দুকে জোর করে এক পাগলের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া এবং শ্বশুরবাড়িতে নিদারুণ অত্যাচারের দরুণ বিন্দু আত্মঘাতিনী হয়েছে। পুরুষতান্ত্রিক সমাজে পুরুষের শাসনে বিন্দুর আত্মাহুতি মৃণালকে করেছে আত্মসচেতন। মৃণাল তাই স্বামীকে চিঠিতে লিখেছে,

> তোমাদের গলিকে আর আমি ভয় করিনে। আমার সম্মুখে আজ নীল সমুদ্র, আমার মাথার উপরে আষাঢ়ের মেঘপুঞ্জ। তোমাদের অভ্যাসের অন্ধকার আমাকে ঢেকে রেখে দিয়েছিল। ক্ষণকালের জন্য বিন্দু এসে সেই আবরণের ছিদ্র দিয়ে আমাকে দেখে নিয়েছিল। সেই মেয়েটাই তার আপনার মৃত্যু দিরে আমার আবরণখানা আগাগোড়া ছিন্ন করে দিয়ে গেল। আজ বাইরে এসে দেখি আমার গৌরব রাখার জায়গা নেই। আমার এই সমাদৃত রূপ যার ভালো লেগেছে সেই সুন্দর সমস্ত আকাশ দিয়ে আমাকে চেয়ে দেখেছেন। এইবার মরেছে মেজো বৌ। তুমি ভাবছ আমি মরতে যাচ্ছি— ভয় নেই, অমন পুরোনো ঠাট্টা তোমার সঙ্গে করব না। মীরাবাঈও তো আমারই মতো মেয়েমানুষ ছিল—তার শিকলও তো কম ভারি ছিল না, তাকে তো বাঁচবার জন্যে মরতে হয়নি। মীরাবাঈ তার গানে বলেছিল, 'ছাড়ুক বাপ, ছাড়ুক যে যেখানে আছে, মীরা কিন্তু লেগেই রইল প্রভু—তাতে তার যা হবার হোক।' এই লেগে থাকাই তো বেঁচে থাকা। আমি বাঁচব, আমি বাঁচলুম।[২]

মৃণালের স্বামী অত্যাচারী ছিল না। স্বামীর প্রেম থাকা সত্ত্বেও মৃণাল উপলব্ধি করেছিল,

> আমি বিন্দুকে দেখেছি। সংসারের মাঝখানে মেয়ে মানুষের পরিচয়টা কি তা আমি পেয়েছি। আর আমার দরকার নেই।[৩]

অর্থাৎ মৃণালের কাছে পত্নীত্ব নয় নারীত্ব বড়ো। সেই কারণে সে তার সামাজিক বিদ্রোহ ও বন্ধন মুক্তির কথা জানিয়ে স্বামীকে চিঠি লিখে প্রচলিত সমাজশৃঙ্খলের বুকে চরম আঘাত করেছে।

'কঙ্কাল' গল্পের নায়িকা বিদ্রোহিণী। ডাক্তার শশিশেখর সৌন্দর্যময়ী নারীর প্রেমকে অবমাননা করেছে অন্যত্র বিবাহে মত দিয়ে। কঙ্কালের দেহী পার্থিব সত্তা মেনে নিতে পারেনি পুরুষের এই অন্যায়কে। তাই মদের গেলাসে শশিশেখরকে তার বিয়ের আগেই হত্যা করে নিজে আত্মঘাতিনী হয়েছে।

'পয়লা নম্বর'-এ অনিলা তার প্রতিবাদ রেখে গিয়েছে একটি সংক্ষিপ্ত চিঠিতে। স্বামী অদ্বৈত চরণ ও প্রেমিক সিতাংশু মৌলি উভয়ের মধ্যে পুরুষের সম্পূর্ণ মুক্তসত্তার সনধান পেয়ে দুজনকেই ত্যাগ করেছে অনায়াসে। সতী কিংবা প্রিয়া কোনোটাই তার আকাঙ্ক্ষার ধন ছিল না। তাই চিত্রঙ্গদার মতোই সে যেন বলেছে ''দেবী নহি, নহি আমি সামান্যা রমণী''। সেও চিঠি লিখেছে,

> আমি চললুম, আমাকে খুঁজতে চেষ্টা কর না। করলেও খোঁজ পাবে না।[৪]

তার লেখা নীল রঙের চিঠির অর্ধেক পেয়েছে স্বামী অদ্বৈতচরণ এবং বাকি অর্ধেক প্রেমিক সিতাংশু মৌলি।

'বোষ্টমী' গল্পে সমাজের বিশেষ প্রেক্ষাপটে এক নারীর আত্মমর্যাদা প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নায়িকা বোষ্টমী গুরুর কাছে নারীত্ব বিসর্জন দিয়ে তুষ্ট হতে পারেনি। লালসাকে অতিক্রম করে নারীত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছে। 'মানভঞ্জন' গল্পে রূপবতী বিবাহিতা গিরিবালা বারবিলাসী স্বামীর অবজ্ঞার কাছে পরাজিত হয়নি। সে থিয়েটারে অভিনয় করে স্বামী গোপীনাথকে বোঝাতে চেয়েছে স্বামীর অবহেলা পেলেও নারী হিসেবে অন্য অনেক পুরুষের কাছে মূল্যবান। তাছাড়া সে একজন শিল্পী। তার শিল্পী সত্তাই তার কাছে বড়ো হয়ে উঠেছে।

'বদনাম' গল্পের নায়িকা স্বাধিকার সচেতনা নারীরূপে সমাজের সামনে দাগ রেখে গিয়েছে। সে পুলিশ অফিসারের স্ত্রী, পতিব্রতা। কিন্তু সহধর্মিণী নয়। রাজশক্তির ভৃত্যরূপে স্বামী স্বদেশিদের সঙ্গে শত্রুতা করলেও সৌদামিনী স্বামির র্কমের সহভাগিনী হতে পারেনি। সে বিপ্লবী অনিল মিত্রকে পালাতে সাহায্য করেছে। স্বামীকে বলেছে,

> মেয়েদের চাতুরী দিয়ে ঘরকন্না চালাতে হয়, সেটা দেশের সেবায় লাগালে ঐ স্ত্রী বুদ্ধি ষোলআনা কাজে লাগতে পারে। পুরুষেরা বোকা, তারা আমাদের বলে সবলা, অবলা —এই নামের আড়ালেই আমরা স্বাধবীপনা করে থাকি, আর ঐ খোকার বাবারা মুগ্ধ হয়ে যায়। আমরা অবলা, অখলা, কুকুরের গলায় শিকলের মতো এই খ্যাতি গলায় পরে থাকি, আর তোমরা আমাদের পিছন পিছন টেনে নিয়ে বেড়াও। তার চেয়ে সত্যি কথা বল না কেন — সুযোগ পেলে তোমরাও ঠকাতে জান, সুযোগ পেলে আমরাও ঠকাতে জানি। আমরা এত বোকা নই যে শুধু ঠকবই আর ঠকাবই না। ... আমরা অলক্ষ্মী হয়ে যদি কাজের মতন একটা কিছু করতে পারি তাহলে আমাদের রক্ষা, এই আমি তোমাকে বলে রাখলুম। আমাদের ছদ্মবেশ ঘুচিয়ে দেখ তো দেখবে— হয়তো আছে কোথাও কিছু কলঙ্কের চিহ্ন, কিন্তু তার সঙ্গেই আছে জ্বলন্ত আগুনে দাগ। ... লোকে বলবে না সতী, বলবে না স্বাধবী, বলবে দাজ্জাল মেয়ে। এই কলঙ্কের তিলক আঁকা ছাপ পড়বে তোমার সুদূরকপালে, আর তুমি যদি মানুষের মত মানুষ হও তবে তার গুমোর বুঝতে পারবে।[৫]

নারীর এমন আত্মসচেতন মানসিকতা ও ব্যক্তিস্বাধীনতার নিদর্শন নারীপ্রগতিরই নামান্তর।

'ল্যাবরেটরি' গল্পে সোহিনী ব্যতিক্রমী। সে তার জীবনের গতি নিজেই নির্ধারণ করেছে এবং তাকে নিয়ন্ত্রণ করেছে। অনাগতবিধাতার মতো ভবিষ্যৎকে প্রত্যক্ষ করে নন্দকিশোরকে সে বলেছে,

> আমার জন্মস্থানে শয়তানের দৃষ্টি আছে। ... জগতের সবচেয়ে বড় নাম হচ্ছে ঐ শয়তানের। তাকে যে নিন্দা করে করুক, কিন্তু সে খুব খাঁটি। ... তোমার মধ্যে ঐ শয়তানের মন্তর আছে। তাতে তোমারই হবে জিত। অনেক পুরুষকেই আমি ভুলিয়েছি, কিন্তু আমার উপরে টেক্কা দিতে পারে এমন পুরুষ আজ দেখলুম। আমাকে তুমি ছেড়ো না বাবু, তাহলে তুমি ঠকবে।[৬]

নন্দকিশোরও তাঁকে চিনতে ভুল করেননি। 'দেখতে পেলেন মেয়েটির ভিতর থেকে ঝকঝক করছে ক্যারেকটারের তেজ— বোঝা গেল ও নিজের দাম নিজে জানে তাতে একটুমাত্র সংশয়

নেই।'[৭] আর একটি দিক থেকে সোহিনী স্বতন্ত্র। সে তার ব্যক্তিস্বভাবের স্বীকৃতির জন্য কারুর মুখাপেক্ষী নয়। সমাজের তর্জনীকে সে উপেক্ষা করতে পেরেছে অনায়াসে। সামাজিক বা পারিবারিক স্বীকৃতিবোধের জন্য সে নন্দকিশোরের প্রতি আকৃষ্ট হয়নি। সে অনুভব করেছে তার ব্যক্তিত্বের উপযুক্ত মূল্য একমাত্র নন্দকিশোরই দিতে পারবেন। সোহিনীর আতমসমর্পণ নন্দকিশোরের কর্মজীবনে বিপুল সাফল্য এনে দিয়েছে। তাঁর মৃত্যুর পর সোহিনী তার সতীত্ব প্রমাণ করার চেষ্টা করেছে নন্দকিশোরের ল্যাবরেটরিকে রক্ষা করার আন্তরিক প্রচেষ্টার মধ্যে দিয়ে। রবীন্দ্রনাথের ভাষায়— 'নারীর মোহজাল বিস্তার' করায় 'তার অসংকোচ নৈপুণ্য ছিল, সংস্কার মানার কোনো বালাই ছিল না।' মন্মথ চৌধুরীর সঙ্গে ল্যাবরেটরি রক্ষা করার আলোচনা প্রসঙ্গে সোহিনী নিজেই তার স্বভাবধর্ম সম্বন্ধে বলেছে,

> আমার বয়সের বিধবা মেয়েরা ঠাকুর দেবতার দালালদের দালালি দিয়ে পরকালের দরজা ফাঁক করে নিতে চায়। ... আমি ওসব কিছুই করিনে। ... মানুষের মতো মানুষ যদি পাই, তবে সব পাওয়া শোধ করে দিতে চাই যতদূর আমার সাধ আছে। এই আমার মর্মকথা।[৮]

কোনো ছকে বাঁধা সংস্কারের কাছে সোহিনী মাথা নত করেনি। তার নারীচেতনা সতীত্ববোধের কনভেনশনকে ভেঙে হয়েছে নন্দকিশোরের অসমাপ্ত ব্রতের রূপকার বা ব্রতসঙ্গিনী। আর এখানেই ব্যক্তিস্বভাবের মহিমায় সে মহিমান্বিত।

সামাজিক প্রেষণা ছাড়া মহৎ শিল্প-সাহিত্য সৃষ্টি অকল্পনীয়। বিশ্বের সমস্ত শ্রেষ্ঠ শিল্পী-সাহিত্যিক সমাজ বিবর্তনের বিশেষ বিশেষ অধ্যায়ের যুগচেতনাকে রূপায়িত করেই মহৎ সৃষ্টির প্রতিকৃতি নির্মাণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথও সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রমী নন। সামন্ততান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থার বিরুদ্ধে নবজাগরণের যুগের মানসিকতা, যুক্তিবাদ ব্যক্তিমানসের বিকাশের প্রেরণা। ধনতন্ত্রের বিকাশ, জ্ঞান-বিজ্ঞানের বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে ঘোষিত হয়েছিল প্রকৃতি ও ঈশ্বরের ওপর মানুষের জয়। ব্যক্তির মহিমা ঘোষণা করল, সেখানে প্রতিষ্ঠিত। শুধু পুরুষের নয়, নারীও সেই বৃত্তের সমান অংশীদার। রবীন্দ্রনাথের সমসাময়িককালে নারীর প্রতি সহানুভূতি, নারীকে আবিষ্কার, নারীর সমানাধিকারের প্রচেষ্টা অনেক লেখক করেছেন। শরৎচন্দ্রের 'শেষ প্রশ্ন'-এ নারীর শক্তিশালী আত্মপ্রকাশ। 'চরিত্রহীন'-এ অচলা মানবিক অধিকারের দাবিতে সোচ্চার। কল্লোল গোষ্ঠীর লেখক প্রবোধচন্দ্র স্যান্যালের নারী চরিত্রও শক্তিশালী। রবীন্দ্রনাথের আলোচ্য গল্পগুলিতে নারীদের সাবেকি সমাজের গতানুগতিক বেড়াজাল ভাঙার মন্ত্র অনুরণিত। নারীদের ব্যক্তিত্বের বিকাশ, চেতনার প্রসার ও আত্মমর্যাদার প্রতিমূর্তি করে গড়ে তুলেছেন। বিদ্রোহের সুর শোনা গিয়েছে নিপিড়িত, লাঞ্ছিত, বঞ্চিত নারীর কণ্ঠে। বন্ধনের যন্ত্রণা প্রাচীর ভেদ করেছে। রুদ্ধ আবেগে ধ্বনিত হয়েছে রুদ্ধসঙ্গীত— ''নারীরে আপন ভাগ্য জয় করিবার / কেন নাহি দিবে অধিকার হে বিধাতা।'' নারীর প্রগতিশীল চেতনার ক্রমবিবর্তনের ধারায় রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের নারীর প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর ভিন্ন মাত্রা যোগ করে, যেখানে নারী অনেক বেশি শক্তিশালী, আত্মআবিষ্কার মনস্ক এবং মানবিক অধিকারের প্রতি সোচ্চার।

তথ্যসূত্র

১। ফ্রেডারিক এঙ্গেলস, পরিবার, ব্যক্তিগত মালিকানা ও রাষ্ট্রের উৎপত্তি, ন্যাশনাল বুক এজেন্সি প্রাঃ লিঃ, ৩য় সংস্করণ, আগস্ট ১৯১৯, পৃ. ৪১
২। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, রবীন্দ্র রচনাবলী, বিশ্বভারতী, ১২৫ তম রবীন্দ্রজন্মজয়ন্তী উপলক্ষে প্রকাশিত সুলভ সংস্করণ, দ্বাদশ খণ্ড, পৃ. ৩৩৮
৩। তদেব, পৃ. ৩৩৭
৪। তদেব, পৃ. ৩৮৪
৫। প্রাগুক্ত, চতুর্দশ খণ্ড, পৃ. ৬৪
৬। প্রাগুক্ত, ত্রয়োদশ খণ্ড, পৃ. ২৭১
৭। তদেব, পৃ. ২৭২
৮। তদেব, পৃ. ২৭৪

সহায়ক গ্রন্থ :

১। রবীন্দ্র-ছোটোগল্পের শিল্পরূপ, তপোব্রত ঘোষ, দে'জ পাবলিশিং।
২। রবীন্দ্রনাথ, শ্রীসুবোধচন্দ্র সেনগুপ্ত, এস.সি.সরকার অ্যাণ্ড সন্স লিঃ।
৩। রবীন্দ্রনাথ ছোটোগল্পের সমাজতত্ত্ব, ক্ষেত্র গুপ্ত, পুস্তক বিপণি।
৪। পাশ্চাত্য সাহিত্য তত্ত্ব ও সাহিত্য ভাবনা, নবেন্দু সেন (সম্পা.), রত্নাবলী।
৫। রবীন্দ্রনাথের ছোটোগল্প, প্রমথনাথ বিশী, মিত্র ও ঘোষ পাবলিশার্স প্রাঃ লিঃ।
৬। কালের পুত্তলিকা, অরুণকুমার মুখোপাধ্যায়, দে'জ পাবলিশিং।
৭। রবীন্দ্র-স্মারক গ্রন্থ, প্রবন্ধ সংকলন, বিশ্বভারতী।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী লোকসাহিত্যে ধাঁধা

কল্পনা রায়*

পৃথিবীর নানা ভাষাভাষীদের যেমন লোকসাহিত্যে রয়েছে তেমনি তার রয়েছে নানা আঙ্গিক। উত্তরবঙ্গের সংখ্যাগরিষ্ঠ রাজবংশী ক্ষত্রিয় সমাজ ও তার সমভাবাপন্ন সমাজে ঘরে ঘরে যে ভাষা লালন করেন এই ভাষায় তৈরি হয়েছে কিচ্ছা, প্রবাদ-প্রবচন, শ্লোক, হেঁয়ালি বা ধাঁধা —এমন লোকসাহিত্যের অনেক আঙ্গিক। উল্লিখিত আঙ্গিকগুলির শুধু ধাঁধা আঙ্গিকটিকে বেছে নেব আমাদের আলোচ্য নিবন্ধে। লোকসাহিত্যে এই যে ধাঁধা হল ছন্দোবদ্ধ এক, দুই বা ততোধিক বাক্যের শিরোনাম। আভিধানিক রচয়িতাগুণ এই ধাঁধার যে অর্থ উদ্ধার করেছেন তা সকল পাঠকের কাছে সম্যক ধারণায় উপলব্ধি করা সম্ভব নাও হতে পারে। সমঝ্দার অজ্ঞাত লোক কবিগণ এই সব ধাঁধার রচয়িতা। ভাষায় ব্যাখ্যা দিয়ে ধাঁধা কথাটির অর্থোদ্ধার করা যেতে পারে। একজন প্রশ্নকর্তা কতকগুলি ধাঁধা শিখে তার নিকটতম এক বন্ধুর নিকট প্রশ্ন করছে। এখানে প্রশ্ন মানে ধাঁধা। অর্থাৎ আমি যেসব ধাঁধার মাধ্যমে প্রশ্ন করব তার উত্তর দিতে হবে। উত্তরদাতার বিষয়টি জানা না থাকলে সে উত্তরও দিতে পারবে না। উত্তর দেওয়া সম্ভবও নয়। এ জন্য ভাষাতাত্ত্বিক নন লোকায়ত লোকভাষিকগণ এই ধরনের প্রশ্নগুলিকে 'অচানক' কথা বলে অভিহিত করেছেন। চিন্তার আত্মজ্ঞান বিষয়। একটি উদাহরণ দিয়ে আলোচনায় মনোনিবেশ করবো — হিত্তি গেনুং হুত্তি গেনুং / গেনুং চিল্কির হাট / একনা বুড়িক দেখি আসিনুং / একেকোনা দাঁত। উত্তরে বলা হয়েছে ঘরের খুঁটি। রাজবংশী ভাষায় বলে পৈয়া বা পৈ। কাঠের বা কংক্রিটের সিঁড়ির ওপর ভর করে থাকে উপরের ছাউনি নামক ঘরটি। ঘরের ধরনা আর সিঁড়ির শিরোপর বা সংযোগস্থলটিতে লৌহদণ্ড সংযোগ করা হয়। এক্ষেত্রে সিঁড়ি যদি বাঁশ হয় তখন বাঁশের অগ্রে ইংরেজি V বা U-এর মতো খাম কাটা হয়। এই খামের উপর ভর করে থাকে ঘরের ধরনা। ধরনাটি ঝড়ে ঝাপটায় হেলদোল করে যাতে ঘরটি ধসে না পড়ে এজন্যে এই খামের দুপাশের প্রান্তভাগটি না কেটে দাঁতের মতো করে খাড়া অবস্থায় রেখে দেওয়া হয়। ঘরের ভারসাম্য রক্ষায় এই যে পৈ বা খুঁটি বর্ণনায় জানলাম — ধাঁধার ছন্দোবদ্ধ বাক্যটির — এক্না বুড়ির দ্বিতীয় পংক্তিতে দেখি এককোণা দাঁত। মনুষ্যরূপী দুটি দাঁতবিশিষ্ট বৃদ্ধকে এখানে সাদৃশ্য বহন করছে পৈয়া বা খুঁটি। যেকোনো শ্রোতার পক্ষে ধাঁধার তাৎক্ষণিক উত্তর দান করা অসম্ভব। বহুলাংশে এসবের উত্তরদাতাও দুর্লভ। তাই লোকসাহিত্যের গবেষক রমণীমোহন বর্মা এক সাক্ষাৎকারে বলেছেন — ''ধাঁধা শব্দের আভিধানিক অর্থ করে কী লাভ। ধাঁধা নিয়ে প্রশ্নকর্তার সামনে আমার নিজেকে মনে হয়েছে আমি যেন একপ্রকার সম্পূর্ণ এক পরিচিত জঙ্গল অথবা বেষ্টনীর ভেতর

* গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

প্রবেশ করেছি, বের হবার পথ খুঁজে পাচ্ছি না, শুধু ঘুরপাক খাচ্ছি। ধাঁধাটির কেউ কেউ অর্থ করে শোনালে তাৎক্ষণিক আমার মনে হবে, আমি যেন ঘরে ফেরার পথ খুঁজে পেলাম।" ধাঁধা বিষয়ে তাঁর যে ধারণা ও উপলব্ধি আমরা জানলাম। বাক্যালাপের শেষের কথাগুলি উল্লেখ না করে এবার কিছু ধাঁধার বর্ণনায় মনোনিবেশ করবো।

ধাঁধার বর্ণনা দিতে গিয়ে প্রথমে যে কথাটি বলতে হয় — এতদঞ্চলে রাজবংশী সমাজে ধাঁধা মূলত কৃষিভিত্তিক। তবু ধাঁধাগুলির বৈচিত্র থাকায় বহুধা বিভক্ত ধারায় পর্যায়ভুক্ত করা হয়। যেমন- গৃহপালিত পশুপ্রাণী দিয়ে ধাঁধা, কীটপতঙ্গ দিয়ে ধাঁধা, গৃহস্থালী ব্যবহার্য্য যন্ত্রাংশ দিয়ে ধাঁধা। আকাশ, বাতাস, মাটি, জল, আগুন প্রভৃতি দিয়ে ধাঁধা তৈরি হয়। এছাড়া আধ্যাত্মিক ও নীতিকথা রয়েছে এমন ধাঁধাগুলি ছন্দোবদ্ধ পংক্তি দিয়ে তৈরি করা। এসব মিলে প্রধানত ছয় প্রকার ধাঁধা পরিলক্ষিত হয়। উদাহরণ : উত্তর থাকি আসিল চিলা / চিলা নোয়াও মানষিগিলা। উত্তর - চিল। মৎসভোগী চিল ছোঁ মেরে মাছ শিকার করে। এখানে এই চিলকে পরিধেয় জামার সাথে তুলনা করা হচ্ছে। এভাবেই হাতও আছে পা ও আছে আছে উয়ার মাথা / কাটলে অক্ত নাই ইমায় ক্যামন কথা। ব্যাখ্যা নিষ্প্রয়োজন। এখানে পরিধেয় জামা ও প্যান্টের কথা বলা হয়েছে।

* খুটার পংতি নোয়ার ঠোঁট / তাক করি দণ্ডবোধ। উত্তর - কোদাল।

* খাইলে বইসে / না খাইলে শোতো। উত্তর - বস্তা বা থলে।

* কালা গাইটার বাছুর / দুধ দেয় টুকুর টুকুর। উত্তর - মেঘ।

ব্যাখ্যা - প্রাকৃতিক পরিবেশে আমাদের মাথার উপরে দেখতে পাই চাঁদ, তারা, নক্ষত্ররাজিকে। আর নীচে স্থলপথে দেখি মাটি, নদী, জল, বন্যা, বনরাজি প্রভৃতিকে। এবার এসবের কয়েকটি নমুনা তুলে ধরছি।

* জনম কালৎ দুইটা শিং / গাবুর কালে নাই, / বুড়াকালে দুই শিং / কওতো গোঁসাই? উত্তর - শুক্লপক্ষের সদ্যজাত চাঁদটি যেমন শীর্ণকায় হাতল শূন্য কাস্তের মতো দেখা যায় এবং তার দুটো প্রান্তভাগ শিং-এর মতো দেখা যায়।

* হাত নাই ঠ্যাং নাই ছল ছলেয়া যায় / পিঠিতেতেও চামড়া নাই / মানুষ জন্তু সবায় খায়। উত্তর - জল।

গাছপালা দিয়ে বহু ধাঁধা রয়েছে। এসব ধাঁধা প্রায় সবগুলিই দুই পংক্তিযুক্ত।

উদাহরণ - মাথাটা হৈল আউলা ঝাউলা / গাও খান হৈল খাসা । মুখ ডিয়া ডিম পাড়ে / টিকা দিয়া হয় বাচ্চা। উত্তর - কলাগাছ।

* কষ্টের গাই মাটির বাছুর / দুধ দেয় টুপুর টুপুর। উত্তর - খেজুর গাছ।

ব্যাখ্যা - এখানে খেজুরগাছকে গাভী আর মাটির তৈরি হাঁড়িকে গাভীর বাছুরের সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে।

আবার আলোচ্য নিবন্ধে এমন অসংখ্য ধাঁধা উল্লেখ করা যেতে পারে। আলোচনা দীর্ঘায়িত না করে বলতে চাই - রাজবংশী লোকসাহিত্যে ধাঁধা একটি বহুচর্চিত বিষয় নয় বিশেষ করে মুদ্রিত

প্রচার মাধ্যমে। তবে লোকায়ত সমাজজীবনে এর চর্চা সীমাবদ্ধ থাকেনি। আধুনিক জীবনধারাতেও সাহিত্য সংস্কৃতির মননশীল চর্চার ক্ষেত্রে এই ধাঁধা এখন সমাদৃত। একটি জনগোষ্ঠীর জীবনশৈলীতে তাঁর উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয় তার সাহিত্য সংস্কৃতির মননশীল চর্চার ক্ষেত্রে এই ধাঁধা এখন সমাদৃত। একটি জনগোষ্ঠীর জীবনশৈলীতে তাঁর উৎকর্ষতা দৃষ্ট হয় তার সাহিত্য সংস্কৃতির প্রতিফলিত আঙ্গিকগুলি থেকে, ধাঁধা আঙ্গিকটি তারই একটি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত। তাই এসব ধাঁধার চর্চার উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি ঘটুক এমন আশাই রাখি।

তথ্যসূত্র

* সাক্ষাৎকার : রমণীমোহন বর্মা

কবিগান : অতীত থেকে বর্তমান

প্রীতিলতা দত্ত*

বাংলা সাহিত্যের বহু প্রাচীনকাল থেকেই লোকসঙ্গীত স্বতন্ত্রধারায় প্রবাহিত। সংহত গোষ্ঠীগত লোকসমাজের রসচেতনা ও শিল্পবোধের স্বতঃস্ফূর্ত সুর ও বাণী নির্মিতির অন্যতম লৌকিক উপাদানে লোকসঙ্গীত। সমাজ পরিবর্তনের ধারায় মানুষের রুচি বিশ্বাস সংস্কারের মধ্য দিয়ে লোকসঙ্গীতও পরিবর্তনের ছাপ রাখে। আর এই পরিবর্তনের ছাঁচেই লোকসঙ্গীতের এক বিশেষ শাখা কবিগান, দাঁড়াকবি, খেউড়, তর্জা, আখড়াই, হাফ-আখড়াই ইত্যাদি রূপান্তরের পথ বেয়ে লাভ করে নিজস্ব পরিচিতি, এক মার্জিত শিল্পরূপ।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথমদিকে বাংলা দেশে ঢোল ও কাঁসি যোগে একধরনের ছড়াগান গাওয়া হত। এর প্রাচীন নাম আর্যাতর্যা। মূলত শিব বা ধর্ম ঠাকুরের গাজন উপলক্ষে এই গান গাওয়া হতো। ছড়া কাটাকাটির মধ্য দিয়ে দু'জন কবি দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এ গান গাইতো বলে একে দাড়াকবিও বলা হয়।

এরপরে আসে খেউড়। 'খেউড়' শব্দটি এসেছে সংস্কৃত 'খেড়' শব্দ থেকে। এর অর্থ কুৎসিত আচরণ। খেউড়ই কবিগানের পূর্বরূপ।[১] এই গান অবরুদ্ধ নারীমহলে প্রচলিত অশ্লীল ভাব-ভাষার গান। পরে তা পুরুষ মহলে ছড়িয়ে পড়ে। গঙ্গাতীরের নাগরিক সমাজে এর যথেচ্ছ বিস্তার সম্পর্কে জানা যায় ভারতচন্দ্রের বিদ্যাসুন্দরে। যেখানে বিদ্যা গৃহমনোৎসুক সুন্দরকে আরও কিছুদিন পিতৃগৃহে আটকে রাখার জন্য বলেছে —

নদে শান্তিপুর হতে খেড়ু আনাইব / নতুন নতুন ঠাটে খেড়ু শুনাইব।

এই সমস্ত তথ্যাদি থেকে মনে হয় কবিগানের বিকাশকাল ১৭৬০-১৮৩০ খ্রিস্টাব্দের মধ্যে কলকাতা শহরের পতন এবং শহরকে কেন্দ্র করেই।

করুণানিধান বিলাসে কৃষ্ণলীলা প্রসঙ্গে কবিগানের যে নমুনা আছে তাই খেউড়। প্রাচীন এই কবিগানে চারটি বিভাগ পাওয়া যায়। গুরুদেবের গীতি (বন্দনা), সখী সংবাদ, বিরহ ও খেউড়। প্রত্যেক বিভাগে দুটি করে গান। একটি প্রধান গান, অপরটি টপ্পা। প্রধান গানে আছে ধুয়া, চিতানি বা পরধুয়া। যেমন—

তিনরাত্রি কবি গায় দু-দল হইয়া / হারজিৎ শব্দ গুনে শুন মন দিয়া / গোপীতে
করিলা সৃষ্টি কবির কীর্তন / অদ্যাবধি সেই গান করে নরগণ।

মুখোমুখি লড়াইয়ে সহকারী হিসেবে থাকে ঢুলি (চেলিবাদক), কাশিবাদক, হারমোনিয়ামবাদক, বেহালা, সারিন্দা, দোতারা, বাঁশি ইত্যাদি যন্ত্র ও যান্ত্রিকগণ। যান্ত্রিকগণের মধ্য থেকেই দু'জন 'দোহরী' কবি গায়কের নির্দেশে তার দোহারকার্য সম্পন্ন করে।

---

* গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

গানে উঁচু মঞ্চের দরকার হয় না। গায়ক শ্রোতার সমান সমান আসনে থেকে ভাবের বিস্তার ঘটান। গানের স্থানকে আসর বা সভা বলে। প্রথমে যন্ত্রশিল্পীগণ তাঁদের যন্ত্রাদি নিয়ে আসরে প্রবেশ করেন। দোহারগণ বন্দনা গীতি পরিবেশন করে যাকে বলা হয় 'ডাক'। এরপর মঞ্চে আসেন মূলগায়ক বা কবি। তিন দর্শক বা কবিগণের পরিচালন কমিটি বা স্ব-ইচ্ছায় গানের বিষয় নির্ণয় করেন। বিভিন্ন 'পালা'য় গান হতে পারে। যেমন - রামায়ণ, মহাভারত বা বিভিন্ন পৌরাণিক কাহিনি, সমাজের বাস্তব কোনো দিক নিয়েও তা হতে পারে। কাহিনিগুলিতে থাকে দুটি চরিত্রের মধ্যে পাওয়া না পাওয়ার দ্বন্দ্বমুখর আলোচনা।

কাহিনির ওপর নির্ভর করেই কবির নির্দেশে দোহারগণ 'টপ্পা' পরিবেশন করেন। যেমন - 'বৃন্দে বনাম কৃষ্ণ' পালায় বৃন্দের প্রশ্ন টপ্পার মধ্য দিয়ে এইভাবে বিকাশ লাভ করে—

আমি বৃন্দাবনের বৃন্দাদূতি অদ্য কল্পনায়। / আমি রাধার দূতি হই বৃন্দে, আসিলাম পরমানন্দে, / নিতে প্রাণের গোবিন্দে হাজির মথুরায়। * আজ যাবে কাল আসবে বলে / কথা দিয়েছিল রাধারে। / সে কালের আর কদিন বাকী / বুঝায়ে বলো এ বৃন্দেরে। * তোমার বাম পাশেতে সিংহাসনে / কোন নারী ঘোমটা টানে ...

'টপ্পা' শেষ হলে মূলগায়ক আসর বন্দনা ও গুরুবন্দনা করে ছন্দোবদ্ধভাবে বিপক্ষ গায়ককে প্রশ্নবাণে জর্জরিত করেন। পরে ভক্তিমূলক কোনো গান পরিবেশিত হতো। এরপর রংপাচাঁলী ভাংতি গান করে আসর সমাপ্ত করে প্রস্থান করেন। বিপক্ষ গায়কও একই ভাবে সমস্ত প্রশ্নের জবাব দেন এবং বিভিন্ন প্রকারের ধুয়া গান করেন। যেমন - মুখধুয়া, বুলের ধুয়া, ভাংতি ধুয়া ইত্যাদি।

সহায়ক গ্রন্থ

১। বাঙ্গালা সাহিত্যের ইতিহাস, ২য় খণ্ড, সুকুমার সেন।
২। বাঙলা লোকসংস্কৃতির বিশ্বকোষ, দুলাল চৌধুরী সম্পাদিত।

সাক্ষাৎকার ও কৃতজ্ঞতা স্বীকার

১। দেবেশ চন্দ্র রায় (কবিয়াল)
২। কালবৈশাখী, ৯ম সংখ্যা, ২০১৪ সৌজন্যে।

গুয়াপান ও লোকায়ত লৌকিকতা

রিম্পা রায়*

গুবাক শব্দ থেকে আগত গুয়া, এতদঞ্চলে শব্দটির চলিত রূপ। নীচে বুৎপত্তিগত ব্যাখ্যা রাখা হয়েছে। পান শব্দটি এসেছে তাম্বূল শব্দ থেকে। সংস্কৃত সাহিত্যে একে বলে নাগবল্লী। লোকায়ত লৌকিকতায় অতিথিগণের সামনে গুয়াপানবাটা উপহার দেওয়া হয় সেবনের জন্যে। সাংস্কৃতিক ইতিহাসে 'তাম্বূলকরঙ্কপেটিকা' বা গুয়াপানবাটার যে তাৎপর্য তার সবিস্তর আলোচনার সুযোগ নেই এখানে। পাঠকদের রস আস্বাদনের জন্য এবার গুয়ার বিষয়ে মনোনিবেশ করা যাক।

> দেখিতে ঝালাম ঝুলুম / মৈদ্দোত হৈল খাল / গোন্দায় ঘাই ঘাই / খাবার হৈল ভাল।

উত্তরবঙ্গের রাজবংশীদের এটি একটি হেঁয়ালি বা ধাঁধা। এই হেঁয়ালির উত্তর হলো - মজাগুয়া। উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ছাড়াও রাজবংশী সমভাবাপন্ন হিন্দু-মুসলিম সম্প্রদায়ের ভিতর একটা প্রচলিত নিয়ম আছে। পাকা গুয়া গাছ থেকে পেড়ে তিন-চার ফুট পরিমাণ গর্ত করে এই গর্তে পুঁতে রাখা হয়। এমনভাবে পুঁতে রাখা হয় যেন গুয়ার গায়ে মাটি না লাগে। এজন্য গুয়ার ঢোঙ্গল ও পাতা নীচে বিছানো হয় অতঃপর গর্তের মাটির গায়ে সাজানো থাকবে কলার ঢোঙ্গল বা পাতা। এসবের ভিতর পাকা গুয়া যতটা পরিমাণ প্রয়োজন পূরণ করে এবং তা পাতা দিয়ে ঢেকে উপর অংশে মাটি ভরাট করে দিতে হবে। লক্ষ্য রাখতে হবে গর্তের জায়গাটায় যেন জল না জমে। এক দেড় মাসের মধ্যে গুয়া মজে যায়। বাজারে দাম উঠলে তখন গর্ত থেকে গুয়া তুলে নিকারীদের ডেকে বিক্রি দেওয়া হয়। গুয়ার গর্তকে গুয়ার খনি আর ক্রেতা-পাইকারদের বলে গুয়ার নিকারী। উত্তরবঙ্গের ছয় জেলার গুয়ার আমদানি ও রপ্তানির জন্য ফালাকাটা ও ধুপগুড়ি বিখ্যাত।

এই গুয়া বিশেষ্যপদটি সংস্কৃত গুবাক শব্দ থেকে আগত। গু, গূ + আক করণবা। বিঃ ক্লীব। এই গুয়াকে জলপাইগুড়ি, কোচবিহার, দিনাজপুর ও তৎসংলগ্ন এলাকায় সুপুরি-ও বলা হয়। মনে রাখতে হবে এতদ্অঞ্চলে পেয়ারাকে কিন্তু পেয়ারা বলে না। এই পেয়ারাকেও বলে সুপুরি। যেমন : আমরা বলি - 'কলাগুলা বেশিকরি মন্জি গেইচে'। মন্জি - মজের অপভ্রংশ, রাজবংশী ভাষার চলিত রূপ। এদেশের মানুষেরা অত্যন্ত অতিথিপরায়ণ। এই বিষয়ে দীর্ঘ আলোচনা রাখা এখানে সম্ভব নয়। মিশ্র কালচারে বহু পরিবার উন্নত হওয়া সত্ত্বেও এখনও অনেকে অতিথিগণের আপ্যায়নের উদ্দেশে পানের বাটা সামনে এনে দেয়। লোকায়ত সমাজজীবনে এই লোকসংস্কৃতি এখনও সজীব।

---

* গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

আত্মীয়-স্বজনের বাড়িফেরত হলে বাড়ির বয়োজেষ্ঠ্যর কেউ না কেউ বলবে— 'হায়রে ময়না তোর পিসাইর বাড়ি গেলু তা তোক্ কি খাওয়াইল?' উত্তরে বলবে— 'কি কথা কবার চাইস?' ফের বয়োজ্যেষ্ঠা বলবে — 'আরে ডাল ভাতের কথা না কঞ, এ্যাকনা গুয়া পানও নাই খোয়ায়!' উত্তরে বলবে — 'আরে একদণ্ড খাড়া হওয়ার সময় না আছিল। জোর তো কৈচ্চে...।' উপরের বাক্যালাপগুলির আবশ্যকতা এই জন্য যে —এখানে গুয়া কতটা গুরুত্বপূর্ণ। এই গুয়া-পান লোকসাহিত্যে কতটা তাৎপর্যপূর্ণ এবার তা দেখা যাক।

পান খ্যায়া না খাইলং চুন
সে বা পানের কিবা গুণ।

গুয়া, পান ও চুন এক সঙ্গে চিবিয়ে যে নির্যাস আমরা উদরস্থ করি, তার ভেষজগুণ অপরিসীম। তাই যেকোন খাবারের শেষে রাজবংশী ও সমভাবাপন্ন জাতির লোকজন গুয়া-পান সেবন করে থাকেন। লোকসংস্কৃতির এই ঐতিহ্যটি কতটা বিজ্ঞান অনুসারী তা বিজ্ঞানের ছাত্রদের উপরই ন্যাস্ত করলাম।

তথ্যসূত্র

লোকাসংস্কৃতিতে নেশা উৎপাদনে কোচবিহারের ভেষজ গাছ-গাছালির ইতিবৃত্ত, রমণীমোহন বর্মা, কালবৈশাখী-উত্তরের লোকসাহিত্য ও লোকশ্রুতি সংখ্যা - ২০১২।

মেখলীগঞ্জ তথা উত্তরবঙ্গের সন্ন্যাসী ঠাকুর

বিপুল বর্মন*

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী সমাজের মানুষদের মধ্যে নানান রকমের পূজার প্রচলন আছে। পূজা-পার্বণে তাঁরা আনন্দে, আন্তরিকতায়, উচ্ছ্বাসে, নিজস্ব রীতিতে, মিলনের মন্ত্রে শুভ কামনায় একত্রে মেতে উঠেন। লোকায়ত সমাজের সামাজিক, সাংস্কৃতিক, ভাষাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এবং ঐতিহাসিক তথ্যের সঙ্গে জড়িয়ে আছে সন্ন্যাসী ঠাকুর। উত্তরবঙ্গে প্রায় সর্বত্র ছড়িয়ে ছিটিয়ে সন্ন্যাসী পূজার প্রচলন থাকলেও রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকা বিশেষ করে তরাই অঞ্চলের অন্তর্গত মেখলিগঞ্জ, ধাপড়াহাট, জামালদহ, ময়নাগুড়ি, মাথাভাঙ্গা, হেলাপাপড়ি, রাজগঞ্জ, ধূপগুড়ি, হলদিবাড়ী প্রভৃতি অঞ্চলে বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসের যেকোনো শুভদিন দেখে বাবা সন্ন্যাসীর পুজো সাড়ম্বরে পালিত হয়। তবে রাজবংশী সমাজের অনেক বাড়িতে নিশান প্রতীক (শালুকবাঁধা) সন্ন্যাসীবাবাকে পূজার্চনা করে থাকেন।

সন্ন্যাসী-র অর্থ হল সংসারবাসনায় যে ত্যাগী বা ত্যাগ করে অর্থাৎ সংসার-বাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনযাপন করে। অর্থাৎ সংসারবাসনা ত্যাগ করে ঈশ্বর চিন্তায় জীবনযাপন করে।

সন্ন্যাসী ঠাকুরের উৎপত্তি সম্পর্কে লোকমিথকথা প্রচলিত আছে। অনেকে মনে করেন ইতিহাসের ভবানীপাঠক বরেন্দ্রভূমি জুড়ে তাঁর আধিপত্য ছিল। ভবানীপাঠক সন্ন্যাসী রূপ ধারণ করে বনজঙ্গলে অসংখ্য স্ত্রীলোকের রক্ষক হিসেবে ছিলেন। বিশেষত প্রফুল্লকে সাধারণ নারী থেকে দেবীচৌধুরীরাণীতে পরিণত করার কৃতিত্ব ভবানী পাঠকের। রাজবংশী সমাজে স্ত্রীলোকেরা প্রফুল্লের মত রক্ষাকারী হিসেবে সেই সময় থেকে সন্ন্যাসরূপ ধারণকারী হিসেবে সন্ন্যাসীঠাকুরকে পূজা করে আসছেন। আবার সন্ন্যাসী ঠাকুরের উৎপত্তি সম্পর্কে অনেকের ধারণা— মা কালী এক সময় রাক্ষসী বা রুদ্ররূপ ধারণ করে পৃথিবীকে ধ্বংস করেছিল। মা কালীর হাতে পৃথিবী যখন জনশূন্য হচ্ছিল সেই সময় জটাধারী শিব বাবার আগমন হয়। শিব তখন এই বরেন্দ্রভূমিতে মা কালীর হাত থেকে রক্ষা করেন। সন্ন্যাসী আসলে শিবেরই সন্ন্যাস রূপ। শিবেরই আর এক রূপ হল সন্ন্যাসী। শিব ও সন্ন্যাসীঠাকুরের পূজার মধ্যে সাদৃশ্যগত মিলও পাওয়া যায়।

বিভিন্ন রাজবংশী অধ্যুষিত এলাকায় সন্ন্যাসীবাবার নামানুসারে নামকরণ করা হয়েছে। আবার গ্রামের নামকরণগুলি ভিন্ন ভিন্ন বিষয়ে প্রাধান্য থাকায় পারিপার্শ্বিক অর্থনৈতিক অবস্থান, বিশিষ্ট ব্যক্তির প্রভাব, ঐতিহাসিক কোনো বিশেষ ঘটনায় নামকরণ হয়ে থাকে। কোনো সম্প্রদায়ের সংখ্যাগরিষ্ঠতার প্রভাবে গ্রামের নামকরণের ক্ষেত্রেও প্রভাব বিস্তার করে। তেমনি বিভিন্ন

---

* শিক্ষক, লোকসংস্কৃতি গবেষক।

দেবদেবীর বিশেষ নামানুসারেও গ্রামের নাম হয়ে থাকে। কালীবাড়ি, দুর্গাবাড়ি, রথবাড়ি, লক্ষ্মীরপাট, কালীরহাট, সতীর ঘাট, সন্ন্যাসীর হাট, বুড়ীর পাট, শীতলাবাড়ি, মশানপাট প্রভৃতি।

আলোচ্য সন্ন্যাসীবাবার নামানুসারেও বিভিন্ন এলাকার নামকরণ হয়েছে। যেমন - ধাপড়া উপমচৌকি উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত সন্ন্যাসীর হাট, মেখলীগঞ্জের ডাঙ্গার হাট, নবীনচন্দ্র উচ্চ বিদ্যালয়ের অন্তর্গত সন্ন্যাসীবাড়ি, সন্ন্যাসীটারী। এই এলাকাগুলি সন্ন্যাসীবাবার নামানুসারে হয়েছে। বর্ষীয়ানদের মত অনুযায়ী কয়েক পুরুষ আগে এই সন্ন্যাসী জায়গার নামকরণ হয়েছে।

সন্ন্যাসীঠাকুর শিবের রূপ হলেও সন্ন্যাসীঠাকুরের বিভিন্ন রকম প্রকারভেদ আছে। রাজবংশী সমাজের বর্ষীয়ানদের মত অনুযায়ী সন্ন্যাসীঠাকুরগণের এক অসম্পূর্ণ তালিকা দেওয়া হল— ১) চণ্ডক সন্ন্যাসী, ২) শুঁড় সন্ন্যাসী, ৩) শিব সন্ন্যাসী, ৪) সুখ সন্ন্যাসী, ৫) জিন সন্ন্যাসী, ৬) হরশিব-হরপার্বতী সন্ন্যাসী, ৭) স্যাঁচকা সন্ন্যাসী, ৮) টসা সন্ন্যাসী প্রভৃতি।

চণ্ডক সন্ন্যাসী : দুরে থেকে দেখতে শিবের মতো। তবে অন্যান্য সন্ন্যাসীর থেকে চণ্ডক সন্ন্যাসী আলাদা। অন্যান্য সন্ন্যাসীদের বাহন থাকলেও চণ্ডক সন্ন্যাসীর কোন বাহন থাকে না। এই সন্ন্যাসী ভক্তদের প্রতি সদা কল্যাণময় ও হাস্যময়। অনেকের বিপদ-আপদের সঙ্গী। এই সন্ন্যাসী রূপ মেখলিগঞ্জ এলাকায় বেশি চোখে পড়ে।

শুঁড় সন্ন্যাসী : শুঁড় সন্ন্যাসী শিবের আর এক রূপ। এই সন্ন্যাসীর বাহন থাকে। হাতির পিঠে সন্ন্যাসীরূপে বসে থাকেন। তাঁকে চালনা করার জন্যে মাহুতবন্ধু থাকেন। এই সন্ন্যাসী এলাকার কোনরূপ বিশৃঙ্খলা দেখা দিলে কঠোর হাতে শাস্তি দেন। এই সন্ন্যাসীর হাত থেকে অহংকারী ভক্তদের নিস্তার নেই কারণ তিনি অপেক্ষাকৃত উগ্র ও চঞ্চল। রুদ্ররূপে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন করেন।

শিব সন্ন্যাসী : শিব সন্ন্যাসীর বাহন হিসেবে গরুর অস্তিত্ব লক্ষ করা যায়। তিনি মাটিতে আসীন অবস্থায় দুহাত দিয়ে ভক্তদের আশীর্বাদ দেন। কোমল মনোভাবাপন্ন এই সন্ন্যাসীবাবার থানে ভক্তরা খোলাখুলিভাবে মনোকামনা ব্যক্ত করে।

সন্ন্যাসীরহাট, বুড়িরপাট, শীতলাবাড়ি, মাশানপাট প্রভৃতি।

সুখ সন্ন্যাসী : সুখ সন্ন্যাসী শিব সন্ন্যাসীর মতো অনেকটা। তবে এঁদের অবস্থানগত পার্থক্য অনুযায়ী চেনা যায়। এই সন্ন্যাসী সাধারণত ঝোপঝাড়, বাঁশবাগান অর্থাৎ লোকালয় থেকে একটু দূরে পূজিত হয়। এর বাহন সিংহ। সিংহের ওপর বসে এই সন্ন্যাসীবাবা দুহাত তুলে ভক্তদের আশীর্বাদ প্রদান করেন।

জিন সন্ন্যাসী : রাজবংশী সমাজের ধারণা অনুযায়ী জিন সন্ন্যাসী হলেন জিনের দেবতা। সাধারণত সন্তানহীন দম্পতিরা এই জিন সন্ন্যাসীর কাছে আশীর্বাদ নেন এবং মানুষের বিশ্বাস অনুযায়ী বিবাহের পর নারীরা উপবাস পালন করে। এরা সন্তান কামনার জন্য এই জিন বাবার কাছে ব্রত পালন করে। এই জিনবাবার বাহন ঘোড়া। সন্ন্যাসীবাবা এই ঘোড়ার পিঠে আসীন থাকেন এবং মানুষের ধারণা বাবা ঘোড়ার পিঠে চড়ে সারা গ্রাম পরিদর্শন করেন।

হরশিব-হরপার্বতী সন্ন্যাসী : একই দেহে শিব ও পার্বতীর অস্তিত্ব লক্ষমান। তিনি দণ্ডায়মান অবস্থায় থাকেন। সাধারণত পূর্বদিকে এই বাবার থান বসানো হয়। বাহন হিসেবে শিবের সাদা, লাল ষাঁড় দেখা যায়।

স্যাঁচকা সন্ন্যাসী : সন্ন্যাসীর বিভিন্ন রূপের মধ্যে অপেক্ষাকৃত সুযোগসন্ধানী স্যাঁচকা সন্ন্যাসী। স্যাঁচকা শব্দটি ঋণাত্মক শব্দ। সমাজে যারা মিথ্যাচার প্রয়োগ করে নিজের স্বার্থ চরিতার্থ করে এবং সমাজের মানুষকে বিপদাগ্রস্ত করে তোলে, এই জায়গায় বিপদগ্রস্ত ভক্তপ্রাণ মানুষ সন্ন্যাসী ঠাকুরের বৈচিত্র্যে স্যাঁচকা সন্ন্যাসী ঠাকুরের পূজা করে থাকে।

টসা সন্ন্যাসী : টসা রাজবংশী শব্দ। টসা অর্থাৎ যে কানে কম শোনে। এই সন্ন্যাসীবাবা কানে কম শোনার জন্যে ভক্তের অনেক কথা শুনতে পারেন না। তাই বাবার কাছে আর্শীবাদ চাইতে হলে অনেক উচ্চস্বরে কথা বলতে হয়।

সন্ন্যাসীবাবার পূজা সাধারণত দুইভাবে হয়। (১) মাটির বেদী নির্মাণ করে ভক্তরা পূজা করে থাকে, এবং (২) মাটির প্রতিমা বানিয়ে যে কোনো ভালো দিন দেখে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ মাসে পূজার্চনা করা হয়। বাবা সন্ন্যাসীরা পূজা অত্যন্ত জাঁকজমকভাবে করা হয়। পূজা প্রচারের জন্য ভক্তরা বাড়ি বাড়ি ঘুরে সন্ন্যাসী ভক্তদের জানিয়ে দেয়। প্রায়ই হাটের দিনগুলিতে ঢাক-ঢোল প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্র সহকারে 'মাগন' তুলে প্রচার প্রক্রিয়াও করা হয়। আবার বাড়ি বাড়ি ঘুরে মাগন খেলা করে ভক্তদের জানানো হয়। প্রধানত বটগাছ, রাস্তার ধার এবং রাস্তার মোড়ে থান বা বেদী নির্মাণ করা হয় উত্তর-পূর্ব কোণে। সেখানে পূজা দিতে অগণিত ভক্তদের সমাগম দেখা যায়। তবে দিনটি সাধারণত অমাবস্যা বা পূর্ণিমা তিথিতে ভালো দিন দেখে পূজা করা হয়।

অধিকারী কথাটির অর্থ হল সমাজ যাকে অধিকার দেয়। এই অধিকারী সমাজের গণমান্য ব্যক্তি। রাজবংশী সমাজে পূজা-পার্বণ এবং বিভিন্ন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রে এই অধিকারী পূজা করে থাকেন। ব্রাহ্মণ পূজা করলেও এই অধিকারীর ক্ষমতা ব্রাহ্মণের সমতুল্য। সমাজের ধারণা অনুযায়ী ব্রাহ্মণের চাইতে অধিকারী পূজা করলে শুদ্ধতা বেশি হয়।

সন্ন্যাসী পূজায় ব্যবহৃত উপকরণগুলি হল — কলাপাতা, কলার নেউজপাতা, দূর্বাঘাস, পটুয়া, সিঁদুর, প্রদীপ, গঙ্গাজল, আমের পল্লব, ঘি, পাঁচ ফল বা সাত ফল বা তিন ফল, আটঘড়ি, বেলপাতা, ফুল প্রভৃতি। এছাড়াও গাঁজা, ছিলিম আবশ্যিক উপকরণ। সকল সন্ন্যাসীবাবার পূজার ক্ষেত্রে প্রায় একই ধরনের উপকরণ প্রয়োজন। অধিকারী-ব্রাহ্মণ কয়েক ঘন্টা ধরে নিয়মনিষ্ঠা সহকারে মন্ত্রপাঠ করে পূজা দেন। পূজার শেষে শান্তিযজ্ঞ করা হয়। তারপর ভক্তরা বাবা সন্ন্যাসীকে নিজ নিজ প্রার্থনা করে। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পূজা চলাকালীন মহিলারা মন্দির প্রাঙ্গণে থাকতে পারেন না। পুরুষরাই পূজা দিতে পারে। পূজার শেষে মহিলারা বাবার কাছে গিয়ে প্রার্থনা করতে পারে। বাবার কাছে গাঁজা, ছিলিম, দই, ফল-মূল প্রভৃতি মানত করা হলেও পাঁঠা, পায়রা মানত করা হয় না। কারণ এই পূজার ক্ষেত্রে বলি নিষেধ। ভক্তরা ফুল-জল দিয়ে

পূজার শেষে ষষ্ঠাঙ্গে বাবাকে প্রণাম করে মনে মনে বিভিন্ন রকমের মঙ্গলসূচক কামনা করে। যেমন—

১) বাবা একবার তোর্ অধম ভক্তটার ভিতি মুখ তুলিয়া দেখিস্।

২) নিন্দ থাকিয়া উঠিয়া মোক্ মাইনসিলা আটকুরা কয়। বাবা, মোক্ একটা ছাওয়া দিয়া আট্কুড়া ঘুচাও।

৩) বাবা, জমি-জমাগুলা য্যান ভালে ভালে চাষ করিবার পারং।

৪) ছোটোছাওয়াগুলো য্যান দুধে-ভাতে থাকির পায়। আর বাকি দিনগুলা য্যান ভাল্ করি থাকির পাং।

উপরের আলোচনা থেকে সন্ন্যাসী ঠাকুরের বৈচিত্র্য এবং ভক্ত প্রাণণের প্রতি সব মনস্কামনা পূরণার্থে দক্ষতার দৃষ্টান্তগুলি জানতে পারি। পরন্তু যে বিষয়টি জানতে পারলে তা অনুসন্ধানকারী গবেষকদের বড় উপাদান। এই সন্ন্যাসীবাবা হলেন শিবেরই এক বৈচিত্র্যের মূর্ত পরিগ্রহ, এই আলোচনার অবকাশ নেই এখানে। তাই বিরত থাকলাম।

দুটি উপন্যাস : দুটি মৃত্যু

অচ্যুতানন্দ বিশ্বাস*

গীতায় শ্রী ভগবান অর্জুনকে বলেছিলেন; ''নাস্তি বুদ্ধিরযুক্তিস্য ন চাযুক্তস্য ভাবনা। ন চাভাবয়তঃ শান্তিরশান্তস্য কুতঃ সুখম।'' ইন্দ্রিয় যার বশীভূত নয় তার আত্মবিষয়িনী বুদ্ধির অভাব থাকে। অভাব থাকে চিন্তার-চেতনার মানসিক শান্তি তার থাকে না। মন হয় অস্থির। তাই অস্থিরতা থেকেই তার জীবনে ঘটে নানা বিপত্তি। জীবনানন্দের কাব্য সাহিত্যের অনেক নায়ক মনের এই বিচিত্র রোগে আক্রান্ত। তারা নিজের সঙ্গে নিজে লড়াই করে। এবং অবশেষে পরাজয় বরণ করে নেয়। আমরা তাদের কারো মুখেই শুনতে পাই না 'মনকে জয় করেছি, বিশ্ব তখন আমার পদতলে।' বরং তাদের অনেকেই দেখি মৃত্যুর পদতলে আশ্রয় নিয়েছে। এই মৃত্যু স্বাভাবিক, না আত্মহত্যা, না খুন তা অনেক সময় বোঝা যায় না। এক অদ্ভুত পরিবেশ ও পরিস্থিতি মূল গল্পকে ভূতের মতো তাড়া করে। তাড়া করে এক অদৃশ্য নিয়তি। অনেক সময় মনে হয় এই দুর্লঙ্ঘনীয় নিয়তিকে জয় করবার শক্তি জীবনানন্দের নায়কদের নেই। তারা যেন নিয়তির অঙ্গুলি নির্দেশেই চালিত। যতটুকু সময় তারা বেঁচে আছে, ততটুকু সময় তারা 'মরতে পারছে না বলেই বেঁচে আছে'। পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে থাকে বেঁচে থাকার গ্লানি, যন্ত্রণা, ক্লান্তি আর অপমানের কথা। তারা যেন 'সমুদ্রের পারে এই নক্ষত্রের তলে যদি আজ আমি শেষ হয়ে যাই।' মৃত্যুর এক দুর্নিবার আকর্ষণ তারা অনুভব করে। তারপর সংলাপের কোনো চকিত চমকে, জীবনানন্দ দুম করে তাদেরকে মৃত্যুর মুখোমুখি করে সম্পূর্ণ অপ্রসূত করে দেন আমাদের।

আমার বেছে নেওয়া দুটি উপন্যাসকে এবার দেখা যাক এক এক করে। এর প্রথমটির নাম 'নিরুপম যাত্রা'। ১৯৮৪ সালে শারদীয়া প্রতিক্ষণে প্রথম প্রকাশ।

এই উপন্যাসের নায়ক প্রভাত। শিক্ষিত। কিন্তু বেকার। কাজের সন্ধানে, বলা ভালো চাকরি খুঁজতে এসেছে শহর কলিকাতায়। দেশের বাড়ি পূর্ববঙ্গে। ঘরে আছে বৃদ্ধা মা, ছোটো ছেলে এবং স্ত্রী। স্ত্রীর চিঠি তার কাছে 'রক্তাক্ত লড়াইবাজ চিলবধূর মতো'। 'খোকা কত বড় হল?' জানতে চাইলে উত্তর আসে, 'কুন্দর চিঠি পেলাম আজ, তার স্বামী তো কলকাতায় গিয়ে ছ'মাসের মধ্যেই লেওয়ে ডিপার্টমেন্টে কত বড়ো চাকরি জোগাড় করে নিল আর তুমি কিছুই করতে পারলে না।'— এ পণ্য বিলাসী সমাজের রূঢ় ছবি।

প্রভাত এবার ঠিক করেছে, সে দেশে ফিরবে। চার বছর পর এবার সে দেশে ফিরবেই ফিরবে। প্রভাতের মন চলে যায় সেখানেই যেখানে আছে কুকুর কেতু, ধোপা নিরঞ্জন, গাড়োয়ান কলিম, সেই তেঁতুলগাছ, ড্রিল মাস্টার দ্বিজেনবাবু। এ শহর তার কাছে যেন এক জ্বলন্ত নরক।

---

* অধ্যাপক, ধ্রুবচাঁদ হালদার কলেজ, দক্ষিণ বারাসাত।

এখানে সকলে সকলের দিকে আড় চোখে তাকায়। এখানে কোনো শান্তি নেই। শান্তি তার দেশে। শান্তি তার গ্রামে। সে যেন এক স্বর্গ। সুতরাং সেখানে তাকে যেতেই হবে।

কিন্তু প্রভাতের ভাগ্যদেবীর অন্য ইচ্ছা। এইবার একের পর এক প্রতিবন্ধকতা তৈরি হয় তার ঘরে ফেরার পথে। কলকাতা থেকে বরিশাল—এই সামান্য দূরত্ব ধীরে ধীরে তার কাছে অনতিক্রম্য হয়ে ওঠে। হঠাৎ কিছু পরিস্থিতি, কিছু কথা তৈরি করে দেয় এক নতুন গল্পের। যে গল্প হয়ে ওঠে অদৃশ্য নিয়তির সঙ্গে একজন নিঃসঙ্গ অসহায় মানুষের একক লড়াই-এর। যেদিন প্রভাত টাকা ধার করে দেশে ফেরার টিকিট কিনলো সেদিনই তার কাছে মাস তিনেকের জন্য ছাত্র পড়ানোর প্রস্তাব এল। প্রস্তাবক তারই এক বন্ধু। নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে বন্ধুর বিশেষ অনুরোধে, বলা ভালো জোরাজুরিতে রাজি হতে হয় প্রভাতকে। অথচ ধার করা টাকায় সে টিকিট কিনেছে। কিনেছে বউ-এর জন্য শাড়ি, মায়ের থান কাপড়। ছেলের জন্য কিনেছে লাটিম, বেলুন, বিস্কুট প্রভৃতি। যে স্বপ্ন, যে আশা, যে আনন্দ নিয়ে প্রভাত দেশে ফেরার আয়োজন করেছে তাতে পাঠক স্বস্তির বদলে আশঙ্কিত হয় বেশি। পাঠক যেন বুঝতে পারে ভবিষ্যতের পরিণতি। পাঠকের মনে হয় এবার বুঝি আরও ভয়ংকর বাধার সম্মুখীন হতে হবে প্রভাতকে। এবারের পরিস্থিতি হবে আরও কঠিন।

পরিস্থিতির ঘূর্ণবর্তে পড়ে প্রভাতকে কলকাতায় থেকে যেতে হয়। মাস তিনেকের জন্য ছাত্র পড়াতে পড়াতে তার কাছে আসে আর একটি নতুন প্রস্তাব। স্কুলে পড়ানোর প্রস্তাব। অস্থায়ী। মা ছয় মাসের কাজ। অথচ প্রভাত এই কাজটিও মনের ইচ্ছার বিরুদ্ধে গ্রহণ করে।

মনের দোদূল্যমানতায় প্রভাত কোনো ক্ষেত্রেই দৃঢ় সিদ্ধান্ত নিতে পারে না। মন তার বড়োই অস্থায়ী। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে যে যথাযথ সিদ্ধান্তের প্রয়োজন ছিল প্রভাত তা নিতে অক্ষম হয়েছে। উপযুক্ত সময়ে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের অক্ষমতাই তাকে নিয়ে গিয়েছে জীবনের এক সংকটময় অবস্থায়। যেখানে সে জানে চাকরিটা ছ-মাসের, স্থায়ী নয়, সেখানে এই কাজে নিজেকে নিয়োগ না করলেই মনে হয় ভাল হত। বরং সে যদি স্থায়ী চাকরির সন্ধান করত বা স্থায়ী-চাকরি করত তাহলে তার নিজের জীবন অন্যরকমভাবে উপন্যাসে উপস্থিত হতে পারত। কিন্তু তা হয়নি। কারণ সে নিজেই। প্রভাত নিজেই বলেছে: ''নিজেকে যতটা প্রেমিক মনে করি ততটা আমি নই—তাই যদি হতাম তা হলে সেই যে তিন মাস আগে বিছানাপত্র বেঁধে যাচ্ছিলাম, চলেই যেতাম, কেউ আমাকে ঠেকিয়ে রাখতে পারত না।'' কিন্তু প্রভাত বাড়ি যেতে পারে না। পাঠকের মনে হতে পারে এ তো ভালোই হল। কারণ মাত্র তো ছয় মাসের ব্যাপার। এতে তো প্রভাতেরই আর্থিক সঙ্গতি হবে। কাজেই এ কাজ তার আত্মার যতই বিপক্ষে যাক না কেন এতে বাহ্যিক সুবিধা হবে তো তারই। কিন্তু প্রভাত এই সুবিধা চায়নি। সে একটু স্বচ্ছলতা চেয়েছিল, চেয়েছিল স্ত্রী-পুত্র নিয়ে সুখী হতে। উচ্চ শিক্ষিত হয়েও সে ভাগ্যের নির্মম পরিহাসে সেই স্বচ্ছলতার মুখ সে কোনো দিন দেখতে পায়নি। দেখতে পায়নি স্ত্রীর মুখে একটুখানি হাসি। এক বিপন্নতায় প্রভাত ভাবে, ''এক-এক সময় পথঘাট একেবারে দুঃসহ হয়ে ওঠে—যে কোনো

জায়গায় পালিয়ে যেত পারলে আমি বাঁচি।" সত্যিই এই বাণিজ্যিক সমাজ তার ভালো লাগে না। ভালো লাগে না চলমান কলকাতার মেকি ভদ্রতা। দ্বিধাহীন কণ্ঠে সে সমীরকে বলে: ''না, কলকাতা তো আমার এমন প্রিয় জিনিস নয় সমীর।" প্রভাত জীবনানন্দের সেই নায়ক, যাকে নিজের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কাজ করতে হয়, সেই কাজ যে কাজে সে আনন্দ পায় না। স্কুলে সে পড়াতে চায় ইংরেজি অথচ তাকে পড়াতে হয় অঙ্ক: 'উপরের ক্লাসের জ্যামিতি পড়াবার ভার তার ওপর, ছেলেরা কঠিন-কঠিন এক্সট্রা নিয়ে এসে হাজির হয়। কাজেই বাড়িতে বসে গত তিন মাস অনেক আঁটঘাঁট করে তৈরি হয়ে যেতে হয় তাকে। ইংরেজির মানুষ প্রভাত। অথচ তাকে ইংরেজি পড়াতে দেওয়া হয় না'। একদিন হেডমাস্টারকে সে বলে— ''আমাকে ইংরেজি পড়াতে দিন।" কর্মক্ষেত্রেও সে শান্তি পায় না। বরং কাজ করেও সে কর্তৃপক্ষের কাছে থেকে পায় অপমান। এমনকি হেডমাস্টারের অপমান সহ্য করেও অবশেষে সে ছুটি নেয়। এবার সে বাড়ি যাবেই যাবে। তার মনে হয়, 'মানুষ কদিনই বা বাঁচে, বাঁচে না বেশি দিন। টাকাকড়ি সফলতাও খুব কম মানুষের জীবনেই হয়। কিন্তু কয়েকটা ভালোবাসার জিনিস আমাদের জন্য সে রেখে দেয়। সে সবের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে থেকে লাভ কী?' তাই মেসে ফিরে এসে সে ঠিক করে আজই সে দেশে চলে যাবে। খাটের নীচের থেকে একটা মস্ত বড়ো লম্বা দড়ি বের করে বিছানাটা বাঁধতে বাঁধতে সে ভাবল— ''এ পাঁচ বছর জীবনটাকে নেড়েচেড়ে দেখলাম, সংসারে যারা সফল হবে তাদের জাত আলাদা। ভালবাসার চেয়ে সফলতাকেই তারা ভালোবাসে বেশি। আমার ঠিক উল্টো, প্রেম, দাক্ষিণ্য, মমতার, ঘরানা গন্ধেই তৃপ্তি। যে যা ভালোবাসে সেই জিনিসেরই আরাধনা করা উচিত তার। নিজের জীবনটাকে ভুল বুঝে মিছিমিছি অন্ধ হয়ে ঘুরে কী লাভ!" সে তাই দেশে ফিরে যেতে চায়। সেখানে একটা মনিহারি দোকান খুলে বসবে। কিংবা দেশের স্কুলে মাস্টারির চেষ্টা করবে। এখানে এসে জীবনানন্দ প্রভাতের চিন্তার হঠাৎ পরিবর্তন করেন। এই পরিবর্তনে নতুন কিছু আশা করে পাঠক।

প্রভাত সুস্থির হয়ে চেয়ারে বসে একটা চুরুট নারাচাড়া করতে করতে সে ভাবে, 'হুজুগে কোনো কাজ করা উচিত নয়।' তার মনে হল, 'যারা দুর্বল তারা পিছিয়ে পড়ে, মায়া-মমতার দোহাই পাড়ে—জীবনের ভিতর বিধাতার খেলা দেখে।' যে জীবন থেকে একরকম পালিয়ে বাঁচতে চেয়েছিল সেই যখন জীবনের রূপ-রস-গন্ধের স্বাদ পায়, তখন তার সাথে পাঠকও আনন্দ পায়। প্রভাত এখন জীবনে বেঁচে থাকার অর্থ খুঁজে পেয়েছে। সে 'লড়াইবাজ বাজপাখির' মতো সমাজ-সংসারে বেঁচে থাকতে চায়। সংসারে নিজেকে সুপ্রতিষ্ঠিত করতে চেয়ে সে ''বিছানাটা পুরোপুরি খুলে পেতে নিল—বিছানায় শুয়ে শুয়ে সমস্ত দুপুর, সমস্ত বিকাল সে ঢের উজ্জ্বলতায় জীবনের সুবিন্যাসের স্বপ্ন দেখল।"

ঠিক তারপরেই আসে গল্পের চকিত চমক। সংসারের কর্তব্য-সংগ্রাম নিষ্পেষিত যুবক ক্রমে জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। এখানে জীবনানন্দ সংলাপের বদলে প্রভাতের মৃত্যুসংবাদ আমাদের কাছে হঠাৎ পৌঁছে দেন— 'সারা রাত ছটফট করে সকালে বেলায় যখন সে মারা গেল তখন তার অসুখের খবরও কেউ জানে না।'

কিন্তু তার মৃত্যুতেও এই পরাজয়ের গল্প শেষ হয় না। মনে হয় প্রভাতের আকস্মিক ভয়ংকর মৃত্যুতেও নিষ্ঠুর নিয়তির আশ মেটেনি। তাই প্রভাতকে পড়ে থাকতে হয় মেসে একটি ঘরে, অন্যের বোঝা হয়ে। কারণ দিনের বেলায় মেসে সবাই ব্যস্ত নিজের নিজের কাজ নিয়ে। এক অদ্ভুত নিষ্ঠুরতার, অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে লেখক গল্পটি শেষ করেন— 'এই মেসের কয়েকটি বাবু সিগারেট আর পানের ডিবে নিয়ে রাতে তাকে পোড়াতে যাবে।'

দ্বিতীয় উপন্যাসটি হল 'মৃণাল'। প্রথম প্রকাশ ১৯৩৩-এর ফেব্রুয়ারি। উপন্যাসটিতে মৃণালের অসুস্থতা নিয়ে লেখক অনেক সময় ব্যয় করেছেন। অনেকটা একই ধরনের সংলাপ ও পরিবেশ উপন্যাসে পৃষ্ঠার পর পৃষ্ঠা জুড়ে আছে। মৃণাল রোগগ্রস্থ। করাল যক্ষায় সে আক্রান্ত। সারাক্ষণ বিছানায় সে শুয়ে থাকে। একরকম একাকী। অবশ্য তাকে দেখবার জন্য আছে এক সেবিকা, আছে এক ডাক্তার—তবুও এক বিপন্নতা মৃণালকে তাড়া করে বেড়ায়। মৃত্যু তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকে।

'মৃণাল' উপন্যাসটি জীবনানন্দের অন্যান্য উপন্যাসের চেয়ে একটু আলাদা। সাধারণত জীবনানন্দের পুরুষ চরিত্রের মধ্যে বিপন্নবোধ থাকে। হতাশা থাকে। বেঁচে থাকার যন্ত্রণা থাকে। কিন্তু কোনো নারী চরিত্রকে তিনি বিপন্নতার গভীর অন্ধকারে নিয়ে যাননি। ব্যতিক্রম মৃণাল। সে বড়োলোকের মেয়ে। একদিন বহু বন্ধু-বান্ধব তার ছিল। কিন্তু এখন সে একাকী। নিঃসঙ্গ। রোগী। বেঁচে থাকার মতো কোনো অবলম্বন যেন তার নেই। সুখের সময় যারা তার সাথে হাস্যে-লাস্যে-চাপল্যে সময় কাটাতো তারা আজ দুঃখের দিনে সরে দাঁড়িয়েছে। সমাজ-সংসারের এক রূঢ় বাস্তব ছবি জীবনানন্দ আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। অথচ মৃণালের কারো বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ নেই। সে বিশ্বাস করে, 'পৃথিবীতে সুন্দর কোনোদিন শেষ হয় না।' চলমান সভ্যতার সবকিছুর মধ্যে সে সুন্দরকে দেখতে পায়। সামান্য প্রাণী, 'মাছি'র মধ্যে সে প্রাণ চঞ্চলতা খুঁজে পায়। লক্ষণীয় উপন্যাসে জীবনানন্দ বারেবারে 'মাছি'র অবতারণা করেছেন। মনে হয় মাছির ক্ষীণজীবী জীবনের সাথে 'মৃণালের' ক্ষণিকের জীবনকে তুলনা করবার জন্যে লেখকের 'মাছি' প্রসঙ্গের সৃষ্টি।

সত্যি কি, মৃণাল জীবনানন্দের অন্যান্য নারীদের থেকে আলাদা। সাধারণত জীবনানন্দের নারী কারো মা বা কারো স্ত্রী। তার সন্তান আছে। সংসারে বেকার স্বামী আছে। স্বামীর রোজগারের প্রতি সে সন্তুষ্ট নয়। তাই স্বামীকে সে ভালো চাকরি করতে বলে। সংসারের প্রতি যথাযথ দায়িত্ব পালন করতে বলে। সেখানে মৃণাল সম্পূর্ণ আলাদা। সে অবিবাহিত। রুগ্ন। মৃত্যু তার শিয়রে দাঁড়িয়ে। সেও ভেবেছিল বিয়ে করবে, সংসার করবে, সন্তান পালন করবে। কিন্তু বিধাতার হয়ত সেই ইচ্ছা ছিল না। তাই তার সংসার হয়নি। কিন্তু এর পরেও সে আনন্দ খুঁজে পায় অন্যের ভালোবাসা দেখে, অন্যের সংসার দেখে। মৃণাল বলে, ''ভেবেছিলাম বিয়ে করবো, মানুষের মতো একটি সন্তান রেখে যাব। কিন্তু পৃথিবীতে কত মানুষ দাম্পত্য জীবন চালিয়ে শান্তি পাচ্ছে, কত মানুষের কত সুন্দর শিশু হয়েছে, ভেবে নিল হল, আমি সেই বধূ, সেই সব শিশু আমারই।''

এর পরেই এল জীবনানন্দের সেই চকিত চমক। মুহূর্তের মধ্যে তিনি আমাদের মৃণালের মৃত্যুসংবাদ দিলেন,— 'পরদিন সকালে মৃণালের কাছে আর গেলাম না। দুপুরেও না। সমস্ত বিকালটাও বিছানায় কুড়েমিতে বিমূয়তার অবসাদে কাটিয়ে দিলাম। সন্ধ্যার সময় মৃণালদের বাসায় গিয়ে অমলার সঙ্গেই প্রথম দেখা। সে বললে— ''বেলা বারোটার সময় মৃণালের দাহ শেষ হয়ে গেছে''।' —এক নিভৃত মৃত্যু আমাদের বিহ্বল করে। যদিও পাঠক এই মৃত্যুর সংবাদ শুনতে প্রস্তুত ছিল। গল্পের শুরু থেকেই একটা মৃত্যুর গন্ধের সাথে পাঠক পরিচিত। তবুও হঠাৎ মৃণালের অকাল মৃত্যু আমাদের ব্যথিত করে। ব্যথিত হই সমাজের এক শ্রেণির মানুষের নিষ্ঠুর উপহাস ও বিদ্রূপ দেখে। একজন অসহায়, শয্যাশায়ী, পথের যাত্রী নারী যখন অন্যের সাথে আন্তরিক ঐকান্তিক কথা বলে তখন তাকে নিয়েই হাসাহাসিতে আমরা বেদনা অনুভব করি। তার বেঁচে থাকার ইচ্ছা অন্যের কাছে হাস্যাস্পদ হয়ে ওঠে— ''আপনি খেপেছেন, আজ বাদে কাল মরে যাবে, সে খাবে আবার বেঞ্চে।'' এই অবজ্ঞা আমাদের কম বেদনা দেয় নি। আমাদের চেতনা ও মানবিকতাকে কি আড়ষ্ট করে না যখন অমলা বলে— ''সারাদিন ব্যানার্জির কাছে কত কি হাবিজাবি বলে, দিনের মধ্যে একশোবার করে আংটি বদলে বিয়ে করে ডাক্তারের সঙ্গে। ডাক্তার আমাকে সব এসে বলে। এই ড্রইংরুমে বসে আমরা দুজনে হেসে খুন হই।''—এই নিষ্ঠুর উপহাস, অবজ্ঞায় জীবনানন্দের বহু নায়ক-নায়িকা ক্রমশ একা হয়ে গেছে, কেউ হারিয়ে গেছে মৃত্যুর কৃষ্ণসাগরে। কেন এত মৃত্যু আর কীভাবেইবা সেই মৃত্যুগুলি ঘটে, এবং এই মৃত্যুর কি সত্যিই প্রয়োজন ছিল — তার কোনো সূত্র যোগ্যতর কেউ যদি বার করতে পারে, আমি ভাবিকালের অপেক্ষাতেই রইলাম।

উত্তরের লোকায়ত সমাজে প্রবাদ-প্রবচন

সুনয়নী বিশ্বাস*

উত্তরবঙ্গের রাজবংশী ভাষিকগোষ্ঠী বিভিন্ন লোকসংস্কৃতির আঙ্গিক নিয়ে এক বিশাল লোকসাহিত্যের ভাণ্ডার গড়ে উঠেছে। এই লোকসাহিত্যের ভাণ্ডারে প্রবাদ-প্রবচন একটি অভিন্ন অঙ্গ। প্রবাদ-প্রবচনের উপরে বাংলা সাহিত্যে অসংখ্য গ্রন্থ যেমন রচিত হয়েছে তেমনি গবেষণা হয়েছে প্রচুর। তবু সারা বাংলাতে উত্তরবঙ্গ বলুন কি দক্ষিণবঙ্গের কথাই বলুন এখনও প্রচুর সংগ্রহ সমীক্ষার কাজ চলছে এবং ভবিষ্যতেও চলবে। আমি ব্যক্তিগতভাবে উত্তববঙ্গের লোকসাহিত্যের অনুরাগী। তাই নিজস্ব সংগৃহীত এবং বন্ধু-বান্ধবগণের বাছাই কিছু প্রবাদ-প্রবচনের নমুনা তুলে ধরলাম এই ক্ষুদ্র নিবন্ধে। প্রবাদ-প্রবচনের ওপর যে শিক্ষা ও নীতিকথায় একজন আদর্শবান শিক্ষানুরাগী হবার ক্ষেত্রে যথেষ্ট পরিমাণে শিক্ষার উপাদান রয়েছে। তাই এই প্রবাদগুলি বর্ষীয়ানগণ অধিক পরিমাণে মান্যতা দান করেন। সেই দিক থেকে মনে হয়, সমাজের সকল মানুষের এই বিষয়ে মনোযোগী হওয়া বাঞ্ছনীয়। এবার প্রবাদের বর্ণনায় আসা যাক—

* কামলায় পোষে / ধৌলি বেটি চোষে।

অর্থ : ভূসম্পত্তিওয়ালাদের কৃষি চাষবাসে নিযুক্ত কামলারা বড়ো সহায়ক শক্তি। তাদের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধির ক্ষেত্রেও কামলা অপরিহার্য। এহেন পরিবারে ধৌলি বেটি মানে বিলাসিতাপূর্ণ ও অমিতব্যয়ী কন্যা থাকে তো এমন সংসারে জীবিকা নির্বাহের ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকতা দেখা দেয়।

* আগের ন্যাকান নাইরে নাথো / নাথো এ্যালা হইচে অন্য মতো।

অর্থ : এই প্রবাদটি দুই-এর অধিক স্থানে ব্যবহার করতে দেখা যায়। (১) অন্যের উপকার পেয়ে উপকৃত ব্যক্তিটি ভাগ্যক্রমে অধীক পরিমাণে ধনশালী বা বিদ্বান, এক্ষেত্রে উপকারীকে অস্বীকার করলে প্রবাদটি ব্যবহৃত হয়। (২) এক নায়ক নায়িকার জীবনযুদ্ধে প্রস্তুতির ক্ষেত্রে এরা একে অপরের পরিপূরক। দেখা গেলে এই দুইয়ের যেকোনো একজন বিচ্ছেদ ঘটিয়েছে। এখানে বিপলেব্ধা বা বিপ্রলব্ধের খেদোক্তি এই প্রবাদটি।

* বামন নাউয়া পর খায়।

অর্থ : সামাজিক ক্রিয়ায় বামন ও নাউয়া (নাপিত) বিনা পরিশ্রমে কিছু উপঢৌকন পেয়ে থাকে। এক্ষেত্রে এরা পরশ্রমজীবী বলে প্রবাদটি রচিত হয়েছে।

* বোয়া বাড়ির ঢ্যারাই।

অর্থ : এক প্রকার আঁশযুক্ত মাংসল মাছ। এই মাছের বহুল প্রকার নাম আছে— খৈরকাটি, ভ্যাদা, ভেটকি প্রভৃতি। চটকা জাল উত্তোলনকালে আরাম করে চিত হয়ে শুয়ে থাকে। মৎস

* শিক্ষিকা, খাদিমপুর গার্লস হাইস্কুল, বালুরঘাট।

শিকারী ধরে তাকে খলাই বন্ধ করে রাখলে এই মাছ তখন আত্মরক্ষার জন্য লাফাতে থাকে। বোয়া ক্ষেতে মাছ ধরার জন্যে জলসেচ দিলে এই ঢ্যারাই মাছ বোয়ার বোয়ার থোপের শিকারগুচ্ছ অথবা বোয়ার থোপে লুকিয়ে থাকে। এক্ষেত্রে মৎস শিকারীদের এই মাছ ধরার কাজটা অনায়াসলব্ধ হয়। এজন্য এই জাতীয় গোবেচারা কোনো কোনো নিরীহ লোকের ক্ষেত্রে প্রবাদটি প্রয়োগ করা হয়।

* চিনা বামনক পৈতা লাগে না।

অর্থ : কথায় বলে বৃক্ষের পরিচয় তার ফলে। ব্রহ্মজ্ঞানী বামন মাত্রেই সহজে সমাদৃত হন লোকসমাজে। এক্ষেত্রে তার স্বাতন্ত্র্য রক্ষার জন্য পৈতা নিষ্প্রয়োজন।

* টারির মানসি বাদী হৈলে টারিত থাকা না যায় / বাড়ির মানসি বাদী হৈলে ভাতে খাওয়া না যায়।

অর্থ : বৈরীমূলক আচরণবিশিষ্ট মানুষের পাড়ায় বাস করা যেমন অসম্ভব, তেমনি বাড়ির লোকের সঙ্গে এতদৃশ বৈরীমূলক সম্পর্ক তৈরি হলে বিপদ অবশ্যম্ভাবী।

* কাষ্ঠের পুতুরা না করে আও / পরার পুতে না জুড়ায় গাও।

অর্থ : নিমাই যখন সন্ন্যাসে যায় তখন মা শচীমাতা কেঁদে কেঁদে আকুল— বাছা নিমাই না যাইয়ো সন্ন্যাসে / ঘরে আছে মাও বিষ্ণুপ্রিয়া তারে দেখি মাও জুড়ায় হিয়া। ছেলের প্রতি মায়ের আপত্যস্নেহপ্রতিম ভালোবাসা। অপরদিকে ছেলের মায়ের প্রতি ভক্তি সেখানে পরমাতা যে কাষ্ঠসদৃশ। সহজে প্রতীয়মান এই দৃশ্য থেকে প্রবাদটির উদ্ভব ঘটেছে। ৭০।*

* চাষার মুখ খাউপসা / বিলাইক্ ডাকায় মাউসা।

অর্থ : চাষা এখানে হিতাহিত জ্ঞানশূন্য ব্যক্তি, যে আচরণবিধি বিষয়ে মূর্খ তাকে কীভাবে সম্বোধন করতে হয় তা জানে না ।

* নদী নোমায় ছোটো / নারী নোমায় খাটো।

অর্থ : কোনো বস্তু বা প্রাণীবিশেষের পরিমাণগত অবস্থান দেখে তার সার্বিক সারবত্তা বিচার করা যায় না, যেমন যান না নারী তার যৌবনদান করতে সে কতটা কর্মক্ষম ও নদীর শরীরী গঠন দেখে তার গভীরতা মাপা যায় না।

* নারীর বুক ফাটে ত্যাও মুখ ফোটে না।

অর্থ : ছয় রিপুর মধ্যে কাম রিপু বড়ো ক্ষতিকারক। রিপুর তাড়না যতই প্রকট হয়ে উঠুক মাতৃজাতি এই বিষয়ে পুরুষকে বহু পেছনে ফেলে নারী বহু উপরে আসীনা।

* মনোত আছে অন্তরত নাই / কী করে চৈতন্য গোঁসাই।

অর্থ : মন, অন্তর আর চৈতন্য তিনটি শব্দ প্রায় একার্থ বোধক তবু এখানে এই শব্দ তিনটি ভিন্ন অর্থে প্রয়োগ করা হয়েছে। তার ব্যাখ্যা নিচে দেওয়া হলো—শিমূল গাছের ডালগুলো কেটে ফেললে ডালের পাকাকলাগুলোর তুলো সংগ্রহ করতে পারবো। এই মনোভাবটাই 'বোধ' বা 'মন'। কিন্তু এই 'বোধ' নিস্তেজ থাকায় শিমূলের ডালও কাটা হয়নি তার কলার তুলোও

সংগ্রহ করা যায়নি। মন হচ্ছে বৃক্ষ সদৃশ, তার দেহে জীবনদায়ী ফলও আছে। অর্থাৎ যে ফল খেলে মানবদেহে অন্তর-চেতনা ফিরে আসে। অন্তর বা চেতনার আর এক নাম জ্ঞান। প্রবাদটির নির্গলিতার্থটি হল বস্তুই আদি চেতনা তৎপরবর্তী।

* হাতে-মুখে দৈ / তবু করে কৈ কৈ।

অর্থ : চোরের কৃতকর্মের চিহ্ন তার হাতে-মুখে বর্তমান। অথচ সে অস্বীকার করছে, অর্থাৎ চোরের কৃতকর্মটিকে অস্বীকার করাই তার কাজ।

* সুদিনের সাগাই সজ্জন / আনদিনে ঠন্ ঠন্।

অর্থ : সমাজের প্রতিষ্ঠিত যাঁরা তাঁদের অনেকের সাথে পরস্পরের আত্মীয় সেজে নিকটতম আত্মীয় হওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে। এরকম ব্যক্তি বিপদাপন্ন হলে তখন তার পাশে কেউ থাকে না। পল্লীগীতিতে একটা গানে কলি এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে— যখন তোমার কেউ ছিল না / তখন ছিলাম আমি / এখন তোমার সব হয়েছে / পর হয়েছি আমি।

* কপাল পৈড়লে খালোত / নাউ ওঠে না চালত, / যদিওবা ওঠে চালত / ফল ধরে না ডালত।

* নয়া নয়া বথুয়া শাক / নুন ত্যাল পায় / বুড় হৈলে বথুয়া ছুয়া বাড়ী যায়।

অর্থ : ওপরের প্রবাদ দুটির অর্থ একই। কোনো মানুষের ভাগ্যে যখন বিড়ম্বনা ঘটে, চালে উঠতে না পারা লাউগাছের মতোই অবস্থা হয়ে দাঁড়ায়। যদিওবা চালে ওঠে তো তার ডালে ফল দেখা যায় না। হতভাগ্য মানুষের বিড়ম্বনার কথাই বলা হয়েছে এখানে।

* বাপ থাকি ব্যাটাই সিয়ান / পুছি পুছি নেয় গিয়ান।

অর্থ : এই প্রবাদটিতে দুটি ভাবার্থ ব্যক্ত করা হয়েছে। প্রথমটি ঘৃণ্য ব্যক্তির পুত্রের অধিকতর কপটতার কথা বলা হয়েছে। আর দ্বিতীয়টি ভালো অর্থে। বাবা সৎ, নিষ্ঠাবান ও জ্ঞানী মানুষ। এমন লোকের পুত্র বাবার জায়গাটি অতিক্রম করে ফেলেছে। এমন প্রজ্ঞা ও জ্ঞানবান পুত্রের কথাই বলা হয়েছে এই প্রবাদে।

* যদি থাকে মনে সাধ / থাউক না ক্যানে দ্যাশের কোণাত।

অর্থ : সংসারে আপনজন ব্যক্তিমাত্রেই সকল সময়ের জন্যই তিনি কাছে থাকেন। কোনো নিকটতম আত্মীয় বিপদে পড়লে আত্মার আত্মীয় যিনি তিনি দূরে থাকলেও বিপদে অগ্রসর হবেনই।

* যদি পাইলং হাতে / হারাইলং তাক ধুইতে।

অর্থ : অনেক সময় দেখা যায় কোনো মৎস শিকারী ডোবা বা খাল থেকে একটা বড়ো শোল মাছ ধরেছে। দেখা গেল ডোবার জলে মাছটাকে ভালো করে ধুয়ে পরিষ্কার করে নেওয়ার সময় মাছটা হাত থেকে পিছলে ছুটে গিয়েছে। অনেক কষ্টে যাকে অর্জন করেছে দেখা গেল অসাবধানতায় কষ্টার্জিত ধনটি সম্পূর্ণ হাতছাড়া হয়ে গেল, এমন অপদার্থের জন্য প্রবাদটি রচিত।

* পাপের ধন টিয়ায় খায় / পাপের কথা বাপেই কয়।

অর্থ : অন্যায় করে অর্জিত ধন চিরস্থায়ী হয় না। একদিন না একদিন তার অবলুপ্তি ঘটবেই। এমনই ছেলের অন্যায়ের কথা অনকে সময় বাপের মুখ দিয়ে ফসকিয়ে যায়।

* গুণ থুইয়া মরে নারী / তার জৈনে কান্দে বছরচারি।

অর্থ : গুণবতী মানুষ নারী হোক বা পুরুষই হোক লোকসমাজমনে সে অমরত্ব লাভ করে।

* প্যাত্তি কী জানে ঘিত্তের মূল / বাঁদী কী জানে সোনার ফুল।

অর্থ : প্যাত্তি মানে প্রেত, নরকস্থ প্রাণী। প্রেতাত্মা — যে ব্যক্তি মৃত্যুর পর ভূত হয় এই অর্থে। প্যাত্তি চলতি বাংলায় পেত্নি বলা হয়। বাঁদী — চাকরাণি, প্যত্তি ও বাঁদী এরকম অধম ব্যক্তির পক্ষে ঘি ও সোনা চেনা অসম্ভব।

* কৈনার মাও কৈনাক চাটায় / মোর বেটি ঘাটা পাকায়।

অর্থ : চাটায় - প্রশংসা করে। ঘাটা পাকায় - ফোকতানি রাঁধে। কনের গল্প করের তার মেয়ে বড়ো রাঁধুনী। মেয়ের উন্নতমানের ব্যঞ্জনাদি রান্না করবার কথা না বলে, বলে - ঘাটা পাকা বা ফোকতানি রান্না করবার কৃতিত্ব প্রকাশ করে এই অর্থে।

* চুল থাইকলে বান্দে / গুণ থাইকলে কান্দে।

অর্থ : সমাজে যাঁরা মানুষের জন্য অবদান রেখে যান বা যার অবদান রয়েছে তার প্রতি মানুষ সর্বদাই শ্রদ্ধাশীল।

* মাও নাই নাইয়োর যাইয়ো না / গুড় নাই পিঠা খাইয়ো না।

অর্থ : মা না থাকলে পিত্রালয়ে বেটির কদর যেমন থাকে না, তদ্রূপ গন্তব্যস্থলে যাওয়ার আগে এই প্রবাদটি সতর্ক করে দিচ্ছে - মাতৃশূন্য পিত্রালয় সদৃশ গন্তব্যস্থল হলে গমনকারীকে সেখানে না যাওয়ার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

* তোক কওয়ার আছে মোক কওয়ার নাই / তোর যেকনা যেকনা আছে মোর এ্যাকনাও নাই।

অর্থ : অর্থবান মানুষ অপেক্ষাকৃত দুর্বলকে বড়ো করে তুলবার ভান।

* কু-পুত্তুরক দিলে ধন / দিনে দিনে বাড়ে পতন। / সু-পুত্তুরক দিলে ধন / ত্যাঞো বাড়ে তার ছালায় উমান।

অর্থ : বুদ্ধিমান সুপুত্র আপন যোগ্যতায় সে একাই একশো। সেখানে অন্যের সম্পত্তি বিষয়ে তার কোনো লোভ নেই।

* সময় চিনি যে বান্দে আইল / ধুতরা পুঁটি কয়বা পোচে খায় তায় শৌল আর বোয়াল।

অর্থ : জমিতে চারা রোপণ করতে হলে জমির উর্বরা শক্তি বৃদ্ধির লক্ষ্যে ও জলধারণ ক্ষমতা মজবুত রাখতে জমির আল যে কৃষক পাকাপোক্তভাবে বেঁধে নেয়, সে জমির ফসলও কৃষক ষোলোআনাই ঘরে তোলে। কৃতকর্মা কৃষক মাত্র শুধু ভাত খায় না, সে দুধ-ভাতও খায়।

* মানসি না গুনি বাটলোং প্রসাদ / কাঙাল হৈয়া শুধু গুণে প্রমাদ।

অর্থ : উদারচেতা মানুষ মাত্রেই পরসেবার কাজে সর্বদাই নিবেদিত। কাঙাল এখানে কৃপণকে বলা হয়েছে।

* কোদালে কুড়ালে ঘাঙ / মাঝে মাঝে বইছে বাও / চাষিভাই বান্দো আইল / আজি না বষ্যিলে বষ্যিবে কাইল।

অর্থ : এই প্রবাদটি বিজ্ঞান অনুসারী। দক্ষিণ-পশ্চিম মৌসুমী বায়ু প্রবাহিত হচ্ছে। যা কোদালের অগণিত আঘাতে ভূপৃষ্ঠের মাঠ যেখানে খাপছাড়া এরকমই খাপছাড়া বা কাটা কাটা মাটির ন্যায় আকাশে অসংখ্য খণ্ড খণ্ড মেঘ জমে আছে। এরকম দৃশ্য কৃষক দেখলে তারা ধরে নেবে ২৪ ঘন্টার মধ্যে বৃষ্টি অনিবার্য। ধানের চারা রোপণের জন্য জমিতে জল সংরক্ষণের প্রয়োজনে কৃষক অগ্রিম আল তৈরি করে নেয়। কৃষকগণ এখানে বিজ্ঞানী না হলেও তাদের অভিজ্ঞতার ফসল বিজ্ঞান অনুসারী এই প্রবাদটি।

তথ্যসূত্র ও সহায়ক

১। রাজবংশী লোকসাহিত্যের গবেষক রমণীমোহন বর্মা, কালবৈশাখী, বেলা বর্মা, সংখ্যা ৫ ও ৬, ২০১৪

২। তদেব, কালবৈশাখী, সাধনা অধিকারী, ৩১.৪.১৪, সংখ্যা ৮

ষাট পূজা ব্রতকথা

কাকলী সরকার*

নাগরিক সভ্যতা তেমন কোনো উল্লেখযোগ্য প্রভাব বিস্তার করতে পারেনি। সে রকমই একটি রক্ষণশীল অঞ্চল উত্তরবঙ্গ। এই রক্ষণশীলতার জন্য এখানকার মানুষদের বিশেষত নারীদের আচার, আচরণের মধ্য দিয়ে বহু প্রাচীন যুগের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক উপকরণের সন্ধান পাওয়া যায়। উত্তরবঙ্গের নারীদের দ্বধ্যে প্রচলিত ব্রতগুলির মধ্য দিয়ে এখানকার নারী সমাজের মনের আশা আকাঙ্ক্ষা, সুখ-দুঃখ, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির হদিশ পাওয়া যায়। প্রত্যেকটা ব্রত কথারই কোনো না কোনো একটি উদ্দেশ্য থাকে। যেমন - স্বামী লাভ, সন্তান লাভ, শস্য লাভ, বিত্ত লাভ, হারানো ধন ও জনের পুনঃপ্রাপ্তি ইত্যাদি। ব্রতকথা খুঁটিনাটি বিষয়ে যদি কোনো পরিবর্তন হয়, তবে এই উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয় না। তাই ব্রতকথা পরিত্যক্ত হলেও, কখনো পরিবর্তিত হয় না।

সংসার ও স্বামীর ভবিষ্যত ভাগ্য নির্ধারণ ও মঙ্গল কামনার ব্রতকথা, ষাট পূজা। জ্যৈষ্ঠ পূজা। জ্যৈষ্ঠ মাসের শেষ চারদিন ও আষাঢ় মাসের প্রথম তিনদিন — এই সাতদিনের ব্রত উদ্‌যাপন —ষাট পূজা। যে নারীরা এই ব্রত পালন করেন তাদের পূজা শেষ হয় ৩রা আষাঢ়।

ব্রতপালন শুরু হওয়ার সাতদিন আগে থেকেই নদীর কাছাড় থেকে বা নদীর জলের তল থেকে চিকনা মাটি (এঁটেল মাটি) তুলে বাড়িতে নিয়ে আসা হয়। তারপর ঐ মাটি শুকিয়ে গুড়ো করে ধুলো করা হয়। ঘরের কোনো একটি স্থান নির্বাচন করে লেপে-পুঁছে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে, ধোয়া-মোছা একটা কাঠের পিঁড়িতে এই ধুলো করা মাটি ছড়িয়ে-ছিটিয়ে মোটা আস্তরের মতো করে দুই আড়াই ইঞ্চি পুরু করা হয়, তারপর ঐ পুরু আস্তরের উপর বার শস্য ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এরপর পিঁড়ির মাঝখানে আমের পল্লব দিয়ে মাটির ঘট স্থাপন করে, ঘটের পাশে একটি কাটারি ও একটি শাঁখা দেওয়া হয়।

ঘটের ভিতর জল ঢেলে দিয়ে আমের পল্লব বসিয়ে চারদিকে জল ছিটিয়ে ঘট, শাঁখা ও কাটারিতে সিঁদুর দিয়ে দুধ, কলা ফল-মূল নৈবেদ্য দিয়ে পূজা আরম্ভ করা হয়। সাত দিন ধরে এইভাবে পূজা করা হয়। শেষের দিন পূজা শেষ করে ষাটের পিঁড়ি ঘরের বাইরে বের করে আনা হয়।

সাতদিনের বপন করা শস্য কীভাবে গজিয়ে উঠেছে তা দেখে গৃহস্থ নিজেদের ভবিষ্যত সম্বন্ধে আঁচ করে নেয়। শস্য যদি সুন্দর সমানভাবে গজিয়ে বেড়ে ওঠে; তবে সংসারের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল। এর অন্যথা হলে শস্য গজানোর গতি-প্রকৃতি লক্ষ করে অনাগত সুখ-দুঃখের কল্পনা করে নেন।

ব্রতকথা বলার সময় ব্রতী নারীরা তুলসী পাতা হাতে নিয়ে শুদ্ধ চিত্তে বসে ব্রতকথা শোনেন। ব্রত শেষে বলা হয়—

* গবেষিকা, বাংলা বিভাগ, উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়।

ছুরি কাটারি জাগো ঝাঁকে ঝাঁকে নাগো
জুরাইলে পাই মরিলে জীয়াই
দুপুরি আগুনে য্যালায় স্যালায় নিবাই।

এরপর ঘটে জল দেওয়া হয় ও উলুধ্বনি দিয়ে ব্রতকথা শেষ করা হয়।

ব্রতকথা : উক্নাই আর উক্নাইর ভাউজ। দুই জনে যেইল ষাটের মাটি তুলির বাদে। উদিয়া এক বামনার বেটা-ছত্রকাকই। পড়াশুনা না করে, খালি খেলাখেলি বেড়ায়। খেলি ঘুরি বেড়ায়, বাড়ি আইসে খায় আরো খেলির যায়। এইল্লা শুনতে শুনতে বামনা একদিন বামনীক্ কয় - ' হৈর বামনী আইজ যেদি ছত্র কাকই পড়ি আইসে তবে হইলে ভাত দিবু। আর যেদি খেলা খেলেয়া আইসে উয়াক্ দিবু ছাই।'

ছত্রকাকই তো খ্যালায়া আইচ্চে। মা জননীর পরাণ ক্যাং করি হাতোত্ ধরি ছাওয়াটাক্ ভাতের বদ্লি ছাই দেয়। কত্তাক্ তো কিরা দিছে এলা কী করে ... ছাওয়াটাক্ ভাত দিয়ে এক কানিত্ এক্না আংরা দিছে। আংরা দেখিয়া ছত্রকাকই কয় — 'মাও ভাতোর ক্যানে আংরা'। মাও কয়— 'তুই আংরা কোনা ফ্যালে খা। তোর বাপো না কইছে —খ্যানে আইসলে ছাই দিবু তা ক্যাঙ্ করি ছাই দেঙ্। তুই আংরা কোনা ফ্যালে খা।' ছত্রকাকই কয়—'পিতা হামাক্ ছাই দিবার কইচে? মুই ভাত না খাঙ্।' এই কথা কয়া ছত্রকাকই ছাতা আর খড়ম জোড়া ধরিয়া বাড়ি হাতে বিড়াইল। যাইতে যাইতে ছত্রকাকই একনা নদী পাইল। নদীর পারত্ একনা শিম্লার গছ। গছের গোড়াত যায়া হইল দম ধরিরি বাদে।

খাড়া হইল্ যদি তা হাতের ছাতা কোনা চারে দিয়ে গছের তলত্ বসিল। দূর থাকি ভাউজ নজর করিয়া দেখিয়া উক্নাইক কয় — 'এটা মানষীটা কেমন দেখ, গোটায় ঘাটা খান্ চন্চনা রৌদ মাতাত্ করি আসিল, আর গছের তলোত্ আসিয়া ছাতাটা চারে দিয়ে বসি।' 'ও তোমরা বোঝেন নাই' - উকনাই কইল। 'গছের তলোত্ যে ছাতাটা চারে দিয়া বসিল। গছ থাকি পখী খেদু হাগি দেয়, গাওখান যে ছুয় হইবে। ফির আরও গাও ধোয়া খাইবে। আরো নদী যাওয়া খাইবে।'

এই কথা কইতে উকনাইর ভাউজ কয়—'দেখো দেখো এলা ছাতাকোনা মোজেয়া বলোলোত্ নিয়া নদীর কিনারত্ যায়া খড়ম জোড়া পিন্দিল, পিন্দিয়া নদীত্ নামিল্, নদীত্ নামিয়া নদী পার হয়া গেইল। ফির ওপার উঠিয়া খড়ম জোড়া খুলি হাতোত্ নিল। হোর মানষীটা শকানোত্ আসিল খালি ঠেঙগত্ কেমন?' উক্নাই কয় —'ভাউজী তুঁই বুঝির পাইস নাই? জলের তলোত্ খোঁচা গাজা থাকির পায় ঠ্যাঙগত্ নাইগ্বে দেখি খড়ম পিন্দিচে।'

ছত্রকাকই নদী পার হয়া যায়। যাইতে যাইতে এক বাম্নার বাড়ী পায়। বাম্নার বাড়ী যায়া দেখে একনা বুড়া বামন বসে আছে। তখন বুড়া বাম্নাক্ কয় — 'ঠাকুর তোমরা মানসী রাখিবেক'। বুড়া বাম্না কয় — 'রাখিলেং হয়-মানসী তো রাখা খায় যেদি উক্নাইক্ পড়াইলেক্ হয়।' ছত্রকাকই কয় — যদি কাঁও পড়ে তাকো পড়াই — আর যদি কাঁও পড়ায় হামরা পড়ি।' ছত্রকাকইর কথা শুনি বাম্না ক্ষিব ভান পাইল। খুশী হয়া ছত্রকাকইক্ রাখিল। রাখিল যদি তখন ছত্রকাকই ঐ

উক্‌নাইক্‌ লেখাপড়া শিক্ষা দেয়। দিন গেইল বাম্‌না উকনাইক দিয়া ছত্রকাকইর বিয়ো করাইল। আরো দিন কেইলে ছত্রকাকই উকনাইর একনা পুত্র ছাওয়া হইল। ছত্রকাকই কয় - 'মুই এলা বাড়ী থাকি ঘুড়ি আইসোঙ্‌ যায়া ঐ কয়টা দিন তোমরা এইটে থাকি থাকো।' উক্‌নাই কয় — 'না, - না থাকঙ্‌ মুই। গেইনে কালে দোনো ঝনে যামো।'

উক্‌নাই ইদিয়া আরো পোয়াতি হইচে। বাচ্চা ছাওয়া ধরিয়া উক্‌নাইক্‌ ধরিয়া ছত্রকাকই বাড়ী বুলিয়া মেলা করিল্‌। আধখাটা যাইতে ফির ঐ নদী আসিল্‌। বাইয্যা কাল নদীর হুমা ও পানি দেখিয়া দোনোঝনে চিন্তা করে কেমন করি দরিয়া পার হয়। উক্‌নাই কয় না যাই, চল ফিরি যাই। এদিকার মধ্যে এক সদাগর ডিঙি ধরি যায়। ছত্রকাকই ভাবে - যেদি ডিঙিখান পাইলোঙ্‌ হয় ... ভাবিয়া চিন্তয়া ছত্রকাকই সদাগরোক্‌ কয় - 'সদাগর মশাই হামরা গেইলঙ্‌ হয় ... কিছু টাকা পাইসা দিলোঙ্‌ হয় ... হামার গুলাক্‌ পার করি দিলেন হয়।'

সুবুদ্ধি আছিল ছত্রকাকইর কুবুদ্ধি খর্কি
কুবুদ্ধি ছত্রকাকই সদাগরের ডিঙিগত্‌উ
কিনার না চাপে নৌকা মধ্যে মধ্যে যায়
অর্দ্ধ ঘাটা যায় সদাগর ছত্রকাকইর হদ ঠেং বান্দে
মধ্যে নদীত যায়া সদাগর ছত্রকাকইক্‌ জলে ফেলি দেয়।

উক্‌নাই দেখিয়া কাটারি কোনা হাতোত্‌ নিচে। কাটারি ধরি হাতের শাঁখাত ছোয়েয়া কাটারিক্‌ কয়—

ছুরি কাটারি জাগো ঝাকে ঝাকে নাগো
হারাইলে পাই মরিলে জীয়াই
দুপুরি আগুন য্যানা য্যানা নিবাই

যাঃ - কাটারি যা।

বলিযা যেইটে ছত্রকাকইক্‌ ফেলাইচে ঐটে। কাটারি ফ্যান ঢ্যানে ফ্যানে দিল। কাটারি যায়া বসিল ছত্রকাকইর বুকে। দাঁত দিয়ে ধরিয়া কাটারি ছত্রকাকই হাতের বন্ধন কাটে। হাতের বন্ধন কাটিয়া হাত দিয়া ধরিয়া কাটারি ঠ্যাঙ্গোর বন্ধ কাটে। টেঙ্গের বন্ধন কাটিয়া ছত্রকাকই জলে ভাসিয়া ডাঙ্গাত উঠে। ডাঙ্গাত্‌ উঠিয়া ছত্রকাকই দেখে নৌকা নাই ঘাটে। যায় ছত্রকাকই এক গাছ বিরিক্ষের তলে। যায়া মাথাত্‌ হাত দিয়া চিন্তা করে।

কয়েক দূরে হাত সদাগর কতেক দূরে গেন
আর কতেক দূরে গেইতে সদাগর আপনার মহল পাইন।

ঘাটে নামিল সদাগর। ছাওয়া ধরি উক্‌নাই উক্‌নাই নামে, নামি কয়—

শুন শুন সদাগর আমার উত্তর।
এই বার বচ্ছর থাকমো হামি এই ঘাটের উপর।।
তাই বুলি তোমরা আমাক্‌ পরশ করির পারবেন না।
এই আমার প্রতিজ্ঞা, তোমরা সত্যা ভাঙ্গোন না।।

সদাগর এলা কী করে, ভাবিয়া চিন্তিয়া নদীর পাড়ত একনা ঘর বান্দি দিল। টাকা পাইসা দিল। উক্‌নাইক্ রাখিয়া মনের দুঃখে মহল বুলি চলি গেল।

উদিয়া ছত্রকাকই যে গাছের তালোত্ বইচ্চে, সেই রাজ্যের রাজা নাই। রাজা বিনে হাহাকার। অতঃপর ছত্রকাকই রাজা হয়। রাজার জ্ঞাতীগণ কয়— পাট হস্তী আন, পাট হস্তী ছাড়, যাক্ ধরি আইসে আসুক তায় হৈবে রাজা। পাট হস্তী ছত্রকাকইক্ নিয়ে আসে।

কতেক দূর হাটে হাত্তী কতেক্ দূর যায়।
আরো কতেক্ দূর গেইতে ঐ বিরিক্ষের না গাইল পায়।
সিদা যায়া হাত্তী ঐ গছের গোড়ে খাড়া হইল।
ছত্রকাকাইর গালাত্ মাল্য দিয়া পিঠিত্ তুলি নিল।।

ছত্রকাকই রাজসিংহাসনে বসিল। ছত্রকাকইর মনে কিন্তু শান্তি নাই মোটে। প্রাণ কান্দে উক্‌নাই আর বাচ্চা ছাওয়ার বাদে। ছত্রকাকই পাট হাত্তীর মাথাত্ হাত দিয়া কয়—

শুন শুন পাটহস্তী শুন মন দিয়া।
কোনখানে টক্‌নাই আছে ধরো আইস যায়া।
পাটহস্তী এখানে ছুটিল উক্‌নাইর মন্দির বুলি—
কতেক্ দূর হাতে হস্তী কতেক দূর যায়
আর কতেক দূর গেইতে হস্তী উক্‌নাইর মন্দির পায়।

... উকনাইক্ নামে দিতে ছত্রকাকইক যায়া ছাওয়া ভায় উকনাইক্ বুকোত্ তুলি নেয়। উকনাই কয়—

শুন শুন শুন স্বামী কয়া বুঝাঙ্ তোয়ে।
ষাট পূজা না পূজিয়া আমি ভোজন না করি।।

ষাটের বরে উক্‌নাই সগাক্ ফিরি পাইল। ষাটের বরে উক্‌নাই ছত্রকাকইর ভাগ্য ফিরি গেইল। ষাটের বরে সগাঁয় আনন্দে দিন কাটায় ভক্তি ভক্তি ভক্তি।

উলু দিয়া মগাঁয় ভক্তি দিল। (ব্রত শেষ)

তথ্যসূত্র

১. শ্রী হরিশ্চন্দ্র পাল, উত্তরবাংলার লৌকিক ব্রতকথা

উনিশ শতকের বাংলা প্রবন্ধে অন্দরমহল ভাবনা

প্রণব নস্কর*

'প্রবন্ধ' শব্দের অর্থ প্রকৃষ্টরূপে বন্ধন। ভাবের সংহতিতে যুক্তি(র বন্ধনে চিন্তামূলক একটি নির্দিষ্ট বক্তব্যকে মিতায়তন গদ্যশিল্পের মাধ্যমে অনিবার্যতায় প্রকাশ করাই প্রবন্ধের মূল উদ্দেশ্য। উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকেই বাংলা প্রবন্ধসাহিত্য চরম বিকাশ লাভ করে। রেনেসাঁসের বিপুল উচ্ছ্বাস উন্মাদনা, বি(বিথারী ভাবনা-চিন্তা, মননের প্রখর সমৃদ্ধি এই সময় থেকেই পরিপূর্ণতা লাভ করতে থাকে। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজ স্থাপনের পর থেকে বাংলা গদ্য-সাহিত্যে রচনা হতে থাকল অসংখ্য গদ্য(রচয়িতারা সেভাবে পাকা হাতের রচনা করতে অপারগ। তবে, তাঁরা যে সমস্ত গদ্য রচনা করলেন, তাতে বিদেশি সিভিলিয়ানদের এদেশের শি(া-ব্যবস্থা, আচার-ব্যবহার, রীতি-নীতি সম্পর্কে শি(াদান সম্ভব ছিল। রামমোহন, বিদ্যাসাগরের পর সার্থকভাবে গদ্য পরিপূর্ণতা লাভ করল সাহিত্যসম্রাট বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (১৮৩৮-১৮৯৪)-এঁর রচনায়।

২

বঙ্কিমচন্দ্র-ই তাঁর রচনার মধ্যে প্রথম দেখালেন লঘু-গু(যে কোনো ধরনের প্রবন্ধই রচনাগুণে 'সাহিত্য' হয়ে উঠতে পারে না। অবশ্য অনেক বাঙালি লেখক তাঁর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে ইতিহাস-গবেষণার গু(ভার গ্রহণ করেন। কেউ কেউ সাহিত্য-সমালোচনায় হাতও দেন, অনেকে দর্শনাদি বিষয়ে প্রবন্ধ লেখায় ব্রতী হন, কেউ কেউ আবার লঘু-কৌতুককরসের নিবন্ধ রচনা করতে থাকেন। তবে, বঙ্কিমচন্দ্রের 'লোকরহস্য' (১৮৭৪) গ্রন্থের কৌতুকরসাত্মক নকশার সংকলনের 'বাবু' এবং 'হনুমদ্বাবুসংবাদ' প্রবন্ধে উনিশ শতকের বাবু এবং তাদের অন্দরমহলের ভাবনা ফুটে উঠেছে। বলা ভালো বঙ্কিমচন্দ্রই প্রথম 'বাবু'দের সম্যক পরিচয় দিয়েছিলেন 'লোকরহস্য' গ্রন্থটির মধ্য দিয়ে। 'বাবু' প্রবন্ধটির মধ্যে দিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আজকের দিনের বাবুদের স্বভাব বৈশিষ্ট্য ও (চিগুণের পরিচয় দিয়েছেন। আর 'হনুমদ্বাবুসংবাদ' প্রবন্ধে হনুমান এবং বিদেশি বাবুর কথোপকথনে নিজ দেশ ও মাতৃভাষায় কথা বলার স(মতাকে স্পষ্টভাবে প্রকাশ করেছেন। তবে আমাদের আলোচ্য যে অন্দরমহল ভাবনা, তা এখানে খুব বেশি প্রকাশ পায়নি। 'বাবু' প্রবন্ধে বঙ্কিমচন্দ্র জনমেজয় এবং বৈশম্পায়ন-এর কথোপকথন প্রসঙ্গে বলেন

> আমি সেই বিচিত্র বুদ্ধি, আহারনিদ্রাকুশলী বাবুগণকে আখ্যাত করিব, আপনি শ্রবণ ক(ন।[১]

এমন বাক্যে যে 'আহার-নিদ্রাকুশলী' বাবুগণের পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে অন্দরমহলে

* অংশকালীন শি(ক, বাংলা বিভাগ, ফকিরচাঁদ কলেজ, ডায়মন্ড হারবার।

বাবুদের চারিত্রিক পরিচয়টুকু পাওয়া যাচ্ছে। তাঁরা আহারাদি করবার পর গভীর নিদ্রায় মগ্ন থাকতেন।

আবার, এই সমস্ত ব্যয়বহুল আরামপ্রিয় বাবুরা অন্দরমহলের গৃহিণী ও উপ-গৃহিণীর অনুরোধে বিভিন্ন দেব-দেবীর পূজা করতেন, লোভনীয় খাদ্যবস্তু ভ(ণের উদ্দেশে নারীপূজা করতেন। বঙ্কিমচন্দ্রের ভাষায় এই সব বাবুরা—

> উৎসবার্থ দুর্গাপূজা করিবেন, গৃহিণীর অনুরোধে লক্ষ্মীপূজা করিবেন, উপগৃহিণীর অনুরোধে সরস্বতীপূজা করিবেন এবং পাঁঠার লোভে গঙ্গাপূজা করিবেন।[২]

এই সমস্ত বাবুদের পরিচয় দিতে গিয়ে বঙ্কিমচন্দ্র আরও জানান

> যাঁহার গমন বিচিত্র রথে, শয়ন সাধারণ গৃহে, পান দ্রা(ারস, এবং আহার কদলী দগ্ধ, তিনিই বাবু।[৩]

এখানেও অন্দরমহলের কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়— এই বাবুদের শয়ন অর্থাৎ ঘুমাবার জায়গা সাধারণ গৃহে এবং আহার কদলী দগ্ধ অর্থাৎ কলা পোড়া। এইসব প্রসঙ্গ অবশ্যই অন্দরমহলের পরিচয়বাহী। এই বাবুদের জীবনের প্রতিটি (ে ত্রে অবস্থার ভিত্তিতে 'বুদ্ধি' ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অবস্থান করে। যেমন—

> বুদ্ধি বাল্যে পুস্তকমধ্যে, যৌবনে বোতলমধ্যে, বার্দ্ধক্যে গৃহিণীর অঞ্চলে।[৪]

জীবন অতিবাহিত করার (ে ত্রে অন্দরমহলের গৃহিণীর ভূমিকা সর্বাতিশীর্ষে। গৃহিণীর অঞ্চলে আবদ্ধ হয়ে অন্দরমহলে এই গৃহিণীদের দ্বারাই পরিচালিত হতেন সেই সময়ের বাবুরা। তবে সব (ে ত্রে এই দৃশ্য পরিলি(ত হত না। বাবুদের স্বভাব বৈশিষ্ট্যের বড়ো গুণটা হল তাঁরা—

> নিজগৃহে জল খান, বন্ধুগৃহে মদ খান, বেশ্যাগৃহে গালি খান এবং মুনিব সাহেবের গৃহে গলাধাক্কা খান।[৫]

এসবই কিন্তু অবস্থা এবং সময়ের পরিপ্রে(তে অন্দরমহলেরই ভিন্ন রূপসজ্জা। অন্দরমহল এখানে জল, মদ, গালি, গলাধাক্কা ইত্যাদি খাওয়ার নির্দিষ্ট এবং উপযুক্ত(জায়গা হিসেবে ব্যবহার হয়েছে। অন্দরমহলের এখানেই তাঁরা থেমে থাকলেন না, তাঁহাদের—

> যত্ন কেবল পরিচ্ছদে, তৎপরতা কেবল উমেদারিতে, ভক্তি(কেবল গৃহিণী বা উপগৃহিণীতে। এবং রাগ কেবল সদ্গ্রন্থের উপর।[৬]

অন্দরমহলের বাইরে এইসব বাবুরা নিজেদের খুশি মতন জীবন-যাপন করতেন। তবে অন্দরমহলে গৃহিণী বা উপগৃহিণীতেই ছিল তাঁদের বেশি ভক্তি(। কারণ, অন্দরমহলে গৃহিণী বা উপগৃহিণী যদি সন্তুষ্ট থাকেন, তবে বাবুদের বাবুয়ানায় কোনো ব্যাঘাত ঘটত না। বলা ভালো, এইসব বাবুরা অন্দরমহলে একক পত্নী বা গৃহিণীতে নারাজ ছিলেন(ফলে গৃহিণী ও একাধিক উপগৃহিণী অন্দরমহলের অন্দরমহলত্ব র(া করতেন।

লোকরহস্য গ্রন্থের অপর এক প্রবন্ধ 'হনূমদ্বাবুসংবাদ'-এ হনুমান এবং বিদেশিবাবুর কথোপকথন উপস্থিত করা হয়েছে। তবে এখানে বিদেশিবাবু যথার্থ অর্থেই বাবু। তাঁর

পরনে বুট, কোট, পেন্টালুন, চেন, চশমা, চু(ট, চাবুকধারী টুপ্যাবৃত মস্তক এবং তিনি ইংরেজিতে বাক্যালাপে পটু। যদিও এই প্রবন্ধে অন্দরমহল প্রসঙ্গ একেবারেই নেই, তবে তাদের কথোপকথনের একটি অংশে অন্দরমহলের ভাবনার আভাস পাওয়া গেছে। হনুমানের উক্তি(—

> আপনার যে দেশে জন্ম, কদলী এবং বার্ত্তাকু অনুসন্ধানে আমি মধ্যে মধ্যে সে দেশে গমন করিয়া থাকি(এবং তদ্দেশীয়া সুন্দরীগণ বড়ি নামে যে সুস্বাদু ভোজ্য প্রস্তুত করিয়া থাকে, তাহাও কদাপি বিনানুমতিতে রামানুচর—সেবায় নিযুক্ত(করিয়াছি।[৭]

বিদেশি বাবুকে হনুমান মাতৃভাষা বাংলাতে বাক্যালাপ করার জন্য ব্যাখ্যা করে এমন কথাগুলো বলেছিল। আসলে, এখানে 'বড়ি' নামক যে সুস্বাদু খাদ্যবস্তু প্রস্তুতের কথা বলা হয়েছে— তার নির্মাতা অন্দরমহলের গৃহিণী বা নারীরা। রন্ধন শিল্পে পটু গৃহস্থ নারীরা বিভিন্নপ্রকার ডালকে বেটে বা মিশ্রিত করে ডালের বড়ি প্রস্তুত করে— যা খেতে খুবই সুস্বাদু। এ রকমই অসংখ্য খাদ্যবস্তু অন্দরমহলের গৃহিণীরা প্রস্তুত করে পরিবেশন করত। আলোচ্য প্রবন্ধে হনুমান সুন্দরীগণদের প্রস্তুত এই 'বড়ি' কখনো-কখনো বিনানুমতিতে রামানুচর সেবায় ভ(ণ করেছে। এ(ত্রে অন্দরমহল বিশেষভাবে প্রাধান্য পেয়েছে।

৩

'কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত' গ্রন্থে বিনয় ঘোষ কলকাতা শহরের ইতিহাস ও কলকাতা কালচারের বৃত্তান্ত ছাড়াও 'ফ্যানি পার্কস্-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত (১৮২২-২৮)' লিপিবদ্ধ করেছেন। বিশেষ করে এই গ্রন্থের অন্তর্গত '২' সংখ্যক পর্বে 'ধনিক হিন্দুর বাড়ি নাচসভা'-র বিবরণ থেকে সেই সময়কার (১৮২৬ সাল) জেনানামহলের বা অন্তঃপুরের বা অন্দরমহলের পরিচয় পাই। 'ফ্যানি পার্কস্'-এর বিবরণে যা পাওয়া যায়, বিনয় ঘোষ তা লিপিবদ্ধ করেছেন এভাবে

> সামনে বিরাট এক পর্দা ঝুলছে। পর্দা পার হয়ে আরও ভিতরে গেলাম, বেশ ঘন অন্ধকার, কোন্‌দিকে কি বা কে আছে কিছুই দেখা যাচ্ছে না। অন্ধকারের ভিতর থেকে দু'জন মহিলা (পরিচারিকা মনে হয়) এসে আমার হাত ধরলেন, এবং বিশাল সিঁড়ি পার হয়ে একটি সুসজ্জিত আলোকোজ্জ্বল ঘরে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করলেন। সেই ঘরে গৃহস্বামীর স্ত্রী ও অন্যান্য মহিলা আত্মীয়ারা এসে আমাকে সাদরে অভ্যর্থনা করলেন। আমি বেশ অবাক হয়ে গেলাম। দু'জন মহিলা রীতিমত সুন্দরী দেখতে। তাঁদের পোশাক-পরিচ্ছদ দেখে বুঝলাম কেন অন্দরমহলে এই মহিলাদের স্বামীরা ছাড়া অন্য সকলের প্রবেশ নিষেধ। তাঁদের পরনে অতিসূক্ষ্ম বেনারসী শাড়ি, সোনার জরির পাড় বসানো, দুই পেঁচ দিয়ে গায়ে জড়ানো, প্রান্তটি বা আঁচল পিঠে ফেলা। এই বস্ত্রের তলায় অন্য কোনো অন্তর্বাস নেই। কাজেই গায়ে দুই পেঁচ জড়ানো থাকলেও তা এত সূক্ষ্ম যে অঙ্গের শোভা পর্যন্ত বিচ্ছুরিত হয় তার ভিতর দিয়ে। মনে হয় যেন একটা রেশমী

> ওড়না পায়ের ওপর ফেলা রয়েছে। গলায় ও হাতে সোনা-হীরের অলঙ্কার। গায়ের রঙ অনেকের হালকা মেহগনির মতন, কারও কারও বেশ কালো। আলোকিত ঘর থেকে বেরিয়ে আমরা বাইরের একটি চিক-টাঙানো বারান্দায় গিয়ে দাঁড়ালাম। এই চিকগুলো বাঁশের স(কাঠি থেকে তৈরি এক রকমের পর্দা, চমৎকার দেখতে। বাইরে থেকে ভিতরে কিছু দেখা যায় না, কিন্তু ভিতর থেকে বাইরে বেশ দেখা যায়।[৮]

উনিশ শতকের প্রথমার্ধ থেকেই অল্প-বিস্তর বাবু-সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া গেছে। বাবু শ্রেণির একটি গু(ত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য ছিল বাইজি নাচ দেখা বা নাচসভায় যাওয়া। এই 'নাচসভা' প্রসঙ্গে ফ্যানি পার্কস্-এর মহামূল্যবান ভ্রমণবৃত্তান্ত। তাঁর বৃত্তান্ত অনুযায়ী সেই সময়কার অন্দরমহলের প্রবেশ দ্বারে বিরাট একটা পর্দা ঝোলানো থাকত, যার মধ্যদিয়ে দৃষ্টি বাইরে থেকে ভিতরে এবং ভিতর থেকে বাইরে প্রদর্শিত হত না। তবে, অন্দরমহলে উপস্থিত থাকত সুসজ্জিত কাঠের সিঁড়ি, চারিদিকে আলোর ছটায় ভরে উঠত অন্দরমহলের প্রে(াগৃহ। এছাড়া অন্দরমহলে অবস্থিত সুন্দরী মহিলা যাঁরা উপস্থিত থাকতেন, তাঁদের পোষাক-পরিচ্ছদ হত খুবই আশ্চর্য রকমের। তাঁদের পরনে অতিসূক্ষ্ম বেনারসী শাড়ি— যার পাড়গুলো সোনা দিয়ে বাঁধানো থাকত। বিশেষ করে এই সুন্দরী মহিলারা অন্দরমহলের অন্তরেই থাকতেন বলে বস্ত্রের ভিতরে সমগ্র শরীরে কোনো অন্তর্বাস ব্যবহার করতেন না। ফলে এই সুন্দরী মহিলাদের কাছে অন্দরমহলে স্বামী ছাড়া অন্য কারোর প্রবেশ ছিল সম্পূর্ণ রূপে নিষিদ্ধ। অলঙ্কার সজ্জার মধ্যে তাঁরা হাতে ও গলায় সোনা বা হীরের জিনিস ব্যবহার করতেন। আর অন্দরমহলকে আরও সুন্দর করে তোলার জন্য বাঁশের স(কাঠি দিয়ে তৈরি এক রকমের চিক-টাঙানো পর্দা ব্যবহার করত—যার মধ্যে দিয়ে বাইরে থেকে ভিতরের দৃশ্য দেখা যেত না, কিন্তু ভিতর থেকে বাইরের প্রায় সমস্ত দৃশ্যই দেখা যেত। ফ্যানি পার্কস্-এর লেখায় অন্দরমহলের এমন দৃশ্য থেকে বোঝা যায়, সেই সময়কার প্রায় সব নাচসভা বা গৃহের অন্দরমহলের বা গৃহের অন্তঃপুরের দৃশ্য এক না হলেও বেশিরভাগই কিন্তু ছিল এ রকমের।

৪

উনিশ শতকের অপর একজন বিখ্যাত এবং উল্লেখযোগ্য প্রাবন্ধিক হলেন রাজনারায়ণ বসু (১৮২৬-১৮৯৯)। অ(য়কুমার দত্তের প্রস্তাবের উত্তরে তিনি লিখলেন প্রবন্ধ 'সেকাল আর একাল' (১৮৭৪)। এই গ্রন্থে ইংরেজ শাসনের সূচনা থেকে হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার (জানুয়ারি, ১৮১৭) আগেকার পর্বকে তিনি 'সেকাল' আর হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠার পরবর্তী সময়কে 'একাল' হিসেবে চিহ্নি(ত করেছেন।

> এই বিভাজন অনুযায়ী, রাজনারায়ণের জন্ম 'একাল'-এ(একালের অধিকাংশ ঘটনাই তাঁর চোখের সামনে ঘটেছে। সেকালের কথা তিনি আত্মীয়স্বজনের কাছে, লোকমুখে বা বই পড়ে জেনেছেন।[৯]

আসলে, রাজনারায়ণের আগে সমকালীন বাঙালি সমাজের দোষ-গুণ ফুটিয়ে তোলার চেষ্টা বিশেষ কেউ করেননি। সে কারণে এই গ্রন্থটিকে বাংলায় সামাজিক ইতিহাস রচনার প্রথম প্রয়াস হিসাবে চিহ্নিত করা যায়।

গ্রন্থটিতে সেকালের সাহেবদের প্রসঙ্গ দিয়েই শুরু করেছেন রাজনারায়ণ তাঁর বক্তব্য। তখনকার সাহেবরা এদেশের মানুষকে কতটা ভালোবাসতেন, এদেশীয়দের আচার-আচরণকে কেমনভাবে নিজের করে নিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে গৃহের অন্দরমহলেরও সাময়িক পরিচয়— সে সব কথাই তিনি বলেছেন। আর সেকালের শিক্ষা-প্রণালীর সংক্ষিপ্ত অথচ সরস একটি ছবি তিনি আমাদের সম্মুখে তুলে ধরেছেন আলোচ্য প্রবন্ধগ্রন্থে। আবার, অন্দরমহলে স্ত্রী-শিক্ষার হালচাল দেখে অত্যন্ত হতাশ হয়ে রাজনারায়ণ মন্তব্য করেছেন

> স্ত্রীলোকদিগের অল্পবিদ্যা হওয়া অপেক্ষা আদৌ বিদ্যা না হওয়া ভাল। ... এক্ষণে স্ত্রীলোকদিগকে যেরূপ শিক্ষা দেওয়া হইতেছে, তাহা তাহাদিগকে কেবল অশ্লীল গল্প ও নাটক পাঠে পারগ করে।[১০]

যৌবনকালে স্ত্রী-শিক্ষার উৎসাহী সমর্থক রাজনারায়ণ এই সময় এতটাই রক্ষণশীল হয়ে ওঠেন যে, এতে দোষ ছাড়া আর কিছুই তাঁর নজরে পড়েনি। অন্দরমহলের স্ত্রী লোকেদের মুখে রূপকথা, ভূত বা ডাকাইত-এর গল্প শোনানোর প্রসঙ্গে তাদের শিক্ষা-দীক্ষার রেয়াজটা ফুটে ওঠে ''ছেলেবেলা সে কালের স্ত্রীলোক কর্তৃক ডাকাইত তাড়ানোর গল্প সকল শুনা গিয়েছিল।''[১১] এর থেকে বোঝা যায় অন্দরমহলে গল্পচর্চার মধ্যে দিয়ে শিক্ষাদানও অতি সহজে হতে পারত। সাহেবরা আমলাদের অন্দরমহলে প্রবেশ করে তাদের প্রতি এতটাই সদয় ছিল যে, ''তাঁহারা তাঁহাদের দেওয়ানদের বাটীতে গিয়া তাঁহাদের ছেলেদিগকে হাঁটুর উপর বসাইয়া আদর করিতেন ও চন্দ্রপুলি খাইতেন।''[১২] এমন ঘটনা সহজেই প্রমাণ করে সে কালের সাহেবরা অন্দরমহলে প্রবেশ করে যথেষ্ট সহানুভূতিশীলতার পরিচয় দিতেন।

আবার অন্দরমহলের রন্ধন শিল্পের পরিচয়ও প্রাবন্ধিক স্পষ্টভাবে জানিয়েছেন

> গোমাংস যেমন ইংরাজদিগের প্রধান আহার, গোল আলু যেমন আইরিশদিগের প্রধান আহার, ডাল (টি যেমন হিন্দুস্থানীদিগের প্রধান আহার, তেমনি ডাল, ভাত, দুধ, মাছ বাঙ্গালীদিগের প্রধান আহার। এই চারি দ্রব্যের মধ্যে দুগ্ধ যেমন পুষ্টিকর, এমন অন্য পদার্থ নহে।[১৩]

যে সমস্ত রন্ধন শিল্পের পরিচয় পাওয়া গেল, তার বেশিরভাগই গৃহিণীরা তাদের অন্দরমহলে রন্ধন করে এবং পরিবারের সকলে মিলে তা ভক্ষণও করে। এছাড়া সে সময়ে গৃহিণীদের অন্দরমহলে 'তিন্তিড়ী' বৃক্ষের পত্রের রন্ধনের কথাও জানা যায়। অন্দরমহলের গৃহিণীদের বা বাড়ির নারীদের প্রচলিত কর্মের পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে

> এক ভট্টাচার্য্য ছিলেন, তাঁহার স্ত্রী দাইল পাক করিতেছিলেন। তিনি স্বামীকে রন্ধনশালায় বসাইয়া পুষ্করিণীতে জল আনিতে গেলেন।[১৪]

এমতো পরিস্থিতিতে সেই ডাল উথলে উঠলে, সেই পাক কর্মে অন্দরমহলে পু(ষকে হস্তে(প করতে হত। তবে বর্তমানে অন্দরমহল ছাড়াও বড়ো বড়ো হোটেল বা রেস্টুরেন্ট বা কোনো অনুষ্ঠান বাড়িতে পু(ষরাই রন্ধন শিল্পে দ(কারিগর হিসেবে চিহ্নি(ত হয়েছেন।

রাজনারায়ণ বসু 'একাল' প্রসঙ্গে আলোচনায় আমাদের যুবাগণ ইংরেজদের রেয়াজ-রীতি অনুযায়ী—

> আপনার স্ত্রীদিগকে বিবীদিগের ন্যায় সভা মজ্‌লিশে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিয়াছেন। পশ্চাৎ যদি ইংরাজেরা অতিরিক্ত(স্ত্রী স্বাধীনতার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হন, তখন এদেশের লোকেরা আপনাদের স্ত্রীদিগকে গৃহে প্রবেশ করাইতে পথ পাইবেন না। ... ইংরাজেরা হিন্দুশাস্ত্র পড়েন দেখিয়া অনেকে পড়িতে যান।[১৫]

এদেশের যুবা বাবুগণ ও তাঁদের স্ত্রীরা এখানেই থেমে থাকলেন না, তাঁরা ইংরেজি ঔষধ, খাদ্য, পাদরী, বাইবেল সব কিছুকেই ভালো হিসেবে গ্রহণ করতে থাকলেন আর দেশীয় সব কিছুকে মন্দ বিবেচনায় দূরে সরিয়ে রাখলেন। এখানে বাবুদের বিবিগণ আর অন্দরমহলের মধ্যে আবদ্ধ থাকলেন না— তাঁরা বাইরের জগৎকে একটু একটু রক্তে(ধারণ করতে লাগলেন। বিদেশি বাবুদের মতো এদেশের মানুষজনদের মধ্যে যেমন 'পানদোষ' বৃদ্ধি পেয়েছে, তেমনি 'বেশ্যাগমন'-ও বৃদ্ধির কথা জানা গেছে। রাজনারায়ণের কথায়

> পূর্ব্বে গ্রামের প্রান্তে দুই এক ঘর বেশ্যা দৃষ্ট হইত(এ(ণে পল্লীগ্রামে বেশ্যার সংখ্যা বিল(ণ বৃদ্ধি পাইতেছে। এমন কি, স্কুলের বালকদিগের মধ্যেও এই পাপ প্রবলাকার ধারণ করিয়াছে।[১৬]

বলা যায়, সভ্যতা যতই বৃদ্ধি পায়, ততই পানদোষ, লাম্পট্য ও প্রবঞ্চনা তার সঙ্গে সঙ্গে সমাজে বেড়ে যেতে থাকে। ফলে বাড়ি বা গৃহের অন্দরমহলের টানটাও স্বাভাবিকভাবে কমতে থাকে।

এসমস্ত ঘটনা ছাড়াও রাজনারায়ণ বসু অন্দরমহলের পাক্‌শালে অন্নপাক, অতিথি ভোজন, দাসী-পাচক-পাচিকার সাহচর্যের প্রসঙ্গ সুন্দরভাবে লিপিবদ্ধ করেছেন—

ক. সে কালের এমন সকল গল্প শুনা আছে যে, এক এক লোকের বাড়ীতে রাশীকৃত অন্ন পাক হইত(সেই রাশীকৃত অন্নের উপর ঘি ঢালিয়া দেওয়া হইত। কেবল বাড়ীর কর্ত্তা যিনি, তিনিই ঘি খাবেন, এ বড় খারাব কথা, সেই সঘৃত অন্ন অতিথি অভ্যাগত সমুদায় লোককে ভোজন করান হইত।[১৭]

খ. সে কালের স্ত্রী লোকেরা এ কালের স্ত্রী লোক অপে(া অধিক শ্রমশীলা ছিলেন। এ(ণে সম্পন্ন মানুষের বাটীতে স্ত্রী লোকেরা যেমন দাস দাসী ও পাচক পাচিকার প্রতি সম্পূর্ণ নির্ভর করেন, স্বহস্তে গৃহকার্য্য করিতে বিমুখ, সে কালের স্ত্রী লোকেরা সেরূপ ছিলেন না। সে কালের বড় বাড়ীর স্ত্রী লোকেরা পর্য্যন্ত অনেক পরিমাণে গৃহকার্য্য নিজ হস্তে সম্পাদন করিতেন।[১৮]

গ. সে কালের ধনাঢ্য ব্যক্তি(দিগের স্ত্রীরা বাটীস্থ আত্মীয় পরিজন ভৃত্য সকলের ভাল করিয়া আহার হইল কি না, তাহা নিজে সম্পূর্ণ মনোযোগ পূর্ব্বক দেখিতেন। ... পতিভক্তি(ও পতিনিষ্ঠা আমাদিগের হিন্দু স্ত্রীদিগের প্রধান গৌরবস্থল।[১৯]

রাজনারায়ণ বসুর এ সমস্ত দৃষ্টান্ত থেকে অন্দরমহলের নারীদের ত্রি(য়া-কর্ম, অতিথি সেবা, দাস-দাসী, পাচক-পাচিকার সাহচর্যে সাংসারিক ত্রি(য়া-কর্মাদির প্রসঙ্গ সব কিছুই যেমন অন্দরমহলের পরিবেশকে সহজেই বুঝতে সাহায্য করেছে, তেমনি এর মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ ও পরিবেশকে বোঝা গেছে।

৫

শিবনাথ শাস্ত্রী (১৮৪৭-১৯১৯)-র সাধু পু(ষের জীবন-চরিত আলোচনা গ্রন্থ 'রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ'। গ্রন্থটির প্রকাশকাল ১৯০৪ খ্রিস্টাব্দ হলেও, এ গ্রন্থে রামতনু লাহিড়ী (১৮১৩-১৮৯৮)-ও তাঁর সমসাময়িক সময়কালকে প্রাবন্ধিক শিবনাথ শাস্ত্রী ধরতে চেয়েছেন। এই অবকাশে আমরা সেই সময়কার সমাজের সামাজিক পরিস্থিতি ও অন্দরমহলের পরিবেশকে বুঝে নিতে চেষ্টা করব। আলোচ্য গ্রন্থে প্রাবন্ধিক শিবনাথ শাস্ত্রী অজস্র ঘটনা বর্ণনার মাধ্যমে লাহিড়ী পরিবার এবং সেই সময়কার প্রতিষ্ঠিত ব্যক্তি(বর্গদের পরিচয়কে আমাদের সামনে তুলে ধরেছেন। সেই সময়ে অন্দরমহলের অল্পবয়স্কা বালিকারাও রাজবাড়িতে নিয়মিত দাসীদলের মধ্যে পরিগণিতা হয়ে উঠত। রাজবাড়ির অন্দরমহলে রাজার অবসর সময়ে ১৪-১৫ বছরের অল্প বয়স্কা বালিকাকে নিয়ে আসা হত গান শোনানোর জন্য। ঘটনা এখানেই থেমে থাকল না, তারপর তাকে যখন-তখন 'সুরাপান' করে রাজা বন্ধুদের সঙ্গে সেই বালিকাকে নিয়ে পরিহাস-আমোদ-প্রমোদে মত্ত হতেন।

এমন ঘটনা প্রমাণ দেয়, সেই সময়কার নারীতন্ত্রের মহিমাকে। অপর একটি ঘটনা, যেখানে—

> এক রাত্রিতে রাজবাটীতে এক অপূর্ব্ব রূপসী ও অসাধারণ সুকণ্ঠা তয়ফাওয়ালীর নৃত্যগীতে সকলেই বিমোহিত হইলেন। কেহ প্রস্তাব করিলেন যে, এই রমণী সুন্দর খ্যামটা নাচিতে পারে। তখন সুরাপানে সকলেরই হৃদয় প্রফুল্ল ছিল(সুতরাং এ প্রস্তাবে দ্বিমত হইল না। ঐ সুন্দরী যখন পেশোয়াজ ছাড়িয়া একখানি কালাপেড়ে সূক্ষ্ম ধুতি পরিয়া গৃহে প্রবেশ করিল, যেন স্বর্গবিদ্যাধরী অবতীর্ণা হইলেন দর্শকবৃন্দের ঢুলু ঢুলু নয়নে এইরূপ দৃষ্ট হইল। নিমন্ত্রিত মহাশয়দিগের মধ্যে কি প্রধান, কি বিজ্ঞ, কি পদস্থ, প্রায় সকলেই তাহার নৃত্যে বিমোহিত হইলেন।[২০]

এই সমস্ত ঘটনা থেকে সহজেই বোঝা যায়, ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় অন্দরমহলের নারীরা তাদের স্বাধীনতাকে বিসর্জন দিয়ে এমন কুনীতিমূলক কর্ম করতে বাধ্য হত। কখনো-কখনো এমন কর্ম করাতে তারা প্রশংসাও অর্জন করত। আসলে, অন্দরমহলের নারীরা গৃহস্থালির কাজ-কর্ম ছাড়াও নৃত্য-গীতে পারদর্শী ছিল— যেটা সমাজের চোখে কটু দেখালেও কখনো-কখনো সংসারে আর্থিক সহযোগিতা যোগাতে এমন কর্মে বাধ্য হয়েছিল। এখানে দ্বিতীয় শ্রেণির মানুষজনদের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে শিবনাথ শাস্ত্রী জানান

> দ্বিতীয় শ্রেণীর লোকদিগের অনেকে বিদেশে বাস করিতেন সুতরাং কৃষ(নগরের তদানীন্তন সামাজিক অবস্থার সহিত তাঁহাদের যোগ ছিল না...। তৎকালে বিদেশে পরিবার লইয়া যাইবার প্রথা অপ্রচলিত থাকাতে এবং পরস্ত্রীগমন নিন্দিত বা বিশেষ পাপজনক না থাকাতে, প্রায় সকল আমলা, উকীল বা মোক্তা(রের এক একটি উপপত্নী আবশ্যক হইত।[২১]

বিদেশে পরিবার স্থানান্তরিতকরণের ফলে পরিবারের অন্দরমহলের পরিকাঠামোও পরিবর্তিত হত। প্রয়োজনে পাপজনক-কর্ম না হওয়াতে আমলা, উকিল, মোক্তা(র পরিবারে উপপত্নী রাখাটা আবশ্যক হয়ে পড়ত। ফলে, তাদের বাসস্থানের কাছাকাছি স্থানে গণিকালয় সংস্থাপিত হতে শু(করল। আবার এ সমস্ত স্থানে সন্ধ্যার পর রাত্রি দেড় প্রহর পর্যন্ত বেশ্যালয়ে লোকে পূর্ণ থাকত। আর অন্দরমহলে শু(হত বিবাদ। এতে ভাঙতে থাকে অন্দরমহলের পরিকাঠামো।

আবার, মফঃস্বল থেকে কলিকাতায় আসার ফলে যে সমস্ত লোকের 'অজীর্ণ' রোগ (লোণা লাগা) হত, তার উপায় সম্পর্কে বলতে গিয়ে প্রাবন্ধিক অন্দরমহলের উপকরণের প্রসঙ্গ এনেছেন। শিবনাথ শাস্ত্রীর কথায়

> যাঁহারা তথায় অল্পকাল থাকিয়াই প্রত্যাগমন করিতেন, তাঁহারা বাটী আসিয়া লোণা কাটাইবার নিমিত্ত কাঁচা থোড় খাইতেন, ঘোল ও কল্মির ঝোল পান করিতেন এবং গাত্রে কাঁচা হরিদ্রা মাখিতেন।[২২]

ল(করার বিষয়, যে সব উপকরণের উল্লেখ করেছেন লেখক, বেশিরভাগই অন্দরমহলের রন্ধনের সামগ্রী। তবে সেই সমাজে তথা আজকের সমাজেও রন্ধন প্রণালীতে এ সমস্ত সামগ্রী ব্যবহার করা হয়। এই বিষয় ছাড়াও অন্দরমহলের তুচ্ছ-সামান্য বিষয়— বিবাদ, কলহ, ইংরাজি শি(ার প্রচলন ইত্যাদি বিষয়গুলি প্রাবন্ধিক শিবনাথ শাস্ত্রীর গ্রন্থের মধ্যে ফুটে উঠেছে—

ক. বিশেষভাবে কলিকাতার মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের মধ্যে স্বীয় স্বীয় সন্তানগণকে ইংরাজী শি(া দিবার আকাঙ(া বর্দ্ধিত হইতে লাগিল।[২৩]

খ. ঘরে ঘরে বৃদ্ধাদিগের সহিত বালকদিগের বিবাদ, কলহ ও তাহাদিগের প্রতি অভিভাবকগণের তাড়না চলিতে লাগিল।[২৪]

গৃহস্থের অন্দরমহলের ছোটো ছোটো শিশু সন্তানদেরকে যেমন একদিকে ইংরাজি শি(ায় শি(িত করার প্রবণতা বাড়তে লাগল, তেমনি সে সময় প্রতিষ্ঠিত 'হিন্দু কলেজ'-এ (১৮১৭) শি(া লাভের আকাঙ(া যুব সমাজের মধ্যে ছড়িয়ে গিয়েছিল। এই শি(াব্যবস্থায় শি(িত হয়ে তারা 'বাবু' শ্রেণিতে নাম লেখাতে শু(করল। ফলে এই বাবুরা—

> দিনে ঘুমাইয়া, ঘুড়ি উড়াইয়া, বুলবুলির লড়াই দেখিয়া, সেতার এসরাজ বীণ প্রভৃতি বাজাইয়া, কবি, হাপ আকড়াই, পাঁচালি প্রভৃতি শুনিয়া, রাত্রে বারাঙ্গনাদিগের আলয়ে আলয়ে গীতবাদ্য ও আমোদ করিয়া কাল কাটাইত...।[২৫]

আবার গৃহস্থের ঘরে ঘরে বয়স্ক বৃদ্ধ বা বৃদ্ধাদের সঙ্গে এই সমস্ত নব উদ্ভূত বাবুদের মতপার্থক্যের ফলে অন্দরমহলে বিবাদ-কলহ সৃষ্টি হত। ত্র(মে এই বিবাদ, কলহ ঘরের বালকদিগের সঙ্গেও চলতে শু(করে। বাড়ির বয়স্কদের প্রতি শ্রদ্ধাও ত্র(মে কমে যেতে থাকায় অন্দরমহলের ছেলেরা ''অনেকে সন্ধ্যা-আহি(ক পরিত্যাগ করিয়াছিল(তাহাদিগকে বলপূর্ব্বক ঠাকুরঘরে প্রবিষ্ট করিয়া দিলে তাহারা বসিয়া সন্ধ্যা-আহি(কের পরিবর্ত্তে হোমারের ইলিয়ড গ্রন্থ হইতে উদ্ধৃত অংশ সকল আবৃত্তি করিত।''[২৬] এমন পরিস্থিতি সমাজে একটা নতুন ব্যবস্থা অর্থাৎ বাবু কালচারের সূচনা করেছিল। ফলে আমাদের আলোচ্য যে বাবু সমাজের অন্দরমহল ভাবনা, তারও পরিবর্তন ঘটতে শু(করল।

তথ্যসূত্র

১. বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *বঙ্কিম রচনাবলী*, দ্বিতীয় খণ্ড, সাহিত্য সমগ্র, সম্পাদনা কাঞ্চন বসু, প্রথম প্রকাশ জানুয়ারি ১৯৯৯, রিফ্লেক্ট পাবলিকেশন, ৩০ মহাত্মা গান্ধী রোড, কল-৯, 'লোকরহস্য', 'বাবু' প্রবন্ধ, পৃষ্ঠা ৮৭

২. *তদেব*, পৃ. ৮৮

৩. তদেব।

৪. তদেব।

৫. তদেব।

৬. তদেব।

৭. তদেব, 'হনূমদ্বাবুসংবাদ' প্রবন্ধ, পৃ. ১১১

৮. বিনয় ঘোষ, *কলকাতা শহরের ইতিবৃত্ত*, 'ফ্যানি পার্কস্-এর ভ্রমণবৃত্তান্ত ১৮২২-২৮', প্রথম সংস্করণ অক্টোবর ১৯৭৫, বাক্ সাহিত্য প্রাইভেট লিমিটেড, ৩৩ কলেজ রো, কল-৯, 'ধনিক হিন্দুর বাড়ি নাচসভা', পৃ. ২৪২-২৪৩

৯. রাজনারায়ণ বসু, *সেকাল আর একাল*, সম্পাদনা স্বপন বসু, প্রথম প্রকাশ সেপ্টেম্বর ১৮৭৪, প্রথম চিরায়ত সংস্করণ জানুয়ারি ২০০৮, চিরায়ত প্রকাশন প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, ভূমিকা, পৃ. ১৭

১০. *তদেব*, পৃ. ২০

১১. পূর্বোক্ত(গ্রন্থ, পৃ. ৪২

১২. *তদেব*, পৃ. ২৪-২৫

১৩. *তদেব*, পৃ. ৪৪

১৪. *তদেব*, পৃ. ২৭

১৫. *তদেব*, পৃ. ৫৯-৬০

১৬. *তদেব*, পৃ. ৬২

১৭. *তদেব*, পৃ. ৬৩

১৮. *তদেব*, পৃ. ৬৫
১৯. *তদেব*, পৃ. ৬৬
২০. শিবনাথ শাস্ত্রী, *রামতনু লাহিড়ী ও তৎকালীন বঙ্গসমাজ*, নিউ এজ প্রথম সংস্করণ ১৩৬২, চতুর্থ মুদ্রণ আগস্ট ১৯৮৩, নিউ এজ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, ১২ বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট, কলকাতা-৭৩, দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ, পৃ. ৪১
২১. *তদেব*, পৃ. ৪২
২২. *তদেব*, পৃ. ৫৪
২৩. *তদেব*, পৃ. ৭২
২৪. *তদেব*, পৃ. ১০২
২৫. *তদেব*, পৃ. ৫৬
২৬. *তদেব*, পৃ. ১০২

জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বর্ণবৈচিত্র্য

সারমিন রহমান*

বাংলা কথাসাহিত্যে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর প্রকৃতির চিত্রাঙ্কন একটি স্বতন্ত্র মর্যাদার আসন দাবি করে। প্রথম জীবনে তিনি প্রকৃতিকে রঙ আর তুলির জগতে ধরতে চাইলেও, ক্রমেই বুঝেছিলেন ছবি বা কবিতা — এ দুটোর কোনোটা দিয়েই তাঁর প্রকৃতিপাঠের যথাযথ রূপায়ন সম্ভব হবে না। তাই রঙ-তুলি আর পদ্যের জগত ছেড়ে এ লেখক পাড়ি দিলেন গদ্যের জগতে, তাও আবার বয়ঃসন্ধির মতো স্পর্শকাতর সময়টাতে। এ প্রসঙ্গে তাঁর নিজের বক্তব্য—

''কবিতা দিয়ে সাহিত্য আরম্ভ করেছিলেন। কিন্তু কেবল কবিতা লিখে কবিতা পড়ে ক্ষুধা মিটছিল না গদ্য চাই, গদ্য খুঁজছি। ... এবং একদিন হুট করে ছবি আঁকা ছেড়ে গল্প লিখতে বসে গেলাম। অষ্টম শ্রেণীর ছাত্র আমি তখন। চৌদ্দ পার হয়ে পনেরোয় পা দেব দেব করছি। বয়ঃসন্ধির সেই ভয়ংকর সময়ে পদ্য ছেড়ে আমি গদ্য লেখায় মন দিলাম এবং সেটা ছোটগল্প।''

বিশ শতকের অন্যতম একজন এই লেখকের ছোটগল্পের আদ্যন্ত জুড়ে রয়েছে প্রকৃতি। বাংলা কাব্যজগতে জীবনানন্দের কাব্যে যেমন বর্ণবহুলতা এবং বর্ণবৈচিত্র্য খুব সহজেই দৃষ্টিগোচর হয়, বাংলা ছোটগল্পের ধারায় জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর লেখনীতে তেমনি এই বর্ণবৈচিত্র্য এবং বর্ণবহুলতা লক্ষ করার মতো একটি বিষয়। রূপ-রস-গন্ধ-শব্দের সঙ্গে বর্ণ বা রঙের উপস্থাপনা তাঁর ছোটগল্পের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। জীবনানন্দের কাব্যের পর সম্ভবত জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পেই রঙ আরও বৈচিত্র্যপূর্ণ হয়ে ধরা দিয়েছে। তাঁর গল্পে রঙের এই বিচিত্রতা প্রমাণ করে বাংলা ছোটগল্পে প্রকৃতিকে তিনি কী নিবিড়ভাবে পর্যবেক্ষণ করেছেন। আর রঙের এই নিবিড় পর্যবেক্ষণেই লেখকের মনন-মানসিকতারও একটা পরিচয় পাওয়া যায় ঠিক যেমনটা খুঁজে পাওয়া যায় জীবনানন্দে। জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে যে সকল বর্ণেরা ভিড় করে এসেছে — ফিকে নীল, সাদা, ধূসর, ধূসর নীল, বাদামী রঙ, ঘোলাটে বাদামী রঙ, অপরাজিতা রঙ, কমলা, দুধ রঙ, ছাই রঙ, সবুজ, জাফরান, বিবর্ণ বা ফ্যাকাশে, লাল, সজল মেঘের রঙ কোন্‌টা নেই — জংধরা রঙ, ইঁটের রঙ, পাটকিলে রঙ, কচি ঘাসরঙ, বেগুনি নীল, নীলাভ রূপালি, ঘোলাটে ইত্যাদি সমস্তরকম রঙই রয়েছে জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর ছোটগল্পের প্রকৃতির ভাঁড়ারে। একসময় চিত্রশিল্পী ছিলেন তিনি। তাই যেন গল্পেও প্রকৃতির বর্ণনায় রঙ নিয়ে চলেছে তাঁর এক্সপেরিমেন্ট। তবে সেই পরীক্ষা-নিরীক্ষা নিছক প্রকৃতির রূপ বর্ণনাতেই আবদ্ধ থাকেনি। উপরন্তু তা হয়ে উঠেছে লেখকের মনন প্রকাশক। তাঁর সল্পে উল্লিখিত এইসব রঙেরা হল—

---

* অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ডায়মণ্ড হারবার মহিলা বিশ্ববিদ্যালয়।

১. মেয়েটার পরণে **ফিকে নীল** রঙের শাড়ি। নদী ও নারী।

২. পরপারে ধূসর বালির বিছনায় আঁকাবাঁকা জলের রেখা অস্তসূর্যের আভা লেগে **সোনা** হয়ে উঠেছে। —ঐ

৩. দূরে **ধূসর নীল** আকাশের প্রান্ত সীমায় ...। —ঐ

৪. পূবদিকের আকাশের রঙ উঠেছে **গোলাপী লাল** হয়ে। — ঐ

৫. কণ্ঠে **রূপোলি** হাসির বান ডেকে গেল। —ঐ

৬. কেবল এখানে সেখানে **সাদা আর কালো** মাটির ছোপ। —ঐ

৭. **সাদা ধূসর** বোট। —ঐ

৮. দুদিকের জানালার **নীল** পর্দা প্রশান্তির নীল অঞ্জনের মতো ...। —ঐ ইত্যাদি।

'নদী ও নারী' গল্পে নীল রঙ লেখকের মানসিকতায় প্রশান্তির প্রকাশক। আর রূপোলি হাসির মধ্যে যেন প্রকাশ পেয়েছে একটা তীক্ষ্ণতা। এর ব্যবহারটি ব্যতিক্রমী, কিন্তু চমৎকার। আর বোটের সাদা ধূসর রঙটিও যেন একটা রহস্যময় প্রচ্ছন্নতাকেই চিহ্নিত করেছে। 'সমুদ্র' নামক গল্পটিতে এই বর্ণবৈচিত্র্যের আধিক্য আরো বেশি বলা চলে—

১. আকাশ মাটি জল **সোনার** রৌদ্রে ঝলমল করে উঠল।

২. **সীসার** রঙের জল।

৩. এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র **গাঢ় নীল** রঙ ধরেছে, মাঝের জলে **সবুজের** ছোপ, বর্ষার পরে **নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে রং** ধরে, আর একটু কাছের জল **গৈরিক**। ...**রূপার** মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় ঢেউ বালির ওপর এতটা দুধ ছড়িয়ে নীচে নেমে গেল।

৪. দূরের **গাঢ় নীল ফিকে** হয়ে গেছে। ... **রূপা ও সীসার** সঙ্গে খানিকটা জাফরান রঙের মিশেল আছে।

৫. বালুর উপর লুটিয়ে পড়া **সাদা সাদা** ফেনার আবেগময় চুম্বন...।

৬. চুপ করে দিগন্তের **নীল** বিস্ফারের দিকে তাকিয়ে রইলাম ...।

৭. পুরো লেন্সের ওপিঠের **বিবর্ণ** চোখ ...।

৮. সেই পরিমিত সংক্ষিপ্ত নিস্তরঙ্গ **ধূসর** দিনগুলির ডাক।

৯. **ছাইরঙা** আকাশ।

১০. **নীল** নয়নাভিরাম **ময়ূর কণ্ঠী রং**।

১১. **চাঁপা** রঙের রৌদ্র।

১২. অগাধ বিস্তৃত **ধূসর নীল** ছাড়া চোখে আর কোন রং নেই। ইত্যাদি।

এভাবেই গল্পের পর গল্পে বিচিত্র সব রঙের ব্যবহার উত্তরোত্তর বেড়েছে বৈ কমেনি। আর বলাই বাহুল্য এই বর্ণ বহুলতা লেখকের লেখনীকে বর্ণময় করে তোলার পাশাপাশি, লেখনীতে একটা ভিন্নমাত্রা এনে দিয়েছে। এক-একটা বর্ণ বা রঙ একই রঙ বারংবার ব্যবহার করলেও

প্রত্যেক ক্ষেত্রেই তা ভিন্ন অনুভূতিকে ফুটিয়ে তোলার পক্ষে অনুকূল হয়ে উঠেছে। যেমন - উপরোক্ত উদাহরণ সোনা রঙের রোদে যে ঝলমলে অনুভূতি অর্থাৎ নির্মেঘ রৌদ্রকরোজ্জ্বল ভাব অনুভূত হয়, চাঁপা রঙের রৌদ্র বললে সে রৌদ্র যেন আরও উপভোগ্য হয়ে উঠেছে। এরকমই আরও অজস্র সব রঙেরা ভিড় করে এসেছে লেখকের বিভিন্ন গল্পে। যেমন—

১. **দুধের মতন সাদা** রঙের মূলটা...। — চোর
২. **মরা মাছের চোখের ফ্যাকাসে রং**। — নীল পেয়ালা
৩. পেয়ালা উপচে **জাফরান রঙের রোদ**। — নীল পেয়ালা
৪. **সবুজ** ঘাসের বুকে বিরল শিশিরবিন্দু কখনো **সোনালী** কখনো **বেগুনি নীল** দ্যুতি নিয়ে থেকে থেকে জ্বলছিল। — চন্দ্রমল্লিকা
৫. ঘাসের ডগায় **আগুন রঙের ফড়িং** চুপ করে আছে। —চন্দ্রমল্লিকা
৬. ...**কচি ঘাসরঙ রুমাল**। —পার্বতীপুরের বিকেল।
৭. **টকটকে লাল শাড়ি আর আকাশ রং ব্লাউজ**। — পতঙ্গ
৮. রঙবেরঙের জামা গায়ে। **লাল বেগুনি হলদে সোনালি**। — সামনে চামেলী
৯. ...**সবুজ** ডাঁটার মাথায় রজনীগন্ধার **রূপালী** বিস্ময় ...। — সামনে চামেলী
১০. ...**সীসার** রঙের **বিবর্ণ** আকাশটা ...। —বৃষ্টির পরে
১১. দাদুর চোখের **ধূসর বাদামী** মণি দুটো উত্তেজনায় ঝিকিয়ে ওঠে। —বনের রাজা
১২. ...মাছের **কালচে তামাটে রঙের** নাড়ি-ভুঁড়ি ...। — গিরগিটি
১৩. ফ্রক না, শাড়ি পরেছে। **মেঘের রং**। —শ্বাপদ
১৪. আর জলের কিনারে লম্বা **সবুজ** ঘাস, ঘাসের ডগায় **হলদে** ফড়িং। —শ্বাপদ
১৫. এদিকে বাইরে রোদ **কমলা** রং ধরতে শুরু করেছে — **সাদা** মেঘের ধারগুলি থেকে এখন **পাটকিলে রং** ফুটে বেরোবে - ...। —শ্বাপদ ইত্যাদি।

এভাবেই খুব অবাক হয়ে যেতে হয়, যখন জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পের প্রকৃতির ভাঁড়ারে বিচিত্র সব রঙের বাহার খুঁজে পাওয়া যায়। শুধু নিছক বর্ণবৈচিত্র্যই নয়। জীবনানন্দের কাব্যে রঙের ব্যবহারে যেমন ইমপ্রেশনিস্ট এবং ফবিস্ট শিল্পীদের প্রভাব লক্ষ করা যায়, আশ্চর্যের বিষয় জ্যোতিরিন্দ্র বাংলা ছোটগল্পের রঙের প্রয়োগেও তার সুস্পষ্ট প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। এমনিতেই লেখক যখন ছবি আঁকতেন, তখন ইমপ্রেশনিস্ট শিল্পীদের মতোই তাঁরও নিসর্গদৃশ্যের চিত্রাঙ্কনই ছিল পছন্দের বিষয় — 'রঙ তুলি ও কাহজ নিয়ে ছবি আঁকতে বসে গেলাম। ...পাহাড় পর্বত অরণ্য প্রান্তর।'[১]

তবে তাঁর ছোটগল্পেও এই নিসর্গপ্রকৃতি—নদী, সমুদ্র, বন-জঙ্গলের প্রাকৃতিক চিত্রিত হয়েছে। আর ইমপ্রেশনিস্টদের মতোই আলো আর রঙ এর যথার্থতাকে তিনি ফুটিয়ে তুলেছেন তাঁর গল্পে। ফুটিয়ে তুলেছেন প্রতিটি মুহূর্তে বদলে যাওয়া প্রকৃতির রূপকে—রাত্রি থাকে সকাল, সকাল থেকে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে গোধূলি বা সন্ধ্যা। জীবনান্দের কবিতাতে প্রকৃতির এই

পটপরিবর্তনের সূক্ষ্ম মুহূর্তগুলি যেমন ধরা পড়েছে, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পগুলির নিবিড় পাঠেও এই পরিবর্তন অনায়াসেই ধরা পড়ে। যেমন—

''বড় মেঘের টুকরোটা সরে গিয়ে আকাশ মাটি জল সোনার রৌদ্রে ঝলমল করে উঠল। ...দেড়ঘন্টা আগে সূর্যোদয় হয়েছে। কিন্তু রোদ ছিল না। জগদ্দল পাথর হয়ে মেঘটা পূবাকাশ অন্ধকার করে মুখ থুবড়ে পড়ে ছিল। ...এতক্ষণে সীসার রঙের জল ছাড়া চোখের সামনে আর কিছু ছিল না। এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র গাঢ় নীল রঙ ধরেছে, মাঝের জলে সবুজের ছোপ, বর্ষার পরে নতুন ঘাস গজানো পলিমাটির যে-রং ধরে; আর একটু কাছের জল গৈরিক। উত্তাল অশান্ত ক্ষিপ্র প্রখর। রূপার মুকুট পরে নাচতে নাচতে ছুটে আসছে। একটা বড় ঢেউ বালির ওপর এতটা দুধ ধড়িয়ে দিয়ে নীচে নেমে গেল।''—সমুদ্র

এরপর সকাল আরও একটু গড়িয়ে যেতে দেখা যায় —

''দূরের গাঢ় নীল ফিকে হয়ে গেছে। উজ্জ্বল রৌদ্র নিয়ে সমুদ্র এখন অন্য রূপ ধরেছে, যেন কিছু গলানো সীসা, কিছু রূপা হয়ে গিয়ে ওদিকের রাশি রাশি জল জর্গন করতে করতে এদিকে ছুটে আসছে। ... রূপা ও সীসার সঙ্গে খানিকটা জাফরান রঙের মিশেল আছে।''—সমুদ্র

আর বিকেলবেলায়—

''রৌদ্রের রেখা সরু হয়ে গেছে। গোলাপ-যুঁইয়ের পাতার ফাঁক দিয়ে কমলা রঙের সুন্দর রেখাগুলি ... এসে ঠিকরে পড়ে তিরতির করে কাঁপছিল।'' —পার্বতীপুরের বিকেল

আর বিকেল মুছে যেতে আরম্ভ করলে—

''গোলাপ ও যুঁইপাতাগুলো কালো কালো ঠেকছে।'' —পার্বতীপুরের বিকেল

অথবা

''... বাইরে রোদ কমলা রং ধরতে শুরু করেছে —সাদা মেঘের ধারগুলি থেকে এখন পাটকিলে রং ফুটে বেরোবে — নারিকেল গাছের ছায়ারা লম্বা হতে থাকবে, দীঘির জলের স্বচ্ছ আরশিটা কালো হয়ে নিভে যাবে একসময়।'' —শ্বাপদ

তবে এক্ষেত্রে শুধু প্রকৃতির পটপরিবর্তনে রঙের পরিবর্তন ঘটছে না, রঙের পাশাপাশি আলোও তার অবয়বত্ব নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। আলোই রঙের বৈচিত্র্যকে ফুটিয়ে তুলেছে ইমপ্রেশনিস্টদের মতোই—

''ভোরে নরম আলোয় ...আকাশের চেহারা মেঘে মেঘে মন্থর বিষন্ন হয়ে আছে। সমুদ্রের রঙেরও পরিবর্তন নেই। কোথায় সেই সবুজ ছোপ, নীল নয়নাভিরাম ময়ূরকণ্ঠী রং, রূপালী ঢেউয়ের ফাঁকে ফাঁকে উজ্জ্বল জাফরান ছটা! দূরের জল কাছের জল এক রং — ছাই রং।''—সমুদ্র

আর সকালটা মেঘলা হলে—

''দূরের ধূসর রেখাটা ক্রমে কালো হয়ে আসছে বলে মনে হয়।'' —সমুদ্র

আবার মেঘ সরে গেলে মনে হয়—

''একটা প্রকাণ্ড নীল পেয়ালা উপুড় হয়ে আছে মাথার ওপর, সমুদ্রের ওপর, আর সেই

পেয়ালা থেকে ঝরে ঝরে পড়ছে চাঁপা রঙের রৌদ্র। আর সে রোদ শুষে নিতে লুঠ করে নিতে ঢেউদের মধ্যে কাড়াকাড়ি পড়ে গেছে; ... ঠেলাঠেলি করে একে অন্যের ঘাড়ের ওপর লাফিয়ে পড়ে ফেটে ভেঙে চুরমার হয়ে রূপার গুঁড়োর মতো ছড়িয়ে পড়ছে। মাঝখানে সবুজের ছোপ। দূরের জল কোমল নীল"—সমুদ্র

একইরকমভাবে দেখে নেওয়া যায়, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে ফবিস্ট শিল্পীদের মতো রঙ প্রয়োগের স্বভাব বৈশিষ্টও। লক্ষ্য করা যায় তাঁর গল্পেও ফবিস্ট শিল্পীদের মতো রঙের কঠিন, কর্কশ রূপ এবং তার পাশাপাশি রঙের বর্ণাঢ্যতাও চোখে পড়ার মতো—

'হলদে ছোপ দেওয়া শাড়িতে মেয়েটাকে দেখাচ্ছিল একটা চিতাবাঘের মতন।' —নদী ও নারী

'একঝাঁক প্রজাপতি। উজ্জ্বল হলুদ বর্ণ।' —গিরগিটি

'...যেন দু'তিনশ ব্যাং লাফিয়ে ছিটকে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে জলে ঝক্ষাপ দিল। কেমন হলদে তেলতেলে চেহারা ওদের।' —বনের রাজা ইত্যাদি।

তবে সমালোচকের কথায় জানা যায়, লেখকের প্রিয় রঙ ছিল হলুদ। আর এও জানা যায়, 'ভাবার্থ ও প্রতীকতার দিক থেকে হলুদ জ্ঞান, প্রজ্ঞা, তাপ, আশ্বাসের রঙ, আবার ভয়, নৃশংসতা, হিংসা, প্রতারণা, অবিশ্বাস ও যৌনতাজাত পাপের প্রকাশ। হলুদ ঈর্ষার রঙ। হলুদ রঙ হিংসা, ঈর্ষা, বিশ্বাসঘাতকতা প্রভৃতির চিহ্ন।' তাছাড়াও 'মনে করা হয়, হলুদ কল্পনাশক্তি, মৌলিকত্ব ও আত্মপ্রতিষ্ঠার রঙ। এই রঙ যার সবচেয়ে প্রিয় তিনি মননশীলতার অধিকারী, চিন্তায় আধুনিক, চ্যালেঞ্জের সম্মুখীন হতে উৎসুক, তিনি তাঁর মেজাজ ও মনোভাবকে সংযত ও গোপন রাখতে পটু, কিন্তু অন্যদের সম্পর্কে তিনি ন্যূন ধারণা পোষণ করে থাকেন।' তবে এ তো গেল তথ্যের কথা। কিন্তু এ লেখকের লেখনীতে 'হলুদ' রঙের তাৎপর্য এরকমই কিনা, তাও একটু পরখ করার বিষয়। কিছু উদাহরণ তুলে ধরা যেতে পারে—

১. 'শনের মত পাকা এক মাথা লম্বা চুল ও **হলদে ফ্যাকাশে** চোখ জোড়া ...।' — গিরগিটি
২. 'তার ঠোঁটে চোখে সত্যি তখন মেঘ-ভাঙা এক আঁজলা **হলুদ রোদ** ঝিলমিল করছিল।' —গিরগিটি
৩. '... পেয়ারাপাতার ফাঁক দিয়ে চুইয়ে পড়া **আষাঢ় আকাশের হলদে** আলো দেখছিল।' —গিরগিটি
৪. 'একটা **হলদে** প্রজাপতি দু'জনের মুখের সামনে ওড়াউড়ি করল।' —গিরগিটি
৫. '...ঘাসের ডগায় **হলদে** ফড়িং।' —শ্বাপদ
৬. 'বউ-এর ফর্সা আঙুলে হলুদের দাগ ...।' —তারিণীর বাড়ি বদল
৭. '...পার্টিশানের গায়ে **হলদে রোদ** এসে গেছে।' —মঙ্গলগ্রহ
৮. '...ঘাসের শিশির ঘিরে **হলদে প্রজাপতিরা** দল বেঁধে নাচছিল।' —চন্দ্রমল্লিকা
৯. 'একটা **হলদে রঙের** পাখি উড়ে গেল।' —পার্বতীপুরের বিকেল

১০. '... **হলদে** গোলাপ।' —পার্বতীপুরের বিকেল

১১. '... ঐ যে **হলদে** ছোট ছোট ফুল।' —সামনে চামেলী

১২. 'সাদা রং মজে গিয়ে **মেটে হলদে রং** ধরেছে।' —বন্ধুপত্নী ইত্যাদি।

উল্লিখিত উদাহরণগুলিতে 'হলদে ফ্যাকাশে চোখ জোড়া'য় প্রতারণা বা অবিশ্বাসের প্রতীকী ইঙ্গিত পাওয়া গেলেও আর যে সব হলুদ রঙের উদাহরণ দেওয়া হয়েছে, তাতে হলুদ বর্ণটি তথ্যগতভাবে আর যা মনস্তত্ত্বকেই প্রভাবিত করুক না কেন, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে হলুদ রঙের ব্যবহার সৌন্দর্যকে ব্যঞ্জিত করছে। তবে এ তো গেল হলুদ রঙের কথা। কিন্তু বর্তমান আলোচনা জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে ফবিস্ট শিল্পীদের মতো রঙের ব্যবহার নিয়ে। আর শুধু হলুদ রঙটিতেই নয়, অন্যান্য নানা রঙের ফবিস্টদের মতো চড়া, কর্কশ, কঠিন রঙের রূপ দেখা যায়। যেমন—

১. এখন দিগন্ত ঘেঁষে সমুদ্র **গাঢ় নীল** রঙ ধরেছে, — সমুদ্র

২. **রূপা ও সীসার** সঙ্গে খানিকটা **জাফরান** রঙের মিশেল আছে। — সমুদ্র

৩. **বকের পাখার মত সাদা ধবধবে** দাঁতগুলি ...। —বনের রাজা

৪. ...মাছের **কালচে তামাটে** নাড়ি-ভুঁড়ি ...। — গিরগিটি

৫. **লাল টুকটুকে** একজোড়া ঠোঁট ...। গিরগিটি

৬. **করমচা** রঙের বড় বড় চোখ দুটো ...। শ্বাপদ

৭. ...বাক্স পুরানো বেজায় **জ্যালজেলে টিয়ে রঙের** লম্বা একটি জামার ...। —তারিণীর বাড়ি বদল

৮. ওর হাতের মাথা দু-খণ্ড হ'য়ে বঁটির বুক থেকে থালায় নেমে এলো। **তাজা লাল রক্ত।** —মঙ্গলগ্রহ

৯. **ঘন সবুজ রঙের** একটা টুথব্রাশ হাতে...। —মঙ্গলগ্রহ

১০. ...আকাশের **নীল** পেয়ালা উপচে **জাফরান** রঙের রোদ, —নীলপেয়ালা

১১. **আগুন রংয়ের** ফড়িংগুলো চঞ্চল হয়ে উঠেছে। —চন্দ্রমল্লিকা

১২. **সবুজের** বুকে **ম্যাজেন্টার** ছড়াছড়ি। —চন্দ্রমল্লিকা

১৩. ...জানালার ওপারে **সোনালী দুপুর** ফাল্গুনের মৃদু হাওয়ায় কাঁপছে। —পতঙ্গ

১৪. **কাগজের মত সাদা ...।** —পতঙ্গ ইত্যাদি

তবে এসবের পাশাপাশি জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে বর্ণাঢ্যতাকেও এড়িয়ে যাওয়া অতি দুঃসাধ্য বলা চলে। যেমন—

"এই প্রথম **সোনালি ডোরাকাটা বেগুনি রঙের** প্রজাপতি দেখলাম... **অগ্নিবর্ণ** ফুলের পাশে **সোনালি** ডোরাকাটা পতঙ্গ।" —চন্দ্রমল্লিকা

"**সবুজ** রং **অতিরিক্ত সবুজ** হয়ে **কালোর** কাছাকাছি গিয়ে দাঁড়ায়, হেমন্তের মাঝামাঝি হঠাৎ সেই **সবুজ-কালো গভীর ধূসর** হয়ে ওঠে তারপর শীতে **হলদে ফ্যাকাসে নীরক্ত** প্রসূতির পাণ্ডুর চেহারা ধরে পাতাগুলি ঝরে পড়ে।" —গাছ ইত্যাদি।

সামগ্রিক আলোচনার শেষে বলা যায়, লেখক জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে তথ্যগতভাবে রঙের প্রয়োগ পাশ্চাত্য শিল্প আন্দোলন — ইমপ্রেশনিজম্ এবং ফবিজমের অনুরূপভাবে দেখা হলেও, এসকল গূঢ়-গভীর তত্ত্বের পাশাপাশি সহজভাবেই বলা যায়, বর্ণবৈচিত্র্যে বা বর্ণের প্রয়োগ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর গল্পে আলো আর রঙের খেলা যেন প্রকৃতির রূপকে, সৌন্দর্যকে আরও কয়েকগুণ বাড়িয়ে দিতেই অনেক বেশি তৎপর। রঙকে যেন তিনি প্রয়োগ করেছেন নিজস্ব দৃষ্টিভঙ্গিতে, নিজস্ব মানসিকতার অভিরুচি অনুযায়ী লেখক যেন রঙকে করেছেন প্রসাধন। প্রকৃতির প্রসাধন। আর সে প্রসাধনের দক্ষ শিল্পী এই লেখক, যিনি প্রকৃতিকে দেখেছেন একজন রূপদক্ষের মতো-কখনো তা ম্লান, কোমল আবার কখনো তা চড়া — তাতে প্রকৃতির লাবণ্য আরো বেড়েছে বৈ কমেনি! আর সব শেষে যেটা বলার কথা, রঙকে ভিন্নতর ডাইমেশনে রেখে দেখতে চাওয়ার ভঙ্গিখানিই লেখককে স্বতন্ত্র মর্যাদায় প্রতিষ্ঠিত করেছে।

সহায়ক গ্রন্থ

১. নিতাই বসু, জ্যোতিরিন্দ্র নন্দীর নির্বাচিত গল্প।
২. দেবব্রত দেব (সম্পা.), মুখাবয়ব গদ্যের মুখ এবং মুখোশ জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী : জন্মশতবর্ষোত্তর বিশেষ সংখ্যা, ২৯ বর্ষ, ২য় সংখ্যা, কার্তিক-পৌষ, ১৪২০।
৩. বিকাশ শীল (সম্পা.), জনপদপ্রয়াস জ্যোতিরিন্দ্র নন্দী সংখ্যা, ষষ্ঠ বর্ষ তৃতীয় সংখ্যা, মাঘ ১৪১০।

গ্রন্থসমীক্ষা

সুনীতিকুমার পাঠক*

চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা (হাজার বছরের প্রাচীন বাঙ্গালা ভাষায় রচিত বৌদ্ধগীতি ও সংস্কৃত টীকার বঙ্গানুবাদ); ড. সুমঙ্গল রাণা, অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ (অবসরপ্রাপ্ত), বিশ্বভারতী; রূপসী বাংলা, মার্চ, ২০১৫, বিনিময় মূল্য দুশো পঞ্চাশ টাকা।

আজ থেকে একশো বছর ধরে বারবার যে গ্রন্থখানি বিদ্বজ্জনেরা নানা দৃষ্টিকোণে বিচার-বিশ্লেষণ করে চলেছেন, সেটি হল বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ থেকে প্রকাশিত 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গালা গান ও দোহা'। ঐ গ্রন্থের বিষয়বস্তু নিয়ে যেমন অগণিত প্রশ্ন জাগে তেমনি তার ভাষা, সঙ্গীতের রূপ ও রাগ, এমনকি ঐ গানগুলির রচয়িতাদের পরিচয়। মোটামুটি ঐ ভাষা তাঁদের আপন আপন দৃষ্টি অনুসারে বিভিন্ন দাবি করে চলেছে। তাছাড়া ঐ গানগুলির রচয়িতাদের আবির্ভাবের সময়কাল এবং শুরু পরম্পরা নিয়েও বিভিন্ন চিন্তাভাবনায় বাংলা সাহিত্যের অনুরাগীদের কাছে অনেক ক্ষেত্রে অস্পষ্ট, সে বিষয়ে সন্দেহ নেই।

এমনকি ঐ গানগুলির তিব্বতী রূপান্তর আক্ষরিক অনুবাদের ভঙ্গিতে হলেও সর্বত্র সুগম হয়ে ওঠে। তার কারণ অনেক প্রকার। খ্রিস্টিয় অষ্টম শতকে গুহ্যসমাজতন্ত্রের টীকাকার দক্ষিণ ভারতের বরিন্দ্রকীর্তির বিবরণ থেকে জানা যায় গৌতম বুদ্ধ ছয় ধরনের বাক্‌শৈলী প্রয়োগ করেছিলেন। যেমন- নীতার্থ ও নেয়ার্থ তাঁরই বাক্‌শৈলী ছিল, তেমনি সন্ধায় ভাষা ও নোমন্ধায় (তথা না-সন্ধ্যা ভাষা)। তাছাড়া আর দুটি আরও দুর্বোধ্য —একটি অরার বা অরুত (কোনরূপ ধ্বনি রহিত) মৌনবাক্ এবং রাব বাক্ ধ্বনি উচ্চারিত শব্দ তরঙ্গায়িত বচন। তাই দেখা যায়, বৌদ্ধসূত্রগুলি পালি, বৌদ্ধ সংস্কৃত, প্রাকৃত তৌ অপভ্রংশ বিভিন্ন ভাষায় পাওয়া গেলেও সর্বত্র সূত্রের গোড়াতেই বলা হয়েছে 'এবং কো শ্রাতম্' বা এবং 'ময়া শ্রাতম্' —আমার দ্বারা এইভাবে শ্রুত (হয়েছে)। তা নিয়ে বিদগ্ধজনেরা বুদ্ধবচনের সত্যতা নিয়ে সন্দিহান হলেও বৌদ্ধমাত্রই স্বীকার করেছেন ঐগুলি বুদ্ধের রাব বচন অথবা অরাব বচন। কেননা, বাক্ প্রয়োগ ভুক্ত শব্দের শ্রুতিগোচরতা বস্তুত সাপেক্ষিক ঈথর তরঙ্গের সম্প্রসার। বৌদ্ধদের চর্যাগীতি বা বজ্রগীতি বা দোহা (দুই গজের) গান বস্তুত গৌতম বুদ্ধের বচন নয়। বৌদ্ধতন্ত্রমন্ত্রের সিদ্ধ যোগীগণের আপন আপন সাধনার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলির স্বকীয় অভিজ্ঞার স্বতস্ফূর্ত উদ্বোধিত আনন্দের উচ্ছল প্রকাশ। সেখানে তাঁরা সন্ধায় ভাষা বা সন্ধ্যাভাষা প্রয়োগ করেছিলেন। কারণ তন্ত্রমন্ত্রের সাধনা

* অবসরপ্রাপ্ত অধ্যাপক, পালি ও প্রাকৃত বিভাগ, বিশ্বভারতী বিশ্ববিদ্যালয়।

'সমর্থ যোগী ও সমর্থা' যোগিনীরদের আপন আপন অভিজ্ঞার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ আনন্দের বিভোরতা। বৌদ্ধমতে আনন্দ চার প্রকার - আনন্দ, পরমানন্দ, সহজানন্দ ও বিরমানন্দ।

গৌতম বুদ্ধ রাজপ্রসাদ ছেড়ে পথের ভিখারী হন, মানুষের শুধু নয় প্রাণীজগতের দুঃখ দূর করতে। আর সিদ্ধযোগী ও সিদ্ধযোগিনীর দুঃখের সাগর পার হয়ে আনন্দের সন্ধান পেয়েছিলেন—সেখানে ছিল মৈত্রী, করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষার অভিজ্ঞা শুধু নয় স্বয়ংপ্রকাশ। কেননা, গুহ্যসমাজতন্ত্রে স্পষ্টভাষায় ব্যক্ত হয়ে তন্ত্র হল প্রবন্ধ। প্রবন্ধ বলতে তিনধরনের, অতএব সিদ্ধযোগী ও যোগিনীর সর্বক্ষেত্রে সন্ধায় ভাষায় বা সন্ধ্যা ভাষায় গূহ্যার্থ উপমা রূপক আদি ব্যঞ্জনার ব্যবহার করা হয়েছে। তার কারণ, তন্ত্র মানুষের শুধু নয় জীবেরও তনু সংক্রান্ত সাধনা ও মন্ত্র মানুষের মননের সংক্ষপেকৃত বর্ণনার পন্থা। সেখানে মানুষের কায়ের ভিতর নাড়ী, বিন্দু কলা (ইংরাজিতে টিস্যু) ও মানুষের দেহের কায়ে অগণিত যন্ত্রপাতির এসমাজার ধুন বা নাদ ঐ মন্ত্রের উচ্চারণে বা মৌনজপের দ্বারা ধরা পড়ে।

চর্যাগীতি পঞ্চাশিকায় বরিষ্ঠ অধ্যাপক এক অভিনব শৈলী অনুসরণ করেছেন। তাঁর এরূপ প্রতি গীতির রাগ ও লেখকের নাম বিষয়ে। মহামোহপাধ্যায়কে অনুসরণ করলেও নেপালে চর্যাগানে রাগ উল্লেখের তারতম্য বিশ্লেষণ করেছেন।

তারপরে একটি মূল্যবান সামগ্রী হল পাঠভেদ ও পাঠভেদের যথার্থতা বিচারের সহায়তায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রথম সংস্করণ পাঠ, উত্তরকালে প্রবোধচন্দ্ররাগধী ও শান্তিভিক্ষুশাস্ত্রীয় তিব্বতী স্রোত অনুসারে পাঠ ও ভিন্ন ভিন্ন স্থানে পাঠভেদ কারণে অর্থভেদ সুস্পষ্ট করেছেন। তার জন্যে সাধুবাদ তাঁর প্রাপ্য। সরল বঙ্গানুবাদ স্পষ্ট কারণেই হেঁয়ালির মতো। তার রহস্যভেদ করা সুগমসাধ্য নয়। কেননা, সকল গীতিকার যে সহজ আনন্দের সন্ধানী ছিলেন এমন নয়। কেউ কেউ বিরামানন্দ ও পরম আনন্দে নিজেই নিজে মাতোয়ারা প্রজা ও উপায়ের একইভাবে।

সবার ক্ষেত্রে প্রতিটি গীতির টীকায় মুনি দত্ত যে ব্যাখ্যা উপস্থাপন করেছিলেন তার পঙ্‌ক্তি ধরে ভাষান্তর নয় অধ্যাপক সুমঙ্গল রাণা সারা জীবন ধরে চর্যাপদ মননের শুকতাল তুলে ধরেছেন পাঠক-পাঠিকা ও বিবুধগোষ্ঠীর সামনে। তার দু-একটি উদাহরণের উদ্ধৃতি দেওয়া যেতে পারে।

ছয়সংখ্যক গীতি ভুসুকুপাদের পটমঞ্জরী রাগের গীতির কথা টীকা মুনি দত্ত যেখানে তাঁর যুগের পরিপ্রেক্ষিতে রেখেছিলেন সেটা এরূপ — মুনি দত্ত তাঁর সংস্কৃত টীকায় চারটি বৌদ্ধমূল স্রোত উদ্ধৃতি দিয়ে কাজ সেরেছেন। আলোচ্য গ্রন্থে ঐ চারটি স্রোতের বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদের যথার্থতায় প্রসঙ্গ পরিচয় মেলে চর্যাগীতি পঞ্চাশিকায়।

ঐ গীতি মূল সুর 'করুণার সর্বব্যাপিতা। রূপক হোম হরিণ ও হরিণী। চিত্ত হল হরিণ। হরিণী হল সে' প্রতীত্যসমুৎপাদের অনুলোমক্রমে অবিদ্যার বিষপানরূপ জন্মরূপ হরণ করে তার চিত্তের স্বভাবকে। বৌদ্ধমতে আনন্দের উৎসে রয়েছে চার মুদ্রা। মুদ্রা শব্দটি অধুনা মুদ্রা, তর্জনী মুদ্রা হল কায়িক। চৈতাসিক মুদ্রা, কর্ম মুদ্রা, জ্ঞান মুদ্রা সাধক তার সাধনার প্রকর্ষে জ্ঞান মুদ্রায় বিভোর থাকে

তখন মহাসুখের সন্ধান করে—যা দেহ, মন, চিত্ত বিকল্পের ঊর্ধ্বে। উদ্ধৃতি সেখানে যথাযথ হয়েছে—সযত্নে তার বঙ্গানুবাদ লেখক দিয়েছেন। অনুরূপভাবে উদ্ধৃতি দিয়ে মুনি দত্ত চতুর্থ পদের সারবত্তা সিদ্ধ করার প্রয়াস সেরূপ করেছেন যে সহজ জ্ঞানের পরিচয় পণ্ডিতজনের জ্ঞানের বাইরে। কারণ, হরিণ বা হরিণী কারুরই রূপ নাই। অবয়ব নাই। নিরংশুচর্যা হল নিপ্রপঞ্চচর্যা। সেখানের অতিযোগ ও অনুযোগের সমতা। মহাযোগে অতিনিষ্প্রপঞ্চও চর্যা অচিত্ত। সেখানে গৌতম বুদ্ধের সেই কথার প্রতিধ্বনি পালিভাষায় মজ্জিঝমনিকায়ের যো ধম্মং জানতি সো মংজানতি। কোন্ সে ধম্ম (সংস্কৃতে ধর্ম) যা সংখ্যায় গুণলে চুরাশি হাজার গঙ্গাবালুকার মতো অপরিমেয় সংখ্যক। তাঁদের নিয়ে বিভ্রান্তির সম্ভবনা বা সংশয়।

আজীবন জ্ঞানতপস্বী অধ্যাপক রাণামশায়ের নিজস্বতায় চর্যাগীতি পঞ্চাশিকা পঞ্চাশটি চর্যাগান নবীন প্রজন্মের সামনে একটি মূল্যবান গবেষণা। গ্রন্থটির অবয়বগত কাঠামো পরিশীলিত। পূর্বসূরিদের যথানিষ্ঠ মর্যাদা সহকারে সমলোচনা কেমন করে সম্পাদন করা যায়, তার একটি উদাহরণ বিবুধ মণ্ডলীর কাছে আদর্শ হিসেবে স্থান পেয়েছে। তবে ধর্ম ও সাধনা প্রসঙ্গে আরও অনেক কথা বলার সম্ভাবনা আছে। মনে হয়, গ্রন্থের আকার বিস্তারিত আলোচনা অনেকের কাছে অনাসৃত হতে পারে। এই আশঙ্কা লেখকের মনে জাগে।

একখানি সর্বাঙ্গীন বিচার সমন্বিত হ্যান্ডবুক বিদ্বৎসমাজে স্বীকৃতি পেয়েছে, সে বিষয়ে নিঃসংশয়।

CASUES OF OPEN DEFECATION

Some new concepts from a remote village, WB.

Mohan Kumar Mayra*

INTRODUCTION

Each year two million children die from diarrhoeal diseases, making it the second most serious killer of children under the age of five (WHO - 1998). The main source of diarrhoeal infection is human excreta should be managed as potentially dangerous material. But above 15% of the world population practicing open defecation. In the year 2000 WHO revealed that only 5% sanitation has increased during 20 years of sanitation promotion program. India taking top position in the case of open defecation (600 million) followed by Indonesia (54 million), Pakistan (41 million) Nigeria (39 million) and Ethiopia (34 million). JMP (Joint Monitoring Program) shows the position of India among five Countries as a comparison of latrine owner and open defecators.

TABLE -01

Countries	Improved latrine(%)	shared latrine(%)	Unimproved latrine(%)	Open Defecation (%)
Malawi	53	31	09	07
Uganda	35	16	39	10
Tanzania	07	04	73	16
Kenya	29	19	35	17
Indonesia	44	11	10	35
India	24	04	06	66
Cambodia	22	05	04	69

Source :- Estimates of use of Sanitation facilities in rural areas as proposed by -WHO/ UNICEF - 2011

To Prepare this paper I surveyed a small "para" where total families are near about - 297 total voters are 1063 (only 71 families got

* Assistant Teacher and Research Scholar.

toilet from Govt. Program.(till oct,2014) Here is the scenario;

TABLE -

Total families	Govt. latrine (Remaining)	Own latrine	Latrine given by NGO	No latrine
297	36	05	31	225

Source :- Secondary Data, Gram panchayet office

I made Three groups [After -D.Coffy, A.Gupta, P.hathi, N.khurana, N.srivastav, S.Vyas and D.Spears]of households i) All family members defecate in open ii) No. Of the members defecate in open. iii) some of the members defecate in open. It is the Scenario:

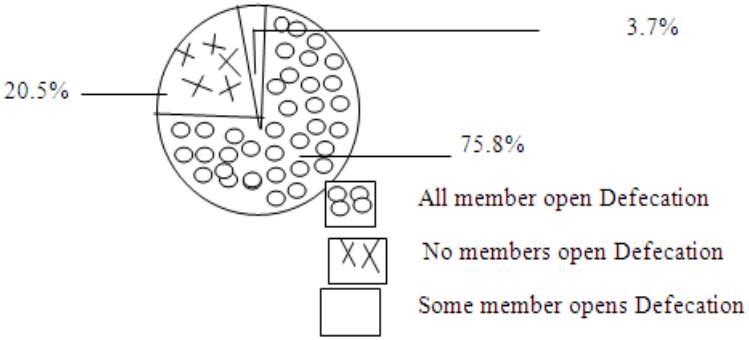

***JOINT MONITORING PROGRAM (JMP) - WHO / UNICEF -2013**

In this paper I will try to find what are to causes related to open defection in this area rather than global Causes.

CASUES OF OPEN DEFECATION

It is a Subject which had huge discussion. There are many causes of open defecation. Many had discussed it in socio-economic and cultural.

1. HABIT OR TRADITION :-

Many villagers told that they don't think the open defection is a bad habit. They suppose arise early from bed and go away from

home to defecate in open space is a tradition of village life. Their fore- father had practiced it and they are still continuing. The villagers are superstitious and ill- minded. They think to defecate around the home (latrine) is a sign of ugliness. More over they think it's a natural matter so no need to be shameful. As they have lack of money so it will be prig to make latrine leaving tradition. Old fellows thought that everybody should obey their own tradition , if you have money and sufficient space you can make and use latrine but who can't they do not jest them because they are doing nothing wrong.

2. AIRY ENVIRONMENT:-

According to the villagers there are huge open space why will we spent money too make latrine. And those places are airy to. So people are not ready to suffer in (3.5'X3.5') small space. Somebody feels suffocation in latrine for little space and bad smell. But in the nature open space you have to sit (to defecate) against the wind. Means if south wind is blowing your face will be south ward. It is mentionable that to know the common sense of person villagers often say-

Do you know which ward will our face remain in which in the time of defecation?

They did not feel any problem to defecate openly when they have listen that the interruption in time of excretion is the main cause of "gas-acid", somebody didn't belief and some surprised.

3. CONCEPT OF LAND FERTILITY:-

Most of the villagers are illiterate. They are not conscious of health listen Radio program and watch TV. Those villagers are giving argument of land fertility from human shit. Because they listen or watch that the excreta is moved from "latrine chamber" to land is helpful to grow fertilizer of the land. If they use latrine they have to bear it to land from the chamber. But according to caste culture it is shameful work for all except the community of "Methar". But when surveyed I noticed that they shit another person's land which is contrary to their opinion views.

All though there is a right thing in their view. Natash Geiling stated that "Humans have been repurposing their faces for thousands of years some more safely than others (17th 2014, THE STINK ABOUT HUMAN POOP AS FERTILIZER) .According to her the most famous example of raw human waste application might be china where human excrement was used for centuries in an attempt to close the nutrient cycle in their fields. Agricultural Scientist F.H. King cited the perennial fertility of soil of China is the result of human excreta. But it has some scientific system which the villagers didn't know so their arguments are not true

4. HEALTH COCIOUSNESS:-

According to old fellow of the para they who defecate in open space are health conscious. Not only they are doing the right thing they are cultivation the culture of good health. They describe that a person can diagnose his diseases properly by watching/examining his excreta. Any digestive problems, presence of warm, dysentery, dysentery with blood, etc. Actually one can properly watch/examine his stool in case of open defecation. In the latrine it is quite impossible, because the space is too much short, and those are not enlighten so well. After all shit moves to the watery deepest part of the 'pan' just after shitting. Moreover in case of old person latrines are so dangerous, because they are not efficient user of latrine sometime they slip their leg into slippery pan and get fractured. So they fell it is much better to defecate in open space than latrine.

The view of the villagers is supported by some medical Journal; STOOL COLOUR is often a reflection of problems "black stool could indicate bleeding for stomach a first part of the small intestine. Bright red stool usually suggests that blood is coming from lower part of the digestive system. STOOL SMELLS bad if it contains indigestive food, bacteria, mucus and dead cells because of bacteria and parasites. LOSE, WATERY STOOL pass through the bowels too quickly is the general symptom of diarrhoea" Dr. Raufman stated.*

5. HUGE TIME/LACK OF EMPLOYMENT:-

It is mentionable that most of the people of the village are cultivator. All most every of them are not economic cultivator. They are doing subsistence type of agriculture. Only one or two person, who are servicemen staying out-side from the village and very few are businessmen,. So they all have huge time to spend. As they are not in service they have no need to do things time to time. They have no necessary to catch the train/bus to arrive office in just time. The value of time is very ignorable in this area. If they watch somebody is hurry they will laugh at him saying "which office will you go?" So leaving bed in the morning they take towel and "NEEM STICK" to brush their tee, go into the open field to defecate. As a matter of fact if one hour have spent only for defecation, nothing it matters.

TABLE - 03

Total mature people	1063	Cultivator	1017
Total mature male	569	Businessmen	15
Total mature female	494	Servicemen	02
Total number of families	297	Self employee	29

Source: - Primary data; work participation type and structure of population.

*LINDA THRASYBLUSE, My Health News Daily

6. BAD LATRINES GIVIN BY GOVT:-

It is well known to all that the latrines given by Govt. In different time are no doubt bad Central Government and also state government made latrines of different qualities in different time. Sometimes those are made of wood, in Cement slabs straw, etceteras, whatever made, is actually bad is quality. Attached picture is expressing the actual condition of the govt. given toilets. As the condition of whole country is bad so the study village is not the exception.

All of those are badly accommodate, narrow and breakable. After few months all are destroyed. As for example I have made a house-hold survey where 50% latrine given by govt. either broke or is not working so they are using it as "Hen-Duck-room" Some families are using it as the store room for "Fuel - Wood". The bellow table is displaying the condition;

TABLE -

Toilet (Remaining / in use)	36
Used for "Hen-Duck room"	12
Used for" Fuel wood Store room"	10
Broken parts are used in another purpose	13
Total toilet given by Govt.	71

Source :- Primary data; Condition of toilet given by Govt.

More over latrines are so narrow that users may be injured at any time. So the aged people are avoiding those. After all they have the concept of airy environment.

7. HUGE OPEN SPACE

In these rural areas there are huge open Space Through the overall man land ration is very high in India. Total land in this village is about 1200 Bigha (assumed amount) and total No. of families are - 297.So amount of land per family is approximately is 4 Bigha Now it is not supporting the view that there are many landless farmer. The question is arising that if there is huge land. So Why There are so many landless farmer? But it is the reality because only a few person owned most of the land and many persons owned nothing .More over the amount of population is low, though the rate of birth is high. But many of them died after birth because of bad health services. There is no Hospital, Primary Health Centres, Private clinic, Nursing Home. They all are dependent on QUACK DOCTORS. It is also mentionable that there is no incidence of "POLYGAMY" As the result of those causes the populations of this village is not growing in high rate. So space/land is remaining Open. The supporting image is displaying that.

8.LACK OF WATER :-

There are not huge amount of tube well in all villages of India. So it is true also about study area. And there is no supply water also. No sufficient tube wells to get drinking water. In a large 'PARA' where almost 300 families inhabited no. of tube wells are there only 7.So about 43 families are dependent on one (1) tube well. The table is showing the amenities available in the area;

TABLE -

Total families	297
Total Tube wells	07
Supply Water	None
Well	None
Personal Shallow Tube Well	None
Electricity	None

Source : Primary data : Amenities of the field up to Oct. 2014.

Except drinking water all are dependent on the pond, Nallah, Channels, for water . As I mentioned previous about all the people are cultivator. So, too much water is used for cultivation. As the result all the sources of water (Exp tube well) get dried, especially in the months of "Chaitra Baishakh, Jaistha" It is also notable that the Monsoon/rainy season is getting late now a days .The land got dry and fractured/cracked as the result of very much irrigation. Even sometimes the tube well produced less water as the water level goes down. As they can't get drinking water time to time how they will get water for latrine use? More over, they are not economically so strong that they can construct personal wells/Tube wells.

9. LANDLESS PEOPLE AND RELLIGIOUS VIEW:-

This village is full of landless farmer. They have a little land to inhabit /reside. If they want to construct latrines they have to construct it in home or connected with home. But according to different religious faith it is a dirty or inauspicious matter. Even the person, who take the risk of construction of latrine connected with bedroom faced social 'humour' and also treated as dirty family.

If we notice the name of the para is "HARI GHOSER CHAK" which means landlord of this para is Mr. Hari Ghosh. This is the evidence of the landlessness of the resident. Though at present the villagers got some little land each as the blessing of successful land reforms in WB since 1970.

In some places of India religious beliefs may influence, just as cotton (1998) explained the condition: a latrine construction project in India placed the toilet in the North East corner of the plot. According to the local beliefs this is an inauspicious location to place a toilet. So the people refused to use them. Especially in 'Hinduism' it was a very dirty thing to make latrines connected to bed room than other religion.

And there are some constrains to make latrine connected to home, somebody told that it is bad thing to defecate in home. Because there are some embarrassing sounds created in time of excretion which is so offensive.

References

1. "Open Defecation- Evidence from a New survey in Rural North India" D. Coffey, A Gupta, P. Hati, N. Khurana, N. Srivastav S. Vyas, and D. Spears.
2. "THE STINK ABOUT THE HUMAN POOR A FERTILITER" 17TH JULY 2014 Natash Geiling.
3. "MY HEALTH NEWS DAILY"- Linda Thrasyblue
4. WHAT INFLUENCES OPEN DEFECATION AND LATRINE OWNERSHIP IN RURAL HOUOSHOLDS? Finding from a Global Review- Katheryn O Connell
5. HOW TO PROMOTE THE USE OF LATRINES IN DEVELOPING COUNERIES - Jennifer Mc Conville M.S. candidate Michigan Technological University.
6. "THOR BORI KHARA" - Kalyani Dutta(in Bengali)
7. Primary Data
8. Secondary data.

পত্রিকা দেখুন ওয়েবসাইটে

http://ebongprantik.wordpress.com/

₹ 150/-

Published By : Ashis Roy, Vill - Bhagwanpur, P.O. - B.H.U, Varanasi - 221005, Uttar Pradesh &
Debasish Roy, Kestopur Chandiberiya Sarada Palli, Kestopur, Kolkata - 102
Ph : 09415243816, 9804923182, 9332358644, 9088673408
Email : ashis.jibonda.roy@gmail.com